শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক কৃপা

কৃপাভিক্ষু অনিলমোহন

পরিবেশক :

দে বুক ষ্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

হে গুরু, হে ভাগবতী জননী!

এই কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু তোমরা, এর প্রেরণাদাতাও তোমরা,
ভাব-ভাষা সব তোমরা ; তোমাদেরই শ্রীপাদপদ্মে তিল-তুলসী দিয়ে
সমর্পণ করে দিলাম এই প্রকাশের সমস্ত ফলাফল!
জয় হোক তোমাদের!

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ঘাত-প্রতিঘাত সকলের জীবনেই কমবেশি ঘটে। কিন্তু লেখক যেন আমাদের থেকে একটু স্বতন্ত্র, তাঁর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলোও স্বতন্ত্র। পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠবে—মানুষের জীবনে এত পরীক্ষা এত বাধা-বিপত্তি আসে? আর সে তা সহ্য করতে পারে? শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কৃপালাভের জন্য, আশ্রমে মায়ের কাছে থাকবার জন্য হেন কাজ নাই যা লেখক করেননি। দু-দু'বার তিনি জেলে গেছেন, মুটে হয়ে গরুর মাংসও মাথায় করে বয়েছেন, জেলের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দেখা দিয়ে তাঁকে বাণী দিয়েছেন,—এমনি অনেক ঘটনাই আছে যা প্রায় অবিশ্বাস্য অলৌকিকের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মায়ের সশরীরে রহস্যময় উপস্থিতিটি অলৌকিকের একেবারে চূড়ান্ত। এমন ঘটনা ক্বচিৎ কখনো ঘটে। পরন্তু ঘটলে অবিশ্বাসী পাঠকদেরও তখন বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, ভগবান আছেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি সশরীরেই কাছে আসতে পারেন। জেলের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার-কষ্ট, পণ্ডিচেরীর পথে যে-সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, মর্মস্পর্শী ভাষায় সেসবের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এদিক থেকে বইটির নামকরণ হওয়া উচিত ছিল 'কৃপা কঠোর' বা 'জেল থেকে বেরিয়ে', কিন্তু লেখক ঐরকম নাম দিলেন না; কারণ তাতে দেবতার প্রতি দোষভাব এসে পড়ে। তাছাড়া যে-জন্য তার পথে নামা, কারাবরণ করা তা তো সার্থক হয়েছে? লেখক পরিতৃপ্ত। কারুর প্রতি তাঁর অভিযোগ নাই ক্ষোভ নাই। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কৃপালাভের পথে যেসব দুঃখ-কষ্ট এসেছে সেগুলো তাই তিনি হাসি মুখে সরল ভাষায় বর্ণনা করতে পেরেছেন। এই কারণে কাহিনীটি করুণ রসাত্মক হয়েও পাঠকের হৃদয়ে আনন্দ জাগায়, সবটুকু পড়ার অদম্য তৃষ্ণা বাড়ায়। বইটির প্রতিটি ছত্র এই কথা বলে: Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. পরীক্ষা করে দেখুন সত্যিই sweetest songs হয়েছে কিনা? পরিশেষে এই নিবেদন যে, অপটু হস্তে লেখক যা লিখেছেন, তা পাঠক সাধারণের কাছে সুখপাঠ্য করে পৌঁছে দেবার ব্রতে ব্রতী হয়েছি আমরা—এ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাবর্গের কাছে বইটির সমালোচনা পাবার আশা রাখি। লেখকের এই কাহিনীরই আর একটি বিশেষ অংশ—'চিরকালের প্রেমের দেশে' শীঘ্রই প্রকাশ করার আশা করছি। বিদ্যুৎ সঙ্কটের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশনার কার্য করতে হল, অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ-প্রমাদ ও অন্যান্য ভুল ত্রুটির জন্য তাই আগে থেকেই মার্জনা চেয়ে রাখছি।

বিনীত
প্রকাশক

উত্তর পাইনি

[ভূমিকা]

ডিভাইনও যে সামান্য ব্যাপারে মানুষের মতো আগ্রহ দেখাতে পারেন, প্রতি পদে উৎসাহ-উপদেশ দিতে পারেন, শুধু এইটুকু কথা জানাবার জন্যেই এটুকু লেখা। না হলে এটি ঠিক ভূমিকা নয়।

বাস্তবিক এবার মায়েরও যেন আর তর্ সইছে না তাঁর কৃপার কাহিনীটি প্রকাশের! একাজে একটার পর একটা বাধা এসেছে, আর মা সমানে বলেছেন —হবে হবে, ভয় করো না।

এই প্রচ্ছদপটের ব্যাপারটাই আগে বলি : সবারই এক প্রশ্ন—রেলওয়ে ষ্টেশনে মা কেন? মা কি কখনো ষ্টেশনে গেছলেন? আমি শুনে ভয় পেয়ে যাই, তাদের কথার উত্তর দিতে পারি না। কারণ উত্তর দিলে কি তারা বিশ্বাস করবে যে, যখন এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিই সম্পূর্ণ হয়নি তখন একদিন মা আমাকে এরকম প্রচ্ছদপটের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন?

আবার কি, যে-অপরূপ মূর্তিতে মা সেদিন রেলষ্টেশনে দেখা দিয়েছিলেন সেইরকম মূর্তির ছবিও অভাবিত উপায়ে একজন আমাকে এনে দিলে এই কিছুদিন আগে। ছবি পেয়ে প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি আশ্রমের একজন ব্লকমেকারকে দেখালাম। তিনি দেখেই অমনি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন,—আচ্ছা, আপনারা পেয়েছেন কি? মাকে নিয়ে যা খুশী করবেন? আজ ষ্টেশনে বসিয়ে মায়ের ছবি করছেন, কাল ইচ্ছে হলে হিমালয় পাহাড়ের মাথায় বসিয়ে কভার বানাবেন নাকি? তারপর কেউ যদি আশ্রমকে এ ছবি চায় তাকে দেবে কি করে?

এ-ছবি যে কেউ চাইতে পারে, এতটা দূরদর্শিতা আমার ছিল না। তাই তাঁর কথা শুনে ভাবতে থাকি—এ যে শুরুতেই বাধা? এরকম প্রচ্ছদপট তাহলে কি হবে না? তাহলে আশ্রমের কপিরাইট বিভাগই কি এরকম প্রচ্ছদপটের অনুমতি দেবেন? মা অমনি মানুষের স্বরে বলে উঠলেন—দেবে দেবে, তুমি ভয় করো না!

আর সত্যিই কি আশ্চর্য, যিনি আমাকে এমন ভয় দেখালেন তিনিই কেন জানিনা স্পেশাল ডিস্‌কাউণ্ট দিয়ে প্রচ্ছদপটের ব্লক তৈরী করে দিলেন। আশ্রমের কপিরাইট বিভাগও কি লিখেছি একবার দেখতেও চাইলেন না, প্রকাশের অনুমতি দিয়ে দিলেন। এটিকে মায়ের কৃপা-ইচ্ছা ছাড়া আর কি বলব?

পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে মায়ের এমনি কৃপা-ইচ্ছার নিদর্শন আরো আছে :

কিছুদিন আগে একজন প্রকাশককে পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়েছিলাম। তিনি দেখে বললেন—লেখাটি তো ভাল, কিন্তু কি জানেন? আজকালের বাজার খারাপ। আপনি যদি সেক্স কিংবা পলিটিক্স নিয়ে লিখতেন তাহলে বাজারে চলত। কিন্তু আপনার ২০০ পৃষ্ঠার মত বই, মায়ের একটা ছবিও দিতে হবে। —দাম হয়ে যাবে ১০।১২ টাকা। এত দাম দিয়ে এ বই নেবে কে? তার চেয়ে বলি কি, এপ্রিল দর্শনে এসে লেখাটি নিয়ে যাবো, ততদিনে আপনি লেখাটি ছোট করে ফেলুন। ১০০ পৃষ্ঠার বই হবে, দামও কম পড়বে। স্মল্‌পাইকা ডিমাই সাইজে ছেপে দেব, দু'মাসের মধ্যে বই বেরিয়ে যাবে—ভাবনা কি?

কিন্তু তবু আমি ভাবি—১০০ পৃষ্ঠায় লেখাটা আনব কি করে? একটা প্যারাগ্রাফ কোথাও বাদ দিলে লিঙ্ক হারিয়ে যাবে, আর সেখানে কিনা ১০০ পৃষ্ঠ কমাতে হবে? অসম্ভব। এমন সময় যাঁর কথা তিনি বলে উঠলেন—কিছু বাদ দিতে হবে না। ওরা নেবে সব!

আমি বলি—কিন্তু মা, ওঁরা যে বলে গেলেন না-কমালে নেবেন না?

কিন্তু এবার আর উত্তর পেলাম না। ভাবলাম, স্নেহশীলা মা তো? সন্তানের চিন্তা দেখে স্তোকবাক্য দিয়েছেন। তাই যতখানি সম্ভব কাহিনীটা সংক্ষেপ করতে লেগে গেলাম! কিন্তু সংক্ষেপ করবো কি? বরং আরো বেড়েই চলে! শেষে আমি হতাশ হয়ে পড়ি—নাঃ, এপ্রিল দর্শনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়!

অমনি মা-জননী উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠলেন—তুমি কতদিন সময় চাও, কতদিন? আগষ্ট মাস? ঠিক একেবারে এই কথাগুলি।

আশ্চর্য কি, সেই প্রকাশক এপ্রিল দর্শনে, এমনকি আগষ্ট দর্শনেও আসতে পারলেন না! অথচ ঠিক আগষ্ট মাসেই [৭ই আগষ্ট] কলিকাতার দি শ্রীধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে চিঠি এল বইয়ের পাণ্ডুলিপি যেমন আছে তেমনি পাঠাবার জন্যে। এমন অভাবিত ঘটনা আশাও করিনি, আর সেজন্যে তৈরীও ছিলাম না। তাই প্রকাশে দেরী হয়ে গেল।

কিন্তু আমি তখন মায়ের কথার অর্থ না বুঝে প্রশ্ন করেছিলাম—বাব্বা! আগষ্ট মাসের মধ্যেই আমাকে এ-কাজটি শেষ করতে হবে, দেরী করলে চলবে না? এত আগ্রহ তোমার? তবে এই পঁচিশটি বছর তুমি কেন চুপ ক'রে ছিলে?

কিন্তু এ-প্রশ্নেরও উত্তর পাইনি!

কৃপাভিক্ষু অনিলমোহন
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক কৃপা

O man, the events that meet
thee on thy road,
Though they smite thy body and
soul with joy and grief,
Are not thy fate ; they touch thee
a while and pass ;

—Sri Aurobindo (Savitri)

॥ গোড়ার কথা ॥

জ্ঞানীরা বলেছেন, অসম্ভব ঘটনা নিজের চোখে দেখলেও কাউকে বলবে না। কারণ, অবিশ্বাসীরা কখনো তা বিশ্বাস করবে না। শুধুমাত্র এই অপরাধেই চণ্ডীমঙ্গল-এর শ্রীমন্ত সওদাগর বেচারাকে নাকি মশানে যেতে হয়েছিল।

যে-ঘটনাটা বর্তমানে বলতে বসেছি, সে-ঘটনাটাও শ্রীমন্ত সওদাগরের দৃষ্ট গজগ্রাস-শিলার মতই অবিশ্বাস্য অলৌকিক। কাজেই এমন ঘটনাকে 'অলৌকিক কৃপা' নাম দিয়ে যতই জোর গলায় প্রচার করি না কেন, কেউ যে একে সহজ বিশ্বাসে বরণ ক'রে নেবে না—তা নিশ্চয় জানি। কার্যতঃ, এ-বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণও ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি।

কিছুদিন আগে একজন প্রৌঢ় এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে কাহিনীটা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলাম। সব শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'কিন্তু শ্রীমা তো বাংলা জানেন না?'

অর্থাৎ, অন্যান্য ঘটনাগুলো—এই যেমন, দূর-দৃষ্টিতে কারো বিপদের কথা জানতে পেরে, হাজার দু'হাজার মাইল দূরে ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত হয়ে বিপন্নকে সাহায্য করা, রেলওয়ে স্টেশনের মত জায়গায় প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বজনসমক্ষে তার সঙ্গে কথা বলা, প্রায় আট-দশ ঘণ্টা সময় তথায় অবস্থান করা, ইত্যাদি—যদি-বা কোনরূপে সম্ভব হয়, কিন্তু শ্রীমা বাংলা কথা বলবেন কেমন ক'রে?

এই হ'লো মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি! মানুষ তার জানার বাইরে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে রাজী নয়। এমন মানুষকে বোঝানো দায় যে, যিনি বহু দূরের ঘটনা জানতে পেরে সেই স্থলে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাঁর পক্ষে অন্য একটা ভাষায় কথা বলা কি এতই অসম্ভব?

তাছাড়া, আরো একটা কথা ভাববার আছে: যে-মানুষ দেবতার বাণী শোনে, সে তার নিজের ভাষাতেই শোনে। শ্রীমা যদি তাঁর ফরাসী ভাষায় সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলতেন তাহলে কি আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারতাম? না কি সেই পরিবেশের সঙ্গে তিনি নিজেই স্বাভাবিকতা বজায় রেখে চলতে পারতেন? 'তোমাকে সাগরে নিয়ে যাব'—বলে তিনি যে আমার মনে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তা কি বাংলা ভাষায় না বললে সম্ভব হতো?

কিন্তু থাক এখন এই সব যুক্তি-তর্কের কথা, যে-কথা আগে বলছিলাম—এই কারণেই এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাটা প্রকাশ করতে ভয় করছিলাম।

কিন্তু যাঁকে নিয়ে বিশেষ ক'রে এই ঘটনা তিনি আজ আমার সে-ভয়টুকুও রাখলেন না। যাঁর কথা তিনি জোর ক'রে আমাকে দিয়ে প্রকাশ করিয়ে নিলেন, যতবারই আমি চুপ ক'রে যেতে চেয়েছি, ততবারই আমার কাছ থেকে সংকল্প আদায় ক'রে নিয়ে তবে তিনি ছেড়েছেন। সে ভারি আশ্চর্য অনুভব: যখনই ভেবেছি—নিজের কথা—নিজেকেই বলতে হবে, তখনি মনে হয়েছে —ওঃ! কী কঠিন, কী সাংঘাতিক ভারী এই কাজ! প্রাণ থাকতে এ-কাজ আমা দ্বারা সম্ভব নয়! কিন্তু পরক্ষণেই যেমনি মায়ের সেই রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অমনি তখন সমগ্র সত্তা প্রকাশের আনন্দে একেবারে উদ্বেল হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়—তাঁর কৃপার কাহিনী প্রকাশ করার জন্যে হেন কাজ নাই যা আমি পারিনি। তাঁর জন্যে আমি সব করতে পারবো!

কিন্তু কার্যতঃ সব করতে পারছিলাম কি? দু'এক বছর নয়, তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেল, আমি কিছুই করতে পারছিলাম না। আমি শুধু ঘটনাটা লিখতেই পারি, সেটাকে ছাপাতে তো পারি না? আর বর্তমান বাজারে ছাপাবার আশা করাও আকাশকুসুম কল্পনা। তাই মাকে নিজেকে এগিয়ে আসতে হল: ১-১২-৫৫ তারিখে মা আমাকে প্রচ্ছদ-পটের একটি চিত্র দেখালেন। ঐদিন ধ্যানে দেখলাম, বইটি ছাপা হয়ে—গেছে এবং সেটির মলাটের ওপর মায়ের ছবির তলায় তাঁর হাতের টাটকা কালির স্বাক্ষর! সমস্ত মলাটির মধ্যে আর সব কিছুকে ছাপিয়ে শুধু ঐ স্বাক্ষরটিই তীব্র উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়েছে। আমি দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি—মায়ের হাতের সইটা কোথা থেকে এলো? কখনো তো ভাবিওনি সই-এর কথা! কারণ ভাববো কি করে? ১৯১২ সালের নভেম্বরের পর কে দেবে স্বাক্ষর?

তবু স্বাক্ষর দেখলাম। অর্থাৎ মা নিজেই প্রকাশের ব্যবস্থা করে নিলেন!

কিন্তু থামুন, মায়ের শুধু ঐ ঘটনাটি শোনবার জন্যেই আপনারা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না। তার আগে আর একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলি যেটা না শুনলে ঐ ঘটনার পরিস্থিতিটিকে বোঝা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল সেই ভাবেই একের পর এক শুরু করা যাক:

[এক]

জীবনে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যা কখনো ভোলা যায় না—সমস্ত স্মৃতি-বিস্মৃতিকে ছাপিয়ে শুধু সেই ঘটনাটাই অভিজ্ঞতার খাতায় অক্ষয় হয়ে থাকে, অনুভূতির তীব্রতায় সেই অনেক দিন পূর্বের ঘটনাটাকেও মনে হয় এই বুঝি কয়েকদিন আগেকার ঘটনা!

বিপদ তো সব মানুষেরই হয়—একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ঘটেও মায়ের বিপদ হয়, স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সহায়-সম্বলহীন স্ত্রীরও বিপদ হয়, আবার মামলা-মকদ্দমায় হেরে কিংবা চুরি-ডাকাতিতে হৃতসর্বস্ব হয়েও বিপদ হয়।

কিন্তু আমার সেই বিপদটা ছিল বড়ো অদ্ভুত!

অদ্ভুত বল্‌ছি শুধু বিপদের গুরুত্বের অর্থাৎ ফলের দিকেই তাকিয়ে নয়, তার রূপের দিক দিয়েও। কারণ, আমি বিপদে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু তখনও ষোলো-আনা আশা ছিল—প্রথমেই পা থেকে গলা পর্যন্ত সেই বিপদের মধ্যে আমি একবারে নিমজ্জিত হয়ে পড়িনি।

আবার কি, রক্ষা পাবার উপায়গুলোকে চোখের সামনে দেখতেও পাচ্ছিলাম। শুধু সেগুলোকে ধরবার নাগাল পাচ্ছিলাম না—একটা কিছু যেন কল-কাঠি ঘোরালেই কিংবা কোথাও কারো কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পেলেই আমি বেঁচে যেতে পারি। অথচ সেইটুকুর অভাবেই তৎক্ষণাৎ আমার চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে!

এই কারণেই বোধহয় রক্ষা পাবার আকৃতিটা আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো, তাই ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার ওপর ঘটনাটাকে ছেড়ে দিয়ে শান্ত নির্বিকার হয়ে থাকতে পারলাম না। আশে পাশে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম যদি হঠাৎ কোনো আত্মীয়-স্বজনের দেখা মিলে যায়, যদি অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়! স্বর্গীয় পিতা-মাতা এবং পরলোকগত ঊর্ধ্বতম পুরুষদের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করলুম অঘটন ঘটিয়ে দেবার জন্যে! কত ঠাকুর-দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করলুম—'শুধু এইবারটির মত এ-সঙ্কট থেকে তোমরা আমায় রক্ষা করো!'

কিন্তু হা প্রত্যাশা! কারো কাছ থেকে কোনো সাড়াই পেলাম না!

মনে পড়ে গেল কৃপাধন্য নিবেদিতার কথা—স্বামীজীর স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি-লিপি হাতে নিয়ে ভারতে আসবার জন্যে তিনি জাহাজে উঠেছিলেন। বুকে তাঁর তখন কত বল, কত সাহস! আধ্যাত্মিক ভারতের মহান গুরু তাঁর জীবনের সকল ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন! স্বামীজী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিখেছেন:

'মরদ কী বাত্, হাথী কা দাঁত! পুরুষের জবানের কখনো নড়্ চড়্ হয় না। আমরণ আমি তোমার পাশে পাশে থাকবো—কথা দিচ্ছি তোমায়!'

কিন্তু কে দেবে আমায় প্রতিশ্রুতি? তখন পর্যন্ত কোনো ভাগবত-পুরুষের কৃপাই তো লাভ করিনি? এই যে বাংলা ছেড়ে এত দূরে এমন অচেনা-অজানা জায়গায় এসে পড়লুম, এখানে তো আমার কেউ কোথাও নাই। তবে কে আমায় রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে?

আগ্রা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট স্টেশনে যদি-বা নিজের জাত-ভাই একদল বাঙালী তীর্থ-যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তো তারাও উপহাস করলে—কি হে বাঙালী নাকি?

'হাঁ' 'না' কোনো উত্তরেরই তাদের প্রয়োজন হলোনা। অথচ গায়ে তো আমার 'বাঙালী' লেখা ছিলনা? নিঃশব্দে পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলুম।

তারা কিন্তু ঠিকই ধরলে। একজন পাশের সঙ্গীদিকে ইঙ্গিত ক'রে আমাকে দেখিয়ে হেসে উঠলো—হাঃ, হাঃ! গ্যাখরে, আমাদের বাঙালীও কেমন হাত-কড়া পরতে জানে! তারপর অন্য সবারও মুখে হাসি ফুটে উঠল!

তাদের হাসি শুনে সঙ্গের স্ত্রীলোকটির আমার দিকে নজর পড়লো। তিনি কিন্তু আমার অবস্থা দেখে সত্যিই বিচলিত হলেন, দলের লোকেদের বললেন—তাই তো, ছেলেটি যে দেখছি আমাদেরই মত বাঙালী! হাঁগো, পুলিশেরা যে ওকে অমন ক'রে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—কি হবে গো ওর?

তাঁর-সঙ্গের লোকেরা বেজার হয়ে উত্তর দিলে শুনতে পেলাম—এ্যাই গ্যাখো! চোর না ডাকাত একটা লোককে দেখে তুমি আবার পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? তোমাকে নিয়ে এসে কী মুস্কিলেই না পড়া গেল! চোরেদের জন্যে অতো দরদ দেখে পুলিশ সন্দেহ করলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে ভাবো দেখি?

তা বটে! আমি যে আসামী! আমার সঙ্গে এখন যে সংযোগ রাখবে তাকেই যে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে!

কাজেই এর পর আর কারো সাহায্যের আশা করা আমার বৃথা। এবার রইলেন শুধু অন্তরস্থ আত্মপুরুষ যিনি সকল অগ্নিপরীক্ষায় মানুষের চিরকালের সঙ্গী, আর রইলেন ঊর্ধ্বের ভগবান। ভগবানের প্রতি নির্ভরতা আমার এতটুকুও হারায়নি, তখনও স্থির বিশ্বাস ছিল যে, একটা কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটবেই ঘটবে! শুধু জানতাম-না—কখ্‌ন আর কিভাবে সেই অঘটনটি ঘটবে!

আমার মতো আরও একজন ছিল, যে ঠিক এম্‌নি ধরনের বিশ্বাস করতো। সেই মানুষটির নাম হলো শশী মহারাজ। তার বিশ্বাসের জোরটা যেন আরও

কিছু বেশী ছিল। মহারাজ জাতিতে অসমীয়া হলেও ভাল বাংলা বলতে পারে। আমাকে অতিশয় কাতর দেখে শশী মহারাজ পুলিশ ভ্যানে ওঠবার আগে একসময় চুপি চুপি ব'লে রেখেছিল—আরে! অপেক্ষা ক'রে থাকো না, পুলিশের সাধ্যি কি আমাদের জেলের মধ্যে আট্‌কে রাখে? এখনো জানে না তো কাকে ধরে জেলে পুরতে যাচ্ছে! এই রাস্তায় যেতে যেতেই গাড়ী যখন অ্যাক্‌সিডেণ্ট করবে তখন বাছাধনেরা টের্‌টা পাবে!

হ্যাঁ, আমি একা পুলিশের হাতে ধরা পড়িনি, আমার সঙ্গে আরও দশ-বারোজন ছিল। আগ্রা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে এসে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। শুধু আমাদেরই বিচারের জন্যে পেছনে পেছনে মোবাইল কোর্ট ঘুরছিল, আগ্রা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে আমাদের সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে বিচার হয়ে গেল। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী লঘু-গুরু দণ্ড—আমার ও শশী মহারাজের হলো এক মাসের কারাদণ্ড, আর অন্যদের কারো এক বছর, কারো-বা পাঁচ-দশ বছরের জন্যে কারাদণ্ড। বিনাশ্রম নয়, সকলেরই সশ্রম কারাদণ্ড!

তবে বিচারের পর বেশীক্ষণ যা হোক কৌতূহলী জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড়ো পুলিশ ভ্যানে পুরে আমাদের নিয়ে চললো মথুরা সেণ্ট্রাল জেলে!

তারপর আর কি? পুলিশ ভ্যান্‌টা চলছে তো চলছেই, রাস্তা যেন আর ফুরোবার নাম করে না। শরীরের মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছিল ব'লে কিনা জানি না, সময়টা যেন আমার কাছে অনন্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন যুগ যুগ ধরে এম্‌নি ক'রে ভ্যান্‌টা ছুটে চলছে! দু'দিন পেটে একটা দানা পড়েনি, তাছাড়া এদিন্‌ও সকাল থেকেই নিরম্বু উপবাস চলছিল; তাই লাউ-কুমড়ো গাছের গোড়া কেটে দিলে যেমন সমস্ত লতাটা এক মুহূর্তেই নেতিয়ে পড়ে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমিও তেমনি গাড়িতে উঠেই গাড়ির মেঝেতে নেতিয়ে পড়েছিলুম। মনে হচ্ছিল তখন, পুলিশেরা যদি লাঠি দিয়ে খুব কষে মার দিয়েও কিছু খেতে দিত তো তাতেও স্বস্তি পেতাম!

অন্যদের অবস্থাও তথৈবচ। শুধু শশী মহারাজ তখনও খুব ডাঁটো ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, এই জেলে যাওয়াটা যেন তার কাছে নূতনও নয়, কষ্টকরও কিছু নয়। এ একটা কৌতুক মাত্র। সে তাই সেই কৌতুকটা যেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে নিজের মনে বিড়্‌বিড়্ করতে করতে উপভোগ করছিল!

নাকি ভ্যান্‌টা অ্যাক্‌সিডেণ্ট করবে আর সে মুক্তি পেয়ে যাবে—এই আশা তার তখনও ছিল, কে জানে?

কিন্তু বাস্তবিক তখন পর্যন্ত ভ্যান্‌টার অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বরং সেটা যেন আরো নির্বিঘ্নে আরো জোরে চলতে চলতে একসময় বিরাট একটা লৌহ দরজার সামনে এসে টুক্ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লো!

তৎক্ষণাৎ সেখানে পুলিশের দল কাছাকাছি যে যেখানে ছিল লাঠি বন্দুক হাতে নিয়ে দৌড়ে এলো মাননীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে!

অভ্যর্থনার কোথাও ত্রুটীও ঘটলোনা—সেই বিরাট লৌহ দরজার এক কোণে একটা ছোট্ট দরজা ছিল, সেটা খুলে দিলে; ছু'পাশে পুলিশের দল ঘিরে রইলো আর আমরা একের পর এক সুবোধ বালকের মতো দরজার ভেতর ঢুকে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক জব্বর জব্বর তালা পড়ে গেল দরজায়।

অমনি আমার ভেতরটাতেও দারুণ হাহাকার সুরু হয়ে গেল! আর কখন্ ঘটবে অঘটন? যতক্ষণ জেলখানার বাইরে ছিলাম ততক্ষণ যত অমূলক অসম্ভবই হোক না কেন তবু কোথায় যেন একটা ক্ষীণতম আশা ছিল হঠাৎ কিছু ঘটে যাবার। কিন্তু আর এখন সেটুকুও রইলো না! প্রাণটার মধ্যে 'হায় হায়' ক'রে উঠলো! আর কোনো মিরাকল্‌ই এই একগাছ উঁচু পাঁচিলের ভেতর থেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না! পারবে না!

কিন্তু ছট্‌পটানি আমার ঐ পর্যন্তই। এর বেশী আর কিছু ভাববার উপায়ও ছিল না সময় ছিল না। জেলে তখন অনেক কাজ পড়ে গেছে:

জমাদার বিরাট এক খাতা নিয়ে উপস্থিত। সেই খাতায় সাতপুরুষের নাম ধাম ঠিকানা দাও, টিপ সহি দাও। আবার হিন্দুস্থানী জমাদার বাংলা ভাল উচ্চারণ করতে পারেনি, তার সংশোধন ক'রে দাও—এমনি ধরনের তখন অনেক কাজ।

শশী মহারাজ বোধহয় বকতে একটু ভালবাসে। সেই অবস্থাতেও সে মুখে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি বল্‌ছিল…

জেলের লোকেরা অমনি ঝাঁঝিয়ে উঠলো—এ্যাই উল্লুক ক্যা বাচ্চা! কা গালি দেতা হায়? চোপ্‌রাও।

বলতে বলতেই গোদা পায়ের এক লাথি এসে পড়ল শশী মহারাজের পিঠে! সে উবু হয়ে বসে তখন বুড়ো আঙুলের ছাপ আঁকছিল জেলের খাতায়। লাথি খেয়ে হাতের কালি সারা খাতায় লেপ্‌টে যেতে আর এক মহাজনের আর এক রাম-চড় এসে পড়ল তার বাঁ-গালের ওপর! আহা, বেচারা শশী মহারাজ!

তারপর থেকে সবাই ঠাণ্ডা। এবার বেশ-বদলের পালা। আমাদের ধড়া-চূড়ো কেড়ে নিয়ে কয়েদখানার ঝলমলে ধড়া-চূড়ো পরতে দিলে। হাসপাতালের

পোশাকের মত খস্‌খসে মোটা খদ্দরের তৈরী একখানা হাফ প্যাণ্ট, একখানা ফতুয়া আর তার সঙ্গে একটা গান্ধী ক্যাপ। ভারি সুন্দর দেখতে লাগতো সেই বেশে।

জেলের শুধু বেশই পেলামনা, সেইসঙ্গে পেলাম ভোজনের নিমিত্ত পেতলের ভাঙা সরা, অ্যালুমিনিয়মের শত-সহস্র টোল-খাওয়া গ্লাস-বাটি। বলতে ভুলে গেছি, আরও আছে : সময়টা ছিল শীতকাল, তার উপযোগী ভেড়ার আস্ত লোমের দু'খানা কুট্‌কুটে কম্বল—তার একটাতে শয্যা আর একটা মাথায় দাও গায়ে দাও —যা খুশি করো। শেষে যখন জেল থেকে মুক্তি পেলাম তখন দেখি সারা গা চুলকানিতে ভরে উঠেছে। সে শুধু জেলের ঐ কম্বলের দৌলতে। কম্বল দুটো গায়ে দেবারও উপায় ছিলনা এত গা চুলকাতো, আবার ফেলে দেবারও উপায় ছিলনা এত প্রচণ্ড শীত তখন মথুরায়। সে এক বিষম জ্বালা!

এতক্ষণ পর্যন্ত জেলের দু'দরজার মধ্যেই কেটে গেল, জেলের অন্দরে তখনো প্রবেশ করতে পারিনি। বেশ বদল হয়ে গেলে অন্দরের দিকে আর একটি দরজা টুক্ ক'রে অম্‌নি খুলে গেল। তার মধ্য দিয়ে আবারও একে একে অন্দরে পৌঁছলাম। ভাবছি, আমরা কী সাংঘাতিক জীব! আমাদের আটকে রাখতে জেলের এতগুলি লোক একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল!

জেলের ভিতর তখন এলাহি কাণ্ড! সে কি ভয়াবহ জীবনযাপন প্রণালী—বাইরে যার এত নীরব নিস্তব্ধতা, অভ্যন্তরে তার এ কী জীবনের রূপ? বিরাট খোলা জায়গার একধারে চেয়ার টেবিল নিয়ে জেলরসাহেব ও তাঁর সহকারী অফিসার বসে আছেন। আর তাঁদের সামনে আমাদেরই মত অনেক কয়েদী কিছু সারি দিয়ে বসে, কিছু-বা দাঁড়িয়ে। তাদের মাঝে বিরাটকায় দারোগা জমাদাররা বেটন হাতে ছুটোছুটি করছে, কখনো-বা মোটা গলায় কম্যাণ্ডা দিচ্ছে পাহাড় ফাটিয়ে।

দলের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাই আমরা সে-স্থানে উপস্থিত হতেই সামনের যে কয়েদীদের সারি এইদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছিল তারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদিকে, বিশেষ ক'রে যেন আমাকেই দেখতে লাগলো।

কিন্তু শুধু দেখাই নয়, সেই কয়েদীদের মধ্যে বোধহয় আমার দিদিমা অর্থাৎ মায়ের মৃত মা দাঁড়িয়েছিল, সে এগিয়ে এল আমাকে আদর করতে!

তার হাতে পায়ে লোহার কড়ার সঙ্গে মোটা মোটা দুটো শিকল লাগান, তবু সেই পা নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে একরকম সুর টেনে টেনে বললে—ওরে, আমার কে রে! আহা বেচারা! এই

বয়েসেই জেলে আসতে হল গা? বলে আর আমার মুখে হাত লাগিয়ে দিদিমা-ঠাকুরমাদের মত টপাটপ্ চুমু খায়!

লজ্জায় আমি তখন কাঠ হয়ে গেছি—না পারি সেই হারকিউলিসের মত লোকটাকে সরিয়ে দিতে, আর না পারি নিজে সরে আসতে। যে-পুলিশ সঙ্গে এনেছিল সে তখন সাহেবকে বিচারের হুকুমনামা দেখিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপত্র নিচ্ছিল। সে কাছে থাকলেও এ লোকটা এমন করতে পারতনা। এদিকে লোকটা যেন মাতাল হয়ে গেছে!

আপনারা হয়তো ভাবছেন, ও-লোকটা নিশ্চয় পাগল-টাগল কিছু হবে? আমিও প্রথমে তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু না। পরে জেনেছি ওরা পাগল নয়, দিনের পর দিন জেলের কষ্ট নির্যাতন সইতে সইতে, পুলিশ-জমাদারদের হাতে অকারণে মার খেতে খেতে ওরা ওই রকমই হয়ে গেছে। বিবেক-বুদ্ধি সৌজন্যের বোধ কবে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে তার হিসেবই নেই ওদের।

ভাবছেন হয়তো, পুলিশ জমাদারদের সামনে অমন করছে, শাস্তির ভয়ও কি নেই ওদের?

জেলে শাস্তির ভয়ে ওরা ভাল হবে? ওদের বয়ে গেছে। ওরা শাস্তির ভয় করতে যাবে কোন দুঃখে? ভয় করবো আমরা যারা দু'একমাসের জন্যে জেলে এসেছি, সমাজ-সংসার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আবার ফিরে যেতে হবে—আমরা থাকবো সবসময় তটস্থ হয়ে যাতে পান থেকে চুণটি না খসে, আর যাতে জেলের মেয়াদ দু'দশ বছর বেড়ে না যায়। কিন্তু যারা বিশ-ত্রিশ বছর জেলেতেই কাটিয়ে দিলে তারা কি একটু আমোদ-ফুর্তি করার জন্যে দু'চার বছর জেলের মেয়াদ বেড়ে যাওয়াকে গ্রাহ্য করে, না জমাদারের শাসনকেই ভয় করে? আমার অল্প বয়েস দেখে ভাবলে ওকে দিয়ে একটু কৌতুক করে নেব, সবাই দেখে হাসবে!

কিন্তু এইটুকু মজা করতে গিয়ে যে এমন কাণ্ড ঘটবে তা কেউ ভাবেনি! যে-জমাদার সেই লাইনের তত্ত্বাবধানে ছিল, তার বিনানুমতিতে কয়েদী এমন ক'রে চলে আসাতে তার আত্ম-সম্মানে যেন খুব ঘা লাগল। তাছাড়া, জেলের মধ্যে যে জমাদারের দাপট সবচেয়ে বেশি, যার বেটনের ঘায়ে, ভারি বুটের লাথিতে জোর বেশি, তারই সেখানে সিংহের মত প্রতাপ! কয়েদীরা তাকে ভয়ও যত করে ভক্তিও তত করে—বিশ্রামের সময় তাই জমাদাররা যখন কারুর ওপর কৃপা ক'রে তাদের বুট সমেত চরণযুগল ঘাড়ে কিংবা কোলে চাপিয়ে দিত, তখন সেইজন মহাভাগ্যবান। আহ্লাদে সত্যিই একেবারে গলে যেতো সে!

তাই জমাদার রাগে ফুলতে ফুলতে রূপো-বাঁধানো দাঁতে কিড়মিড় করতে করতে ছুটে এসে হাতের মোটা বেটনটা তার ব্রহ্মতালুতে সজোরে বসিয়ে দিলে। আঘাতের ফলে লোকটা মরবে কি বাঁচবে তা দেখারও তার প্রয়োজন নেই। সামনেই চেয়ারে জেলারসাহেব বসে ছিলেন, মনিবের নিকট নিজের কৃতিত্ব বজায় রাখতে জমাদারের এরকম না করে তখন উপায়ও ছিলনা।

সাধারণ অন্য কেউ হলে সেই আঘাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো। কিন্তু কয়েদীর প্রাণ অত সহজে যায়না। সে নিঃশব্দে অত বড আঘাতটাও হজম ক'রে নিলে; তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আঘাতকারীর দিকে ফিরে লোহার শিকল-পরা হাত ছুটোকে একত্র মুষ্টিবদ্ধ ক'রে অবিবেচকের মত সহসা বাইশ মণ ওজনের এক মুদ্‌গর মেরে বসলো একেবারে জমাদারের মুখে!

আঘাতটা এমনি সজোরে পড়েছিল যে, জমাদারের মুখে যে-ক'টা রূপো-বাঁধানো দাঁত ছিল সেগুলো মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, আর জমাদার নিজে পিছন দিকে উল্টে এসে চিৎ হয়ে পডলো মাটিতে! মুখ দিয়ে তার তখন অজস্র রক্তের ফেনা ঝরছে! মনে হল জমাদার জ্ঞান হারিয়েছে।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই জেলের ভিতর লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল। কোথাও আগুন লাগলে ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ী যেমন 'গেল গেল' রব ক'রে ঘণ্টাধ্বনি করে, তেমনি ভাবে জেলের পেটা ঘড়িটাতে কে বেদম পেটাতে লাগল। আর ঘড়িটা তারস্বরে 'গেল গেল' করতে লাগল! জেলরসাহেব ও তাঁর সহকারী চেয়ারে বসে বসেই 'হাঁ হাঁ' ক'রে উঠলেন, জমাদার সিপাই পুলিশ মশাইরা অতিশয় সচকিত হয়ে ছুটে এলেন; আর আমার মত কয়েদীদের এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু ক'রে উঠলো।

পাছে আরও কিছু ক'রে বসে সেই ভয়ে বন্দুকধারী পুলিশেরা 'সেই কয়েদীকে গুলি করলে। গুলিটা যা হোক তার পায়ে এসে লাগল। কিন্তু আর কিছু দেখতে দিলে না। একজন জমাদার লগুড় হস্তে হুমকি দিয়ে আমাদের সকলকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনেছিলাম—সেই কয়েদীকে 'সেলে'র মধ্যে রাখা হয়েছে এবং তার শাস্তির মেয়াদ আরও কয়েক বছর দীর্ঘায়িত ক'রে দেওয়া হয়েছে।

ফাঁক পেয়ে এইবার শশী মহারাজ মুখ খুললে। আমাকে বললে, তুমি ভায়া কাজটা ভাল করলেনা। খালি খালি বেচারা জমাদারটাকে কষ্ট দিতে গেলে?

বললাম—তার মানে?

পিছন থেকে দলের একজন বললে—মানে, হাত দুটো তো ছিল? সম্বন্ধীকে একটি লম্বা ক'রে চক্ষু ফবিয়ে দিতে পারলেনা?

তার সঙ্গে অন্যরাও যোগ দিলে,—ঠিক বলেছো। চড় দিতে পারলেনা? ভয় কি? পিছনে আমরা তো ছিলাম?

আমি বলি,—বাঃ বাঃ। খুব ছিলে তোমরা? তখন সব রঙ দেখছিলে হাঁ করে! একটা চড় যাকে দিতুম তার কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হতনা, আর আমার হয়তো তাতেই জেলের মেয়াদ দশ বিশ বৎসর বেড়ে যেতো! এই ব'লে রাগ ক'রে তাদের সঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র সরে গেলাম!

যাক তবু ভাল! কয়েদবাসের প্রথম দিনেই আমার অনেক অভিজ্ঞতা মিলে গেল। সেক্শনের দরজায় গরাদের মধ্যে ভেড়া-ছাগলের মত মুখটা গলিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম, এখানের এই যে পশুর মত এমন হিংস্রতা, এদের মাঝে এই একটা মাস কাটাবো কেমন ক'রে?

কিন্তু এটুকু ভাববারও এখন অবসর নেই। দুপুরের খাবার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। যাদের এতটুকু দেরী হচ্ছিল তাদিকে একজন এসে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ব্যারাকের বাইরে সারি সারি নিমগাছের ছায়ায় মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা। প্রত্যেকেই খাবার বাসন নিয়ে সারিবন্দী বসে পড়লাম, আর চার পাঁচজন এসে পাঁচখানা তুঁষের মোটা রুটি, খোসাসমেত পাতলা ডাল পরিবেশন ক'রে গেল। পেটে তখন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, সেই খাওয়াই খেলাম কী পরম তৃপ্তিতে!

খাবার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম। এইবার আমাদের গৃহপ্রবেশ হল। জেল-খানায় এই গৃহকে বলে ব্যারাক। গরু-ছাগলের খোঁয়াড়ের মত লম্বা লম্বা চালাঘর, তাতে গোটা দশ-বারো মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালা আর একটিমাত্র দরজা। ওপরটা টালির ছাওয়া, নিচে সিমেণ্টের বাঁধানো মেঝে। সেই মেঝের অনেকখানা জুড়ে একজনের শোবার উপযোগী সিমেণ্টের উঁচু বেদী করা আছে।

প্রথম জেলের দরজায় ঢোকার মতো সেই ব্যারাকে ঢুকতেই আবারও অনেক-গুলি হাসিমুখ আমাদিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে-হাসিতে একটুও দরদ ছিলনা। তাদের হাসির ভাবটা যেন এইরূপ: আমরা এতদিন ল্যাজ-কাটা ছিলাম, এবার তোমরাও হলে; আমাদের দল বাড়ল—এসো এসো বঁধু, ভেতরে এসো, আধো আঁচরে বসো!

আমার মাথা ন্যাড়া ছিল, ভেতরে ঢুকতেই একসঙ্গে সকলেরই নজর এসে পড়ল সেই ন্যাড়া মাথার ওপর। কেউ 'আ-হা' ব'লে মাথায় হাত বুলোতে লাগল, কেউ-বা সেই সুযোগে একবার ডুগি-তবলা বাজিয়ে নিলে। তারপর আর এক-

আধজন নয়, সকলে মিলে বাজানো সুরু করলো—তাদের একজনকে বাধা দিলে অন্যজন অপরদিক থেকে ঘা লাগায়। তাদের সময়ও যেমন অনেক, ছোটছেলের মত প্রাণশক্তিও তেমনি প্রচুর—করছে তো করছেই।

এম্‌নি কতক্ষণ চলতো কে জানে? এমন সময় তাদেরই একজনের মন ঘুরে গেল, সে হঠাৎ খুব ভাল মানুষ হয়ে গেল। অন্য সকলকে সে একরকম চড়িয়ে-চাপড়িয়ে বকে-ঝকে নিরস্ত ক'রে বললে—আরে ছোড় দো ইস্‌কো, ইয়ে মেরা দোস্ত আছে। সে তারপর আমাকে তার নিজের জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল। সেদিনও বেঁচে গেলাম!

সেই ব্যারাকটুকুর মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন জাতির সমাবেশ হয়েছে, বাঙালী থেকে পাঞ্জাবী পর্যন্ত সবই রয়েছে। তবে সেই দেশের লোকই বেশি। যে-লোকটি আমাকে টেনে নিয়ে এল সে বললে—জানো, হামি মথুরার লোক আছে? হামার চাচাজী আবার পাণ্ডা আছে।

—এঁ্যা, তাই নাকি? আমি অবাক হয়ে বলি—তুমি মথুরার লোক?

অতো যে মারধোর কিছুই আমার মনে রইলনা, আমি মথুরার লোক শুনেই আনন্দে আটখানা! সেদিন আরো দু'জন মথুরার লোকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

তারা আমাকে 'বঙ্গালী' ব'লে ডাকতে লাগল। আমাকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে দেখে সেদিন তারা রীতিমত অবাক হয়ে গেল। তাদের হিন্দী-ভাষায় আমাকে বললে, কি বঙ্গালী, তুমি যাদু জানো না? তুমি না পি.সি. সরকারের লোক আছো? তবে তুমি জেলে কি করতে এলে? যাও, দেওয়াল টপ্‌কে ভাগ যাও!

আমি লজ্জিত হয়ে জবাব দিলাম,—না ভাই, যাদুর 'যা'ও জানিনা! আমি কি জানতাম যাদুটা এত কাজে লাগবে? অমন জানলে পি. সি. সরকারের কাছ থেকে ও-বিদ্যেটা শিখে আসতাম। তিনি তো আমাদের ঘরের পাশেই থাকেন। যা ভুল হবার হয়েছে, এবার জেল থেকে মুক্তি পেলেই আগে যাদুটা শিখে নেব!

আমার হিন্দী কথা শুনে, না রসিকতা শুনে জানি না তারা খুব হাসতে লাগল।

তারা তারপর আমাকে অনেক কথা জিগ্যেস করতে লাগলো: আমার বাড়ি-ঘরের কথা, আত্মীয়দের কথা, কি জাতি—মুকারজি না বানারজি, কতদূর লেখাপড়া শিখেছি, ইত্যাদি। কলেজে পড়ছিলাম শুনে বললে—কালেজ মে পড়তা থা? তবে কেন জেলে মরতে এলে? আচ্ছা, এসেছ বেশ করেছ—সাহেবের সঙ্গে তুমি তাহলে ইংরেজীতে কথা বোলো। পড়ালিখা জানি না ব'লে সাহেব বড় ঘেন্না

করে আমাদের! বলে, মুখ্খুর ডিম। এবার দেখিয়ে দেব বেটাকে! আমাকে ব্যারাকের সকলের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল।

কিন্তু যখন আমার অপরাধের কথা বললুম তখন তারা আমলই দিলেনা। মনে হল কথায় কথায় মানুষখুন করাটাও তাদের কাছে লোককে গালাগালি দেওয়ার সামিল! অপরাধ ক'রে যারা জেলে আসে তারা সবাই কয়েদী হলেও তাদের মধ্যে আবার কুলীন-কায়স্থ আছে—ব্যাঙ্ক ট্রেজারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ, রাজপথে দিনমানে মানুষখুন ইত্যাদি যারা করে, তারাই হল জাতকুলীন; বাকী সব যারা ঘটিটা-বাটিটা, টাকাটা-সিকেটা চুরি করে, ছিন্তাই লম্পটগিরি করে, তারা সবাই হল অধম। উত্তমেরা এদের ঘৃণা ক'রে বলে 'মুরগী চোর'—মানে, সংসারে এত সব ঐশ্বর্য থাকতে তোরা কিনা দু'চার পয়সার লোভে হাত খারাপ করিস্! তোদিকে ধিক্!

এই অধমেরা সত্যিই বড় দুর্বল, সমাজের একদল পরচর্চাকারী লোকের মত তারা নিজেদের দোষ ঢেকে অন্যের দোষ জাহির ক'রে বেড়ায়। এদিক দিয়ে কুলীন কয়েদীরা অনেক ভাল। যত অপরাধই করুক সব অপরাধের কথা অন্যের কাছে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে। তারা দেহে মনে প্রাণে শক্তিশালী। আমার যত বিদ্যেই থাক, যতই আমি পি. সি. সরকারের দেশের লোক হই না কেন, উত্তমদের সঙ্গে আমার একটি দিনের জন্যেও ভাব হয়নি, হয়েছিল শুধু অধমদের সঙ্গে।

সে যাই হোক, এরকম কথাবার্তা চলতে চলতেই বিশ্রামের সময় পার হয়ে কাজের ঘণ্টা পড়ল। আমরা বাইরে এসে লাইন দিতে জমাদার গুণ্তি মিলিয়ে নিলে। তারপর সাহেব এলেন কাজ-কর্মের ব্যবস্থা করতে। আমাকে তিনি হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন, কাজ-পাট জানো কিছু, না?

আমি তখন পর্যন্ত হিন্দীভাষা শিখিনি, আর তার প্রয়োজনও কখনো এত অনুভব করিনি। তাই সাহেবের টক্টকে গোরা মুখের খাস হিন্দী কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। তাঁর এ-কথাটা হয়তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু পরেরগুলো তড়বড় করে যখন আরো বলবেন তখন কি হবে? তাছাড়া সামনের লাইনে পরিচিত লোকেরা আমার মুখের দিকে চেয়ে ইংরেজী বলার জন্যে ইশারা করছে, আমি তখন মরিয়া হয়ে ব'লে ফেললাম—ইক্স্কিউজ্ মী স্যার, আই ক্যাণ্ট স্পীক্ হিন্দী।

—সাহেব মুখটা ভার ক'রে বললেন—ডু য়্যু নো প্রোপার আংলিশ্?

বললাম—ইয়েস্ স্যার, আই ক্যান টক্ ইন্ ইংলিশ...

—ওঃ! য়্যু ক্যান্! ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন সাহেব। কি জানি কি দোষ

হল? কিন্তু আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যে অনেক দোষ অনেক ব্যবধান—তিনি সাহেব আমি কয়েদী! কয়েদীর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধছে। তাই শেষের দিনটি ছাড়া আর কখনো ইংরেজী বলিনি, চুপ ক'রে আদেশ পালন করেছি, বুঝতে না পারলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছি।

সাহেব দয়াপরবশ হয়ে প্রথম দিন ফুলগাছে জল দিতে দিলেন। কিন্তু পরের দিনই আমার কাজ বদলে গেল। অন্য সকলের সঙ্গে দড়ি পাকাতে দিলেন।

কাজ দেখে ভাবছিলাম, এরকম দিনই বোধহয় আমার যাবে বরাবর! ছোটবেলায় মা গল্প করতেন, যারা চুরি-ডাকাতি কবে তাদের জেলে নিয়ে গিয়ে গাড়ি টানতে দেয়, তেলের ঘানি ঘোরাতে হয়, দুপুর রোদে পাথর ভাঙতে হয়—একবার একটু থেমে পডলেই ওপরে মুগুর ঝোলানো থাকে, অমনি দুম্ ক'রে মাথায় পড়ে যায়!

আমি জেরা ধরতাম, মুগুরটা পডবে কি ক'রে—আমাদের মত মুগুরটা কী দেখতে পায়? মা উত্তর দিতেন, তোব সঙ্গে আমি আব পেবে উঠিনি, বাপু। তা কেন, সেখানে কতরকম কল-কব্জা রয়েছে, একজন পুলিশ তাকে লক্ষ্য করছে, একটু থামলেই সে সেই কল-কব্জা ছেডে দিচ্ছে—অমনি মুগুরটা তার ঘাড়ে এসে পড়ছে গদাম্ ক'রে!

এখন দেখছি, মা আমাকে নেহাৎই ভয় দেখিয়েছিলেন! দড়ি-পাকানো আবার একটা কাজ? এ-কাজ আমি খুব পারবো! আমাদের দেশে যেমন বাবুই-এর দড়ি হয় তেমনি এদেশে বেনাগাছের মত এক প্রকার শরগাছ জন্মায় খাল বিলের ধারে। সেই পাতাকে ছেঁচে তা থেকে মজবুত দড়ি এবং সেই দড়ি থেকে খাটিয়া থলি প্রভৃতি তৈরী হয়।

কিন্তু কি হল জানি না, দড়ি পাকাতে বসে প্রাণপণে পাঁচ-ছ' হাতের বেশি পারলাম না। সন্ধ্যাবেলায় সাহেব কাজের হিসেব নিতে এসে খুব একদফা ক্রুদ্ধ হলেন, সেই পাকানো দড়িটা দিয়েই আমাকে চাব্‌কে দিয়ে গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। তারপর পাণ্ডা-কয়েদীকে, মানে জেলের ভাষায় যাকে ওয়ার্ডার বলে তাকে কি চুপি চুপি নির্দেশ দিয়ে দিলেন পরের দিনের জন্যে। কথা বুঝতে পারলামনা বটে কিন্তু মুখের কাঠিন্য দেখে মনে হলো সে-কাজ যেমন তেমন একটা হবেনা।

অনুমান মিথ্যে হয়নি। পরের দিন সকালবেলায় মুসুরিডাল সিদ্ধর মত লপ্‌সি নামে একরকম ও-দেশীয় খাদ্য খাইয়ে পুলিশ আমাকে কামারশালে নিয়ে গেল।

হ্যাঁ, কামারশালাই সেটা। অপরিমেয় তার আয়োজন। দু'তিনজন কয়েদী কামারের কাজ চালায়, একজন মুক্ত হয়ে গেলে তার স্থানে আর একজন বহাল

হয়। সেই কর্মকাররা আমার হাতে ধর্মের বলির মত মোটা মোটা বালা আর পায়ে শিকল পরিয়ে দিলে। শিকল-বালা জোড়ার সময় হাত-পা লোহার নেহাইর উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারতে লাগল—যন্ত্রণায় যত আমি আর্তনাদ করি তত তারা হাসে এবং আরো জোরে আরো অসাবধানে হাতুড়ি পিটতে থাকে। সে কি পৈশাচিক অমানুষিকতা! একটা মানুষকে জড়পদার্থের মত ব্যবহার করতে তাদের কোথাও এতটুকু বাজে না!

তারপর জেলের ফটকের বাইরে এসে দেখি, যে-কজন আমরা একসঙ্গে ধরা পড়েছিলাম সবাই একই দলে এসেছি। দু'পাশে দু'জন পুলিশ বেটন হাতে পাহারা দিতে দিতে নিয়ে চলল গেটের কিছু দূরে সব্‌জিক্ষেতে। ক্ষেতের কাজ ছিলনা তখন, একটা গোশালা তৈরীর জন্যেই আমাদের আনানো হয়েছে।

ও-দেশের আঠালো লাল মাটি ইঁটের গাঁথুনিতে সিমেণ্ট-সুরকির কাজ হয় আমাকে কাজ দিলে, সেই মাটি তৈরী করতে। এক কোমর মাটি ভেজানো ছিল, তাকে কোদাল দিয়ে নরম ক'রে দিলাম—এ-কাজটাও একরকম করা যায়। কিন্তু সেই কোমর অবধি কাদায় দাঁড়িয়ে লোহার কডাতে কাদা ভর্তি ক'রে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে অন্য একজনের হাতে দেওয়া?

হ্যাঁ, এবার মনে পড়ল মায়ের সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—কাদা তোলা দূরে থাকুক, মনে হল এবার কবরের মধ্যে গোটা শরীরটা ঢুকে যাবে। আমার অক্ষমতায় ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশ একতাল কাদা ছুঁড়ে মারলে আমার মুখে। তারপব অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে আমার কাজটা অন্য একজনকে দিয়ে দিলে।

এমনি ক'রে দেওয়াল কিছুটা বেড়ে উঠতেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ছুটি হয়ে গেল। পুলিশেরা আমাদের হাত-পা ধোওয়ার সুযোগ দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলে সকলেরই ক্ষেতের সেই লক্‌লকে ফুলকপির উপরে নজর পড়ল। আহা! কয়েদীদের শ্রমে ক্ষেতের এত উৎপাদন, অথচ সাহেব-জমাদারেরা এ-সব ভোগ করে, তারা পায় শুধু বাঁধাকপির উপরে শক্ত পাতাগুলো; এই পাতাগুলোই কোন কোনদিন জলে সিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। আজ কিন্তু সেই ফুলকপি দেখে কেউ লোভ সামলাতে পারলনা, জনকয়েক গিয়ে ক'টা ফুল ছাড়িয়ে সেইখানেই খেয়ে ফেললে। আমি মনে মনে ভাবছি, এরা কি রাক্ষস! কাঁচাফুলগুলো খাচ্ছে?

এমন সময় শশী মহারাজ এসে বললে, আমাদের উপর রাগ দেখছি এখনও তোমার পড়েনি? যতই হোক আমরা তোমার চেয়ে বয়সে বড় না? এই নাও, খেয়ে ছাখো ভায়া—ঠিক অমৃত কিনা? এই ব'লে দুটো ফুল গুঁজে দিলে হাতে।

খেয়ে দেখি সত্যিই অমৃত ! না খেয়ে দেখলে চিরটাকাল অবিশ্বাস রয়ে যেত !

দু'তিন দিন পরে আমার কাজ পড়ল একেবারে খোদ জমাদারের বাড়িতে। জেলের বাইরে যেদিন কাজ পড়ল, সেদিন মনে বড় অনুশোচনা হয়েছিল এই ভেবে যে, যদি দড়ি পাকানোর কাজটা ভাল করতাম তবে হয়তো এই কষ্টের কাজে পাঠাতনা ? আজ জমাদারদের ঘরে এসে সে-ভুল ভাঙলো। আমার মত কত শত আগে থেকেই এদের সেবায় নিযুক্ত—এদের চাকর-চাকরাণী রাঁধুনী খানসামা সকলেই কয়েদী।

হঠাৎ দেখি অদ্ভুত ব্যাপার। যে জমাদার সেদিন মার খেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল সে-ই জমাদারই খোলা উঠোনের বকুলতলায় চাটাই-এর ওপর শুয়ে আছে, আর একজন কয়েদী তার বুকের ওপর বসে কাঁচি দিয়ে ভেড়ার লোম ছাঁটার মত সারা গায়ের লোম ছেঁটে দিচ্ছে। জানিনা, এই লোম দিয়ে কিরকম এবং কাদেব জন্যে কম্বল তৈরী হবে ?

রণবেশে সেদিন যে জমাদারকে দেখেছি, তার এই কুৎসিৎ ছবি দেখতে কেমন যেন চোখে লাগে। আমাকে দেখে চিনতে পারলে কিনা কে জানে ?

না না, পেরেছে বৈকি , ফোক্‌লা দাঁতে একটু হেসে যে-লোকটি কাটছিল সে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল ব'লে তাকে একটা চড কসিয়ে দিলে—এ্যাই বে, ক্যা তমাসা দেখ্‌ রহে হো ? জল্‌দি কর্‌ !

ভাবছি, সেদিন তাহলে কয়েদীর হাতে মার খেয়ে জমাদার মরেনি ? বরং মরলেই সেদিন সুশোভন হত !

সেইদিন বিকেলে জমাদারবাড়ীর কাজ থেকে ফিরে এসে সবে খেতে বসেছি, এমনি সময় 'এলার্ম বেল' পড়ে গেল ; অমনি মুহূর্তের মধ্যে পালে বাঘ পড়ার অবস্থা হয়ে গেল ! দু'একজন যাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তারাই শুধু বেঁচে গেল। আর সকলেরই মাথায় এসে পড়ল বেটনের নির্দয় প্রহার। কয়েদীরা খেতে খেতেই প্রাণপণে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ব্যারাকগুলোর মধ্যে।

যোগ বুঝে আমাদের দলটির সেদিন কাজ থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল। জমাদারদের পায়খানার ভিতরের দেওয়াল ও মেঝে মেরামত ক'রে এসেছি। বাড়িতে হলে গঙ্গাস্নান না করলে ঘরে ঢুকতে দিতনা—দেরী হবার ভয়ে কোনোরকমে হাতটা ধুয়ে খেতে বসেছিলাম, এবার আর এঁটো হাতটা ধোওয়ারও সময় দিলেনা। ব্যারাকে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দিলে।

শীতকালের সন্ধ্যে। তখনই ব্যারাকের মধ্যে এবং বাইরে নিমগাছগুলোর মধ্যে

অন্ধকার নেমে এসেছে। ব্যারাকের ভিতরে আলো জ্বলে উঠতেই মথুরার কয়েদীরা জয় রাধেশ্যাম জয় ব'লে একস্বরে হাততালি দিয়ে কেউ-বা পেতলের সরা বাজিয়ে ভজন ধরলে। এই সন্ধ্যেবেলাটি সত্যিই জেলে মনোরম হয়ে ওঠে। বিশ্বাসই হয়না জেলে রয়েছি ব'লে! মনে হয়—হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণের দেশ বটে! আমি তাদের সঙ্গে গাইতামনা বটে তবে, মনে মনে কিছু করতাম। কিন্তু আজ করবো কি ক'রে—হাতটা যে উচ্ছিষ্ট?

হঠাৎ অদূরে নজর পড়তেই দেখি একজন কুঁজো থেকে জল ঢেলে খাচ্ছে। আঃ! এত সহজে সমাধান হয়ে গেল! তাকে গিয়ে অনুরোধ করলাম, আমাকে তোমার একটু জল দাও না ভাই?

লোকটি ছিল মারাঠি। তার পরিপুষ্ট দেহে ক্রোধটা একটু বেশি রকমেই ছিল। নিজের ভাষায় বকতে বকতে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমাকে লোকটি একেবারে মারতে এলো—ভাগ হিঁয়াসে, জল খাবে তো জল আনতে পারনা? ব'লে জলের কুঁজোটা এক ঝটকায় সরিয়ে নিলে!

কিন্তু আমি জলের কুঁজো পাব কোথায় তা সে জানেনা। ঘরে যে ক'টা কুঁজো ছিল সেগুলো পুরনো কয়েদীরা দখল করেছে। আমি তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে সেই এঁটো হাতেই মনে মনে নাম করতে সুরু করলাম। কিন্তু কি যে হল, দু'চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার কোনো শাসনই মানলেনা!

এমন সময় এক অঘটন ঘটলো। সেই লোকটি কি মনে ক'রে জলের কুঁজো বয়ে নিয়ে এসে আমায় ডাকছে—এ বঙ্গালী! এ লো, পানি লো!

হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে জল নিলাম। জল তো পেয়ে গেলাম, অভাব মিটল? তবু কি কারণে, বসতেই আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অশ্রুর বেগ বেড়েই চললো!

কিছুদিন থাকতে থাকতেই আমি দুটো হিন্দি কথা রপ্ত ক'রে ফেলেছিলাম—'বাতাও' আর 'কেয়া চল্‌তা হ্যায়'। কথায় কথায় সবাইকে এই নতুন-শেখা কথা ক'টি ব'লে বসতাম, আর তারা পুনরায় সেই কথাটি অনুকরণ ক'রে ঠাট্টা করতো।

একদিন ব্যারাকের মধ্যে একজন নিরীহ বৃদ্ধলোক চুপ ক'রে বসেছিলেন, আমি সেইদিকে যেতে তিনি একটু হাসলেন। এই হল তাঁর অপরাধ! আমি অমনি তাঁকে জিগ্যেস ক'রে বসলাম,—কেয়া চল্‌তা হ্যায়?

লোকটিও বিশেষ কৌতুক অনুভব ক'রে উত্তর দিলেন, শ্বাঁস—শ্বাঁস চল্‌তা হ্যায়, আভি মর্‌ যাউঙ্গা।

কিন্তু এ কি? এ তো কয়েদীর মত কথা হলনা? কয়েদী তো মরেনা কথনো—শত দুঃখ নির্যাতনেও না, এমন কি ঠাট্টার ছলেও না! তবে?—এ-সব কথা মনে মনেই ভাবছি, বলিনা কিছু। মুখে শুধু বললাম,—যাঃ! মরবেন কোন্‌ দুঃখে? আমি কি তা-ই বলেছি নাকি?

তিনি কিছু কিছু বাংলা বোঝেন, এবার তিনি হেসে ফেললেন—আরে নেই নেই, হামি মরবে না; ভয় নেই! শোন এখানে—তুমি কোন্‌ দেশের বাচ্চা? দেখি তোমার হাতটা?

এই ব'লে খপ্‌ করে আমার হাতটা ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন—উঁহুঁ, তুম্‌কো লোট যানা হোগা!

লোট? লোট আবার কি?

তিনি ঘাড়টা একরকম কাৎ ক'রে বললেন,—হাঁ হাঁ ঠিক কইছি, তুমাকে ফেরে যেতে হবে!

আমি এবার বুঝে ফেললাম কি তিনি বলতে চাইছেন: আমি যে-উদ্দেশ্য নিয়ে পথে নেমেছি তা সিদ্ধ হবে না; আমাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে।

আমি রুখে উঠলাম—কক্ষনো না। আমি মরবো তবু আর ঘরে ফিরে যাবনা!

তিনিও এবার দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, তব্‌ তুম্‌কো বহোৎ কষ্ট্‌ উঠানে পড়েগা!

জেলের মধ্যে এই একটিমাত্র ব্যক্তি আমার মনে যুগপৎ কৌতুহল ও শ্রদ্ধা এনে দিয়েছিল। জেলঘরে নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে আপন মনে বসে থাকতেন। কথনো কারো সাথে বেশি কথাবার্তা নাই, ঝগড়া-ঝাঁটি নাই। যার প্রয়োজন হত সে-ই তাঁর কাছে যেত। তার উপর, তিনি হস্তরেখাবিদ, মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি গোঁফ। জানতে কৌতুহল হত ইনি তবে কিসের জন্যে জেলে এসেছেন?

সে যা হোক, জেল গেটের বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে করতে যতই আমাদের দলটি গুড্‌ কণ্ডাক্‌ট্‌ এবং গুড্‌ কারেক্টর-এর পরিচয় দিতে লাগল, ততই আমাদের উত্তরোত্তর পদোন্নতি ঘটতে লাগল—পুলিশ-জমাদাররা আমাদের আরো দূরে দূরে নিয়ে যেতে লাগল। খোলা মাঠের মাঝখানে একটা খালের ধারে ধারে শরগাছ হয়েছিল, দড়ি তৈরির জন্য সেই শরগাছের পাতা কাটতে নিয়ে চলল আমাদের।

সেই সময়টা ছিল শীতকাল। আমার বড় হাত-পা ফাটতো। তার ওপর শরগাছের পাতার আগাগুলো ছিল ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ। সেই শরবনের মধ্যে হাত

ঢুকিয়ে যখন কাস্তে চালাতাম তখন হাতের আঙুলের উপরের চামড়া, বিশেষ করে গাঁটগুলো একবারে থান্ থান্ হয়ে কেটে যেত, আর দরদর ধারে রক্ত গড়িয়ে পড়ত। যতই সতর্ক থাকি না কেন, কি ক'রে যে কেটে যেত তা একটুও টের পেতামনা। কষ্টের চোটে চোখ দিয়ে আপনা হতেই জল গড়িয়ে পড়ত! কিন্তু তায় বলে একটু আহা উঁহু করারও উপায় ছিল না তার জন্যে! পুলিশ লাঠি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কোমর একটু সোজা করলেই বেতের ঘা এসে পড়ছে দুম্ দাম!

তবু এমন কষ্টের মধ্যেও একটি গোপন সুখের স্থান ছিল—এই কাজের স্থানে এসে দাঁড়ালে সমগ্র সত্তা এক সুখের আবেশে জুড়িয়ে যেত! একদিকে এই জেলটা ছাড়া বাকী তিনদিকেই শুধু সবুজক্ষেত। আবার সেই সবুজক্ষেতের একেবারে শেষ সীমানায়, দূরে বহু দূরে ঘন গাছের সারি দিয়ে কী অপরূপ দিগ্বলয় রচিত হয়েছে! আমার কেবলই মনে হতো, এরই কোনো-না-কোনোদিকে রাধাকৃষ্ণের সেই বৃন্দাবনধাম লুকিয়ে রয়েছে। শুধু এই কথাটুকু স্মরণ ক'রেই আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম বারবার। কাছে পুলিশ না থাকলে সেইখান থেকেই মাটিতে লুটিয়ে তাঁদের একবার প্রণাম ক'রে নিতাম।

শেষের দিনটিতে কাজ পড়ল খালের কাছাকাছি একটা ভাঙা বাড়িতে। সেই ভাঙা বাড়ির ইঁট ভেঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হবে সাহেবের যেখানে গোশালা তৈবি হচ্ছে সেখানে। আমাদেব মধ্যে একজন সেই ইঁট অন্য সকলের মাথায় চাপিয়ে দিতে লাগল। আমার খালি মাথাতেই আট-দশটা বেশ বড় থান ইঁট চড়িয়ে দিলে —একটা ইঁটও আর মাথা থেকে পড়লে চলবেনা। পড়তোও না আমার। আমি তো কিছু আর ছোটছেলে নই, পড়বে কেন? কিন্তু কাল হল রাস্তার কাঁটা! সব রাস্তাতেই রেড়ীর বীচির মত ছুঁচওয়ালা ছোট ছোট শক্ত কাঁটা পড়ে থাকে, কিংবা কয়েদীরা যাতে ছুটে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে জেলের লোকেরাই ফেলে রেখেছে, কে জানে? সেদিন মাথায় ইঁট নিয়ে খালি পায়ে চলতে চলতেই একসময় একটা কাঁটা পায়ে এমন বিঁধল যে আমাকে একেবারে নাচিয়ে তুলল— মাথার ইঁট ক'টা পড়ে ভেঙ্গে গেল। আমি বসে বসে নিজেই সেগুলো আবার তুলে নিচ্ছিলাম। পিছনেই পুলিশ আসছিল, মুখে কি একটা অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে পায়ের ভারি বুট দিয়ে জোরে মারলে আমার কোমরে। যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে আমার অজান্তে আর্তনাদ বেরিয়ে এল—ওঃ গুরু!

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেখানে বসে বসে কাঁদবার বা আক্ষেপ করার সময় ছিলনা, তাতে হয়তো পুলিশের ক্রোধ আরো বেড়ে যাবে, আরো লাথি মারবে। নিজেই

একহাতে ইঁট মাথায় সাজিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় অপরূপ দৃশ্য দেখে একবারে চমকে উঠেছি—আরে! ওরা কারা? ওদের তো একদিনও দেখিনি এ-পথে?

আমাদের সামনে দিয়েই পায়ে-চলা একটা মেঠো পথ চলে গেছে, সেই পথ ধরে কয়েকজন রমণী ওদেশীয় মাটির হাঁড়ি একসঙ্গে ছোট বড় তিন চারখানা পরপর মাথায় সাজিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পায়ে রূপোর মল, আর সেই মলের ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত লাল নীল রঙিন শাড়ি মাঠের হাওয়ায় পত্ পত্ ক'রে উড়ে তাদের পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কখনো হাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে অশান্ত শাড়ি সামলে নিচ্ছে। তাদিকে দেখেই মন যেন আমার আনমনা হয়ে উঠল—ঐ বুঝি বৃন্দাবনের ব্রজাঙ্গনারা! শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আজও তারা তেমনি ক'রে দিনে রাতে অভিসারে চলেছে! আমি অপলক নেত্রে চেয়ে রইলাম তাদের চলতি পথের দিকে। আমার মত ভাগ্যবান বুঝি আর কেউই ছিলনা সেদিন! আমার যে তরুণ হৃদয়খানি অহরহ কা'কে যেন সেবা করবার জন্যে, ভক্তি নিবেদনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকত, তাকে আমি সেই রমণীগণের সঙ্গে একান্ত সংগোপনে সেই নির্জন পথ বেয়ে কোন্ এক অজানা বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ ছায়াসুনিবিড় লতা-কুঞ্জ-ময়ূর-ময়ূরী-বেষ্টিত কোন্ এক অপরিচিত গৃহের বা মন্দিরের উদ্দেশে প্রেরণ ক'রে দিলাম!

[দুই]

এম্‌নি ক'রেই পুরো একটি মাস কেটে গেল।

শেষ দিনের সকালে আমাকে আর শশী মহারাজকে জেল-গেটে নিয়ে এসে আবার খাতার সঙ্গে আমাদের দেহের লক্ষণ মিলিয়ে মুক্তির পরোয়ানা দিয়ে দিলে। আগেকার পরণের সেই কাপড়-জামা তাল পাকানো ক'রে বাঁধা ছিল কাঠের তাকের ওপর, জমাদাররা সেগুলো নিয়ে এসে আমাদের গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানালে।

আবার শুধু এইটুকুই নয়, জেলার সাহেব নিজে এসে নগদ আড়াইটি টাকা আমাদের হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে, প্রথম চাকরির ক্ষেত্রে টাকা উপায় করতে যাবার সময় খুব আপনজন যেমন মুখের দিকে চেয়ে হাসে তেমনি ক'রে একখানি মিষ্টি হেসে বললেন—অনেকগুলো টাকা, অনেকদিন চলবে'খন! যাও, বাইরে গিয়ে এই টাকাগুলো দিয়ে এবার পেট ভরে লুচি-মিষ্টি খাও গে! তারপর এ-জায়গাটা তো দেখাই রইলো, অস্থবিধে হলেই আবার তখন চলে এসো!

আমি কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম! জেলার সাহেবের এমন ঠাট্টাকেও ঠাট্টা ব'লে মেনে নিতে পারলাম না! অ্যাঁ, এরা বলে কি? একমাস এমন থাকতে খেতে দিলে, আবার আসবার সময় কিনা আড়াই টাকা দক্ষিণা?

আমার যেন স্থখের ওপরে স্থখ!

যাদের সঙ্গে এতদিন জেলের মধ্যে কাটালাম তাদের একজনের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেও ছিল বাঙ্গালী। আবার একই •ব্যারাকে থাকতাম আমরা। কেন আমি জেলে এলাম, মুক্তি পেলে বাংলাতে না গিয়ে কেন বৃন্দাবনে যাবো—এ-সব কথা সে আমার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল। অবশ্য সে তার নিজের কথাও জানিয়েছিল, বলেছিল: দিল্লীতে সে একটা বড় পোস্টে চাকরী করে। কলকাতাতে তার বাপ মা ভাই বোন যুবতী স্ত্রী রয়েছে। কর্মস্থল দিল্লী যাবার পথে ট্রেনে তার যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে যাওয়ায় সে ট্রেনের টিকিট দেখাতে পারেনি ব'লে তাকে জেলে আসতে হলো।

শুনে অবাক হয়ে তাকে বলেছিলাম—এই সামান্য অপরাধে এত কঠিন শাস্তি? কত দিনের জন্যে জেল হলো?

কোনো কয়েদীই প্রাণ ধরে এই কথাটা সত্য বলতে পারে না। সে-ও পারলে না। শুধু বললে—জেলের মেয়াদ কাটতে আর তার মাস দুই বাকী।

কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো, অনেকদিন থেকেই সে জেলের ঘানি টানছে। কলকাতার বাবুর চেহারাটাও একেবারে দুর্বৃত্তের মতো হয়ে গেছে, এবং কেন জানি না আমার মন বললে, দু'মাস পরেও তার ছুটি পাবার সম্ভাবনা নাই।

মনে মনে এই সব কথা চিন্তা করছিলাম, সে বললে—কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তৎক্ষণাৎ নিজের পায়ের দিকে দেখিয়ে বললে—বিশ্বাস না হয়, এই বুট জুতো দেখে বোঝো। কয়েদীর পায়ে কি কখনো বুট জুতো থাকে? আমি হলাম অন্য ক্যাটিগরির কয়েদী, তাই আমাকে এরা এ-সুযোগ দিয়েছে। জমাদারদের জিম্মায় এখনো আমার অফিসের স্যুট ঘড়ি সোনার বোতাম আংটি জমা আছে তা জানো?

জানতাম না তা স্বীকার করতে হল। কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এই ভেবে যে, সোনার বোতাম-আংটি এবং ঘড়ির বিনিময়েও কি তার রেলের টিকিটের দামটা হ'ল না যার জন্যে তাকে জেলে আসতে হল? তাই ভাবছিলাম, আহা! কয়েদীদেরও অন্যের কাছে বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকবার প্রতি এত লোভ? কি হবে তারই মত আর একজন কয়েদীর কাছে বিশ্বাসের পাত্র হয়ে থেকে?

সে যাই হোক, পরে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, তার ঐ জুতোর কথাটাও সত্যি নয়। কারণ, জেলের পুরনো কয়েদীদের অনেকের পায়েই হিন্দুস্থানী নাগরাই জুতো দেখেছিলাম। দেখে তখন ভেবেছিলাম—হায় রে, যদি পায়ের জুতোটা কাজে লাগবে না ব'লে সেদিন পথের মাঝে অমন অবহেলায় ছেড়ে না দিতাম, তাহলে আজ এই কাঁটাবনে সাহেবদের ইঁট বহার কাজে কত সুবিধে হতো।

তাই তার একটা কথাও বিশ্বাস করতে পারিনি। তবু কিন্তু তাকে ভাল-বেসেছিলাম এবং প্রবল ইচ্ছে করতো তাকে বিশ্বাস ক'রে আরো খুশী করি!

ছুটি হবার আগের দিনে সে আমাকে বললে,—তুমি তো বৃন্দাবনে যাচ্ছ? যাবার সময় আমার একটা কাজ ক'রে দিয়ে যাবে?

বললাম—বলো কি কাজ? সাধ্য হলে নিশ্চয় করবো।

আমার নামে পুলিশের হাতে দু' প্যাকেট সিগরেট কিনে দিয়ে যাবে? আমি দিল্লী যাবার পথে তোমাকে খোঁজ ক'রে সিগরেটের দামটা দিয়ে আসবো'খন।

তাকে বললাম তা করবো, কিন্তু কাজটার নাম শুনে 'হাঁ' বলবার আর সাহস হয় না! ভয় পেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি—পুলিশের হাতে সিগরেট দিতে গিয়ে আবার নূতন কোনো বিপদে পড়বো না তো?

সে বুঝতে পেরে বললে—আরে, না না, এতে তোমার ভয়ের কারণ নেই। রাত্রিবেলায় ছাখোনি পুলিশেরা বিড়ি-সিগরেট কিনে এনে আমাদের দিয়ে যায়?

হ্যাঁ, তা দেখেছিলাম বটে। পুলিশদের সঙ্গে তাদের আধাআধি বখ্রা—দু'প্যাকেট সিগরেট দিলে এক প্যাকেট পুলিশের, আর এক প্যাকেট তাদের।

সেই ভরসাতেই এখন জেলের বাইরে এসে রাস্তার পাশের দোকানে আমি সিগরেট কিনতে গেলাম।

পেছনে শশী মহারাজ বাধা দিয়ে বললে—কেন শুধু-শুধু ভূতের বেগার খাটো? ওরা সবার কাছ থেকেই অমন ক'রে আদায় করে—আমাকেও বলেছিল!

তবু সেই কাজটি আমি অনেক যত্নে অনেক সোহাগ ভরে সম্পন্ন করলাম। জানতাম, এতে ভূতের বেগার খাটাই সার হবে, পয়সাগুলো আমাব আদায় হবে না—সে বৃন্দাবনেও যাবে না আর আমার সঙ্গেও দেখা করবে না। তবু করলাম। না ক'রে আমি থাকতে পারলাম না। আহা! আমার তো আজ ছুটি হয়ে গেল, কিন্তু ওদের যে কত দিনে হবে কে জানে? তবু যদি দুটো সিগরেট খেয়েও জেলের কষ্ট ভুলে থাকতে পারে তো তাই থাক!

জানি, 'ওরা অনেক ভুল করেছে; বিশ্বমানবের ন্যায়ের দরবারে 'ওদের অপরাধের অন্ত নাই! তবু আমি চাই না 'ওদের অপরাধের কথা জানতে। হে ভগবান, তুমিই কী ওই সব অপরাধীদের অন্তরে বসে থেকে এ-সব কষ্ট অপমান নিজে ভোগ করছো না? কেন, কেন তবে তুমি নিজেকে এত হীন, এত ক্লিন্ন মলিন ক'রে রেখেছো, প্রভু? তুমি তোমার স্ব-স্বরূপে প্রকাশ হও। ওদের তুমি সত্য পথ দেখাও! শান্তি দাও ওদের অন্তরে!

জেলের কষ্ট কী সাংঘাতিক কষ্ট, যেন সাক্ষাৎ নরক-যন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে হৃদয় আমার ভগবানের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো!

কী মুক্তি! কী আনন্দ আজ আমার! আজ যে হাতের সব টাকাটাই অন্যের জন্যে খরচ ক'রে দিতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু নাঃ, পূর্বের কথা মনে পড়ে যেতেই চেপে গেলাম—এত দরাজ হওয়া আজ আমার পক্ষে সাজে না!

জেল-গেট থেকে বেরিয়েই শশী মহারাজের সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে পথ হাঁটছিলাম, শশী মহারাজের মনে কি হচ্ছিল বলতে পারবো না, কিন্তু আমার কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন নূতন নূতন লাগছিল! জেল থেকে বেরুতে দেখে পথের লোকেরা হাঁ ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল—সে-সবের দিকেও কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না! আমাকে যেন কিসের এক নেশায় পেয়েছিল!

পথ চলতে চলতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—আজ আমি বড় সুখী! বড় তৃপ্ত! আজ আমার মনের মাঝে কোথাও কোনো ক্ষোভ নাই, পৃথিবীর

কারো ওপর কোনো রাগ-অভিমান নাই! এই যে চলতে চলতে পথের মাঝে তিরিশটা দিন এমনভাবে আট্‌কে থাকা—জেলের মধ্যে এই যে এমন অমানুষিক নির্যাতন, কোনো কিছুই আর মনে রইলো না!

কিন্তু এ-আনন্দের উচ্ছ্বাস অনেকদিন পরে জেল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নয়, কিংবা আজ আমি বহু সাধের বৃন্দাবনে চলেছি—তার জন্যেও এ-আনন্দ নয়। আনন্দ হচ্ছে জেলের গতকালের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটা স্মরণ ক'রে:

জেলে থাকতে প্রতিনিয়ত শুধু শ্রীগুরুকেই ডেকেছি, এমন কি যখন দেখেছি সেই গোলক-ধাঁধার ভেতর থেকে এক মাসের আগে আর কোনো রকমেই মুক্তি পাবার আমার উপায় নাই, তখনও তাঁকে ডেকেছি; কাতর প্রাণে তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—গুরু, তুমি আমায় রক্ষা করো!

কিন্তু গুরুদেব যে এমন ক'রে ভেতরে ভেতরে আমাকে রক্ষা করছিলেন, তখন কি তা টের পেয়েছি? প্রতিমুহূর্তে যে অঘটনটি ঘটবার আকুল প্রত্যাশা করছিলাম. তা যে অদৃশ্য জগতে সত্যিসত্যিই ঘটে চলছিল তা কি তখন জানতে পেরেছি?

তিরিশটা দিনের কারাবাসের কষ্ট থেকে মুক্তি আমার হয়নি বটে, কিন্তু যার জন্যে অন্তরে অন্তরে এতদিন বড়ো খেদ ছিল—যে-দুর্লভ বস্তু লাভের জন্যে এই পথে নামা, এত কষ্ট সহ্য করা তা বাস্তবিকই সার্থক হয়েছে! নিবেদিতার মতো সেই প্রতিশ্রুতি আমি সত্যসত্যই লাভ করেছি!

জেলে যতদিন ছিলাম প্রতিদিন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেই একই রকম স্বপ্ন দেখতাম। সব স্বপ্নই শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দকেই গুরুরূপে বরণ ক'রে হৃদয়ে তাঁরই ধ্যান ক'রে এসেছি এতদিন। কিন্তু তিনিও আমার সেই বরণ গ্রহণ করেছেন কিনা তার কোনো বাস্তব প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাইনি। অবশ্য বিশ্বাস ছিল যে, আমি যেমন তাঁকে গ্রহণ করেছি তিনিও আমাকে তেমনি গ্রহণ করেছেন! কারণ, সর্বযুগের সর্বমানবের জন্যে এ যে তাঁরই শ্রীমুখের দিব্য প্রতিশ্রুতি:

He who chooses the Infinite
has been chosen by the Infinite!

তথাপি মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আক্ষেপ থেকে যেতো; মা যেমন সন্তানকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নেন, স্বামী যেমন স্ত্রীকে আশ্বাস বাক্য দিয়ে বলেন—'হ্যাঁ, তুমি আমার', সেই রকম আশ্বাস বাণী শোনবার জন্যে অন্তর আমার অহর্নিশ ব্যাকুল হয়ে উঠতো!

কিন্তু এই জেলে এসেই সে-সাধ আমার পূর্ণ হলো!

জেলে প্রতি রাত্রে চোখ দু'টি একবার বন্ধ করলেই শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে পেতাম। তিনবেলা খাবার সময় যে-সব ওয়ার্ডাররা আমাদের খাবার পরিবেশন করতো, শ্রীঅরবিন্দকে দেখতাম ঠিক তাদের মতো বেশে। পরনে ময়লা হ্যাফ্ প্যাণ্ট, গায়ে ফতুয়া আর হাতে বাল্‌তি নিয়ে আমাকে খাবার পরিবেশন করতে এসেছেন! যে বেশেই তিনি আসুন না কেন, আমি তাঁকে দেখেই চিনতে পারতাম।

আমি খেতে বসেছি আর তিনি সামনে দাঁড়িয়ে স্নেহময়ী জননীর মতো পরম যত্নে আমাকে খেতে দিচ্ছেন!

আবার কখনো-বা দেখতাম—খাবার পরিবেশন করতে এসে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে ছবির মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আমার চোখের দিকে।

স্বপ্নের মধ্যেও তখন অনুভব করতাম, আমার চোখের দৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে গেছে! আমার তখন খাবার দিকে আর আগ্রহ থাকতো না, সব-কিছু ভুলে আমি তাঁরই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। তারপর তেমনিভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখতাম মূলাধার থেকে চৈতন্য উঠে গিয়ে সহস্রারে যুক্ত হচ্ছে। আমি নিস্পন্দ হয়ে যেতাম! কখনো-বা প্রাণের মধ্যে এমন এক আকৃতি জেগে উঠতো যে, মনে হতো উঠে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণ দু'টি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি—আমার জন্ম-জন্মান্তরের সাধ পূর্ণ হোক!

কতদিন এ-রকম ধরতে গিয়েই 'গুরুদেব' 'গুরুদেব' ডাকের আর্ত-চিৎকারের মাঝে আমি জেগে উঠেছি! কিন্তু একটিদিনও তাঁর চরণ স্পর্শ করতে পারিনি। প্রত্যেকবারই দেখতাম, আমার আকৃতি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি রেখে পেছনের দিকে এক-পা এক-পা ক'রে চলতে শুরু ক'রে দিতেন।

কোনো কোনোদিন তাঁর চলে যাবার পথটা দেখতাম ঠিক এলাহাবাদ স্টেশনের কাছে ব্রীজের ওপর যেখানে বাই-সাইকেল তুলে নিয়ে যেতে হয়, সেই উঁচু সিঁড়ি-গুলোর মতো। তিনি সিঁড়ির সেই ধাপে ধাপে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে যেতেন। আর তীব্র-ব্যাকুলতার মধ্যে আমার ঘুম যেত ভেঙ্গে!

শ্রীঅরবিন্দের আমাকে ওইরকম ভোজন করানোর যে কীরূপ গূঢ় অর্থ, তা আর খুলে না বললেও চলে। বাস্তবিকই, তাঁর কৃপার জোরেই জেলে দু'বেলা পাঁচখানা ক'রে ভূষির রুটি আর একটু জোলো ডাল খেয়ে শরীরের ওজন অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। জেলের সেই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে খাটতে কতদিন মনে হয়েছে, একটু জ্বর-জ্বালা হলেও বোধহয় একদিন তবু কাজ থেকে নিস্তার পাওয়া যেতো। জেলের মধ্যেই হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারতো ?

কিন্তু আশ্চর্য ! একটি দিনের জন্যে নখের কোণেও এতটুকু ব্যথা হয়নি সে-সময় ! জেলের যাকে বিশ্রাম-সুখ ব'লে কল্পনা করেছি তখন, বাস্তবে সে-বিশ্রাম হয়তো কত ভয়ঙ্কর হতো আমার পক্ষে তা-ই কি জানা ছিল ? গুরুদেব সেদিক দিয়েও আমাকে কেমনভাবে বাঁচিয়ে দিলেন—এখন তাই ভাবি !

সে যাই হোক, যে-কথা বলছিলাম—জেল থেকে মুক্তি পাবার আগের দিনেও শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেলাম। এদিন শুধু তাঁর নির্বাক দর্শনই পেলাম না, পেলাম তাঁর শ্রীমুখের প্রতিশ্রুতি। শ্রীঅরবিন্দের সেই প্রতিশ্রুতিই সেদিন আমার জীবনের সব কিছু ওলট-পালট করে দিলে। ভেবে রেখেছিলাম এবার মথুরা জেল থেকে বেরিয়ে বৃন্দাবন চলে যাব, আর যদি বৃন্দাবনেও স্থান না হয় তাহলে হিমালয়ের দিকে কোথাও হোক চলে যাব। সেখানে গিয়ে কোন মঠে বা আশ্রমে আশ্রয় নেব। তা না হলে জীবনটা চলবে কি করে ? এই দেহটার জন্যে অন্ন চায়, বস্ত্র চায়, মাথা গুঁজবার মত একটা আশ্রয়ও চায় ! কিন্তু এই ভাবনার কি পরিণতি হত তা তো জানতাম না ? শ্রীঅরবিন্দ আমার জীবনের সব গতি-বৃত্তিকে একটি কথায় আগে থেকেই নিয়ন্ত্রিত করে দিলেন !

শ্রীঅরবিন্দ সেদিন জেলের কয়েদীর বেশে আসেননি, এসেছিলেন জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে। প্রথমে আমাকে তিনি একটি বাণী দিলেন।

দিলেন বল্‌ছি বটে, কিন্তু লোকে যাকে দেওয়া নেওয়া ব'লে বোঝে সেরকম জিনিস একটুও নয় ! শ্রীঅরবিন্দ ঐ বাণীটি উচ্চারণ করতে করতেই আমার সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি কিন্তু আমাকে 'এই বাণীটি উচ্চারণ করো বা এটি তোমার জন্যে'—এরূপ কিছুই বললেন না। অথচ কেমন ক'রে যেন আমি স্পষ্ট বুঝে ফেললাম যে, ঐ বাণীটি শুধু আমার জন্যেই তিনি এনেছেন !

শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে অনুভব করলাম—ঐ বাণীটি যেন আমার প্রাণের প্রাণ—অন্তরের অন্তর ! ওটি ছাড়া যেন আমি একদণ্ডও বাঁচতে পারবো না !

তাই শ্রীঅরবিন্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও সত্তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভক্তি আবেগ দিয়ে জোরে জোরে আবৃত্তি করতে লাগলাম ! এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে—শরীরের প্রতিটি রক্তকণা, প্রতিটি শারীর কোষ পর্যন্ত সেই বাণীর শক্তিতে বীর্যবন্ত হয়ে উঠলো, প্রতিটি রোমকূপ রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো ! মনে হলো—আমি কী বৃহৎ, কী বিপুল ! আমাকে ধরে রাখে এমন কারাগার বিশ্বের কোথাও এখনো তৈরি হয়নি ! এতদিন দুঃখে নিরাশায় ম্রিয়মান হয়ে আমি কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম ! অনিশ্চিতের পথে পা দিয়েছি, কোথায় থাকব, কোথায় থাব ভাবনার

অন্ত ছিল না! কিন্তু কোথায় আমার সেই দুঃখ? এখন কোথায় আমার সেই ভাবনা?

শ্রীঅরবিন্দের এই বাণী একাক্ষরী প্রণব বা অন্য কোনো মন্ত্র নয় যেমন তথা-কথিত সব সাধনায় গুরুদেব শিষ্যদের দিয়ে থাকেন। এই বাণীটি হলো শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার দু'টি বিখ্যাত শ্লোক—সবাই জানেন এবং আমিও সেটি গীতা-পুস্তক পাঠ করবার অনেক আগে একবারে ছোটবেলা থেকে দেশের ঝুলন-উৎসবে রাধা-মাধবের দোলার নিচে কাগজের অক্ষরে কতবছর কতবার দেখে আসছি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনে মনে হলো না যে আমি তার আগে কখনো পেয়েছি বা জেনেছি। তাছাড়া, বাণীটি এমন বাস্তব, দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ের পক্ষেই এমন যথোপযোগ্য যে, আমার সে-সময় একটুও মনে হলো না তিনি গীতার শাশ্বতকালের চিরপুরাতন বাণী বলছেন ব'লে। শুধু মনে হলো—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেমনভাবে নূতন শক্তিতে সময়োপযোগী নূতন বাণী শুনিয়েছিলেন, তেমনি শ্রীঅরবিন্দও আজ আমাকে শোনাচ্ছেন!

পরে শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়তে পড়তে আবিষ্কার করেছি যে, ঐ-সব বাণীগুলি ছিল তাঁর অতি প্রিয়—প্রাণের প্রাণ। তিনি পণ্ডিচেরী আসবার পূর্বে চন্দননগরে মতিলাল রায়কে গীতার ঐরকম কয়েকটি বাণী জপ করবার জন্যে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে যে বাণীটি দিলেন সেটির তাঁর 'যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য' বইটিতে মূল্য দিয়েছেন সর্বোচ্চে এবং সর্বাগ্রে।

কিন্তু সে যাই হোক, সেই বাণীটি ঐভাবে বার বার জপ করতে করতেই কখন্ এক সময় অনুভব করলাম, শ্রীঅরবিন্দ আমার খুব কাছে সরে এসেছেন—এত কাছে যে আজ আমি ইচ্ছা করলেই তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু তবু করলাম না, সুযোগ পেয়েও সেই ইচ্ছাটা আনন্দের আতিশয্যে একেবারেই ভুলে গেলাম।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অভ্যাস বশে আবার আমি তাঁর শ্রীচরণ ধরবার জন্যে যেই সচেতন হয়ে পড়েছি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেখছি কি—তাঁর ফুলের পাপড়ির মতো শুভ্র-সুন্দর চরণ দু'খানি আমার বুকের মাঝে এসে পড়েছে, আর আমি দু'হাত দিয়ে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় অনন্য শরণাগতিতে তাঁর শ্রীচরণ জড়িয়ে ধরেছি!

ফাঁসি-কাঠে যে মরতে বসেছে তাকে যদি কেউ হঠাৎ মুক্তির বাণী শোনায়, তখন তার যেমন অবস্থা হয় আমারও ঠিক তা-ই হলো। আহা! এত করুণা তোমার! কৃতজ্ঞতায় আনন্দে আমি কেঁদে আকুল হলাম—কে বললে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো? এই তো তুমি রয়েছো এতখানি বাস্তবরূপে!

তাঁর কাছে অতিশয় কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করলাম—আমি যে তোমার ওপর ভরসা ক'রেই পথে নেমেছি। তুমি আমায় গ্রহণ করো, প্রভু!

শ্রীঅরবিন্দ প্রসন্নবদনে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, আমি তোমায় গ্রহণ করেছি। তুমি আমার, তুমি আর কারো কাছে যেও না।"

তাঁর কথাটি সেই সবেমাত্র বলা শেষ হয়েছে, আর ঠিক এমনি সময়ে জেলের ঘণ্টার শব্দে আমি জাগ্রত অবস্থাতে ফিরে এলাম। হাত দু'টা তখনো বুকের সঙ্গে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরা আছে। তখনো আমি দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে

জোরে জোরে সেই বাণী উচ্চারণ ক'রে চলেছি! তাই জাগ্রত অবস্থাতেও নিজের মুখে উচ্চারিত সেই বাণী শুনতে পেলাম।

আচমকা জেলের 'এলার্ম' কানে যেতেই মনে হলো: আজ বোধ হয় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোনো এক বিশেষ মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একসঙ্গে শত সহস্র কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খের বাদ্য বেজে চলেছে! আমার শরীরের প্রতি রোমকূপে আবার রোমাঞ্চ জেগে উঠলো—আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় শরীরের ওপর আবার ঘন ঘন তীব্র শক্তিপাত ঘটতে লাগলো!

কিছুক্ষণ বিশ্বাসই করতে পারলাম না যে, আমি জেলের মধ্যে রয়েছি এবং সেই ধ্বনিটা প্রাতঃকালে কয়েদীদের শয্যা ত্যাগের ঘণ্টাধ্বনি ওইভাবে মধু বর্ষণ করছে ব'লে!

অন্য সব কয়েদীদের দৌড-ঝাঁপের বহর দেখে ব্যাপারটা ক্রমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এই কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় যখন ছিলাম তখন আর একবার শ্রীঅরবিন্দ এসেছিলেন জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে। তখনও এমনি এক জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ এসে রক্ষা করেছিলেন:

সেদিনটা ছিল কি একটা বিশেষ তিথি। স্কুল-কলেজ বন্ধ। দুপুরবেলা বাসার সবাই যখন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে তখনো আমি বসে বসে পড়াশুনা করছিলাম। কেননা এই ছুটির দিনগুলোতেই আমি পড়তে পাই, অন্যদিন দশটা পাঁচটায় কাজ থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে পড়বার জায়গাতেই একবার শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পাঁচটা মিনিটও নয়, হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন মনে হল—এ কি! এই দুপুরবেলায় এমন কড়া রোদ্দুরে শুয়ে আছি? উঃ! গেল গেল, শরীরের হাড়গোড়গুলো ভেঙ্গে ফেটে সব চৌচির হয়ে গেল সূর্যের তাপে!

কিন্তু সূর্যের তাপ? সূর্য আসবে কোথা থেকে? আমি যে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি?—এইসব চিন্তা করছি, তবু উঠতে পারিনি। সেই যন্ত্রণার মাঝেই অনুভব করছি, সামনের খোলা দরজা দিয়ে যতখানি দেখা যায় আকাশের ততখানি জুড়ে শত সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ দিয়ে কে যেন আলোকিত ক'রে রেখেছে।

না, ঠিক প্রকাশ করতে পারলাম না ব্যাপারটা! শত সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ দিয়ে শুধু নয়, সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন একটি বিরাট সূর্য ঘিরে রয়েছে! সেই সূর্যের দেহ থেকে একটা তীক্ষ্ণ জ্যোতির ধারা আমার শরীরের ওপর এসে পড়েছে।

সেই জ্যোতি আমার চোখের ওপরও এমন তীব্রভাবে পড়েছে যে, তারই জন্যে আমি চোখ মেলে তখনো তাকাতে পারছি না। অথচ সূর্যের দিকে মুখ তুলে চক্ষু বুজলেও যেমন আলোকের সঞ্চার বিচিত্র বর্ণে অনুভূত হতে থাকে, তেমনি আমি চক্ষু বন্ধ রেখেও সেই জ্যোতিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অনুভবটা একটু পাকা হতেই অমনি আমার স্মরণ হয়ে গেল,—ওহো, তাইতো! এই জ্যোতির মধ্য থেকেই তো কে যেন আমার দেহে প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রবেশের ফলেই তো শরীরটার মধ্যে প্রবল একটা মোচড় দিয়ে উঠলো; আর সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব হলো, কে যেন আমার সমস্ত শরীরটা ধরে যেমনভাবে গামছা নিংড়ায় তেমনিভাবে নিংড়িয়ে দিলে! তারপর থেকেই দেহের প্রতিটি গ্রন্থি ও গ্রন্থি-সন্ধি, প্রতিটি কোষ, প্রতিটি রক্তকণিকা পর্যন্ত যেন এভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জোগাড় হলো!

তবে এত যন্ত্রণার মাঝেও কিন্তু গানের একটা মিষ্টি সুরের মতো সত্তার কোথায় যেন প্রাণ-আকুল-করা মিষ্টি আনন্দ গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছিল। যন্ত্রণাটা যেখানে অসহ্য তীব্র হয়ে উঠছে ওই আনন্দই সেইখানটা গলিয়ে ঝরিয়ে তরল ক'রে দিচ্ছিল।

তারপর ঐ মিষ্টি আনন্দকে অনুভব ক'রেই তো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সেই জ্যোতির ভেতর থেকে কে এলেন? কে আমার সমস্ত অহংকে গলিয়ে-ঝরিয়ে রূপান্তরিত ক'রে দিতে এলেন? ইনি তো আকাশের সূর্য নন? কারণ সূর্যকে তো তখনো আমি চিনতে শিখিনি? তখনো তো তাঁকে আহ্বান করিনি পূজা করিনি?

[তিন]

তখন দেশের শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে থাকবার ভারী ইচ্ছে ছিল। মাকে ছেড়ে কোথাও একটা দিন তখন কাটাতে পারি না। পাঠমন্দিরে থাকলে মাকে কাছে পাব, দেশে-ঘরে থাকা হবে, আবার সবচেয়ে যে-কারণে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি সেই শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকেও পাওয়া হবে।

কিন্তু ডাক্তারবাবু, মানে পাঠমন্দিরের অধ্যক্ষ রাজী হতেন না। তিনি বলতেন—না, তোমার দ্বারা এ-জীবন নেওয়া হবে না!

আমি জেদ ধরতাম—কেন হবে না বলুন?

তিনি বলতেন—কি করে হবে? গরীবের ছেলে তুমি, কিছুই তোমার ভোগ হল না। আগে ভোগ না হলে কি কেউ ত্যাগ করতে পারে? জীবনের পথে কত ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে, সেসব কাটিয়ে ওঠা কি সোজা কথা? কত ছেলেকেই তো দেখলুম, তোমার মত কত ছেলে পাঠমন্দিরে জীবন দেবে ব'লে এসে দু'মাস ছ'মাস না কাটতে কাটতেই পালিয়ে গেল! পালাবার সময় আমাকে একটা মুখের কথাও জানালে না যে, আমি থাকতে পারছি না চলে যাচ্ছি।

—সে কি, আপনাকে না বলে তারা পালিয়ে গেল?

—হ্যাঁ, বলে যাবার সাহস আছে তাদের? কেউ পাঠমন্দিরে বসে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা জমাত, বিড়ি-সিগরেট ফুঁকতো। আমি তা-ই দেখে একদিন রাঙা চোখ দেখালুম, বললুম—দেখ বাপু, পাঠমন্দিরে ওসব করতে পাবে না। হয় তোমাকে আড্ডা আর বিড়ি-সিগরেট ছাড়তে হবে, না-হয় পাঠমন্দির ছাড়তে হবে! বলতেই সে-মহাজন পালিয়ে গেল। কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিল, রোজ রাত্রে পাঠমন্দিরের দরজা খুলে রেখে বাইরে চলে যেত; একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলতেই সে-ও লজ্জায় পালিয়ে গেল। আর কেউ-বা বিয়ে করবার নেশায় আপনা থেকেই পালিয়ে গেল। এই শেষের ছোকরাটি অনেকদিন ছিল। মনে করলাম, রয়ে গেল বুঝি। কিন্তু নাঃ! সে-ও একদিন পালাল না জানিয়ে। পরে তার সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে যেতেই না দেখার ভান করে পালাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললুম—হ্যাগো, তোমাদের জন্যে আমি এত করলুম, আর সেই তোমরা কিনা যাবার সময় ভদ্রতা করে একটা মুখের কথাও জানালে না? কেন পালালে বলো দেখি? কি উত্তর দিলে জান?

ডাক্তারবাবু বলতে বলতে থেমে গেলেন—না থাক। সে-কথা তোমার না শোনাই ভাল।

আমিও বললাম—তবে থাক। আমি শুনতে চাই না।

কিন্তু কি মনে করে তিনি নিজেই আবার বলেন—নাঃ, শুনেই রাখ। পাঠ-মন্দিরে শুধু ঠাকুর শুধু ফুলের বাগানই নাই, সেইসঙ্গে বিভীষিকাও আছে! সে বললে কি জান? বললে—দিনের বেলাটা পাঠমন্দিরে বেশ কাটে, কত লোকজন আসে, তাদের সঙ্গে কথায় বার্তায় কাজে কর্মে কখন্ দিনটা চলে যায়। কিন্তু রাত হলেই হাঁপিয়ে উঠি! ঘর-বাড়িগুলো যেন সব তখন বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। চার দেওয়ালে নিঃশ্বাস চেপে ধরে। তখন মনে হয় দেওয়াল ভেঙ্গে ছুটে পালিয়ে যাই! অথচ এসব কষ্ট আপনাকে বললেও তো আপনি সহজে ছেড়ে দিতেন না? আপনি হয়ত আমাকে আরো বোঝাতেন আরো সাহস দিতেন। তাই না জানিয়ে পালিয়ে যেতে হল।

শোন কথা! তার ইচ্ছা না থাকলেও আমি তাকে ধরে রাখতুম—আরো বোঝাতুম আরো সাহস দিতুম? ঠিক আছে, যাও। বিয়ে করে সংসারে হাবুডুবু খাওগে যাও! এখন আবার বলে কিনা পাঠমন্দিরে থাকতে চাই? দূর দূর! আর তোদের থাকতে দিই? তোরা করবি বিয়ে, আর আমি তোদের সংসার টানব?

ডাক্তারবাবু তারপর আমাকে বলেন—সেই জন্যেই তো বলছি, তুমিও পাঠ-মন্দিরে থাকতে পারবে না! শুনলে তো রাতেরবেলা দেওয়াল ভেঙ্গে পালাবার ইচ্ছে হয়? দরজা খুলে ধীরে ধীরে যাবারও তখন সবুর সয়না?

ডাক্তারবাবুর কষ্ট দেখে বলে ফেললাম—দেখবেন আমি পাঠমন্দিরে এসে কখনো না বলে পালিয়ে যাব না।

—ওঃ! তুমি তাহলে আমাকে চিঠি লিখে রেখে পালাবে বলছ?

তাড়াতাড়ি কথাটা সংশোধন করে দিই—না না, তা বলছি না! আমি এলে আর কখনো তো পালাবোই না। তবে যদি এমন কিছু ঘটে আর আমাকে পালাতেই হয়, তাহলে আপনার অনুমতি নিয়ে যাব!

—তবে তো তুমি আমার অনেক উপকার করে দিয়ে যাবে। যাক্, ছাড় ওসব ছেলে-মানুষী কথা! আচ্ছা, ওদের মত তোমার কোন বদ্ অভ্যেস নাই তো?

বললাম—বদ্ অভ্যেস তো অনেক-ই আছে, কিন্তু কিরকম বদ্ অভ্যেসের কথা বলছেন আপনি?

—এই যেমন ধর, ধূমপানের অভ্যেস আছে? বিড়ি-সিগারেট খাও?

মনে মনে বলি, আবার সেই পুরনো প্রশ্ন? এসব কথা তো কতবারই জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে, আর আমিও ঠিক একই রকমভাবে উত্তর দিয়েছি?

তবু সেদিনও আবার নূতন করে উত্তর দিতে হল : বললাম—আজ্ঞে না! ধোঁয়াটা আমি একদম সহ্য করতে পারিনা। লোকে কত প্যাকাটির বিড়ি খায়, আমি খেলে কাশতে কাশতে প্রাণ যায়!

—কখনো পানও খাও না?

—জানেন, পানে ঝাল লাগলে চুণ খেতে হয় কি খয়ের খেতে হয় জানি না ব'লে আমার পান খাওয়া হল না? তবে কখনো কখনো মা পান চিবিয়ে দিলে আমি খাই!

—ওঃ! একেবারে গোল আলু! ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানে না ছেলে। তাহলে কি কোন নেশাই নাই বলছো? তাস-পাশা কখনো খেলেছ?

বললাম—না। ইচ্ছে কারই ওগুলো শিখিনি। আমার বন্ধুরা খেলে, একবার দেখে নিলেই শিখতে পারি, কিন্তু শিখলে খেলতে হবে ব'লে আমি শিখিনি। মা বলেন, ওসব অকম্মা কুঁড়ে খেলা খেললে মালক্ষ্মী বিমুখ হন, কখনো তুই খেলিস্‌নি।

ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন তবুও শেষ হল না। তিনি বললেন—আচ্ছা নেশা না-হয় করোনি বুঝলাম, কিন্তু কখনো কোনো মেয়েকে ভালও বাসনি?

হে ধরণী, দ্বিধা হও! প্রশ্নের উত্তর দেব কি, লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশে গেলাম! এমন প্রশ্ন যে তিনি করতে পারেন তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর! আচ্ছা তা না হয় তিনি প্রশ্ন করলেন—যার মুখ আছে সে-ই করতে পারে—কিন্তু কেউ কোন মেয়েকে ভালবাসলে কি তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে? ডাক্তার-বাবুর এ কেমনতরো আব্‌দার বুঝলাম না?

ডাক্তারবাবু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। আমাকে নিরুত্তর দেখে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন—ভালবাস তাহলে? সত্যি করে বলো।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁকে উত্তর দিতেই হল। বললাম—ডাক্তারবাবু, কাউকে ভালবাসব কি করে? আমি যে এখনো বড় স্বার্থপর। স্বার্থপর মানুষ কি কাউকে ভালবাসতে পারে? মাকে ছাড়া দুনিয়ার কাউকে আমি ভালবাসতে শিখলাম না!

ডাক্তারবাবু বোধহয় আমার এ-কথাটাও বিশ্বাস করলেন। বললেন—তাহলে তোমার হার্ট-সেণ্টার এখনো খোলেনি। দেখি তোমার হাতটা?

হাতটা না এগিয়ে দিয়ে আমার তখন উপায় থাকে না। আমি জানি হাতে কি তিনি দেখতে চান। এবার তো তিনি আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করবেন না? প্রাণপণে তাই মাকে ডাকলাম—মা, জানি না আমার হাতে কি আছে, কিন্তু যদি বিয়ের রেখা থেকেও থাকে তো এই মুহূর্তে যেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

কিন্তু প্রার্থনা আর পূর্ণ হল না। ডাক্তারবাবু একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই ব'লে উঠলেন—এই তো দেখছি তোমার হাতেও বিয়ের রেখা আছে?

—এঁ্যা! বিয়ে আছে? এই ব'লে আমি সত্যি সত্যিই ছোট ছেলের মত কেঁদে ভাসিয়ে ফেললাম—এবং বললাম—তাহলে তো পাঠমন্দিরে বাস করা আমার হবে না, আর ভগবান লাভও হবে না?

তারপর ডাক্তারবাবুর কাছে 'আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না, এ আপনি দেখে নেবেন'—এইরূপ বার বার প্রতিজ্ঞা করে তবে নিজেকে শান্ত করি।

এখন ভাবি—হায় হায়! কী নির্বুদ্ধিতাই ছিল সেদিন! ডাক্তারবাবু যে আমাকে বিড়্‌বার জন্যেই ঐরূপ বলেছিলেন, সেটাও কি আমি বুঝতে পারিনি?

ডাক্তারবাবু কিন্তু কথাটা জানিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসেছিলেন। মনে মনে হয়তো হাসছিলেন কিনা কে জানে?

তবে আমার যত নির্বুদ্ধিতাই থাক, তবু এটুকু শেষে বুঝে ফেলেছিলাম যে, ডাক্তারবাবুর এ-অস্বীকার অস্বীকারই নয়, যে-কোন কারণেই হোক, এখন আমাকে অস্বীকার করলেও একদিন তিনি পাঠমন্দিরে আমাকে আহ্বান জানাবেনই। তাই পাছে আমি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে পড়ি, পাঠমন্দিরে জীবন আর না দিই, কিংবা বাজে নেশায় মেতে নষ্ট হয়ে যাই, সেজন্যে তাঁর সতর্কতার অন্ত নাই!

তাছাড়া অস্বীকার করবেন কি করে? সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তো আমাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে আহ্বান জানিয়ে রেখেছেন? সঙ্গীদের সঙ্গে প্রথম যেদিন পাঠমন্দিরের বাগানে ফুল তুলতে গেলাম, সেই দিনের ঘটনাটা এখনো মনে পড়ে:

সঙ্গীদের মধ্যে আমাকে দেখেই ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—কত ছেলেকে পাঠ-মন্দিরে আসতে দেখি—ফুল তুলতে আসে, লাইব্রেরীর বই পড়তে আসে, উৎসবে আসে, কিন্তু তুমি তো কখনো আসো না?

আমার হয়ে সঙ্গীরা তাঁকে উত্তর দিয়েছিল, বলেছিল—ও আসবে কি ডাক্তারবাবু, ও কি পাঠমন্দিরের কখনো নাম শুনেছে? এখানের বাগানে ফুল তুলতে আসার কথা বলতে ও বললে, পাঠমন্দিরে আবার ফুলের বাগানও আছে নাকি?

ডাক্তারবাবু শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন—হ্যাগো, সত্যি? তোমার দেশের মধ্যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এটার নামই কখনো তুমি শোননি? শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের নামও কখনো কানে যায়নি?

সঙ্গীরা অবশ্য সবটাই মিথ্যে বলেনি। আমার সেই ষোলো-সতেরো বছর বয়েসেও পাঠমন্দিরের নামটা বেশি দিন আগে শুনিনি। কিন্তু সঙ্গীদের কাছে কে হারতে চায়? তাই ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম—না না, ওদের সব কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। পাঠমন্দিরের ভেতরে কখনো আসিনি বটে, কিন্তু এই বাড়িটাকে চিনতাম, শ্রীঅরবিন্দের নামও শুনেছি।

—বটে! শ্রীঅরবিন্দের নামও শুনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই এক বছর আগে শুনেছি।

—কি করে শুনলে? ডাক্তারবাবু জানতে চেয়েছিলেন।

—শুনতে চান? কিন্তু সে যে অনেক কথা?

—তা হোক না, এত তাড়াতাড়ির কি আছে? বলো শুনি—

গল্পের নাম শুনে সঙ্গীরাও হাতে ফুলের সাজি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলতে সুরু করলাম: জানেন, সেদিনটা ছিল উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ৫ই ডিসেম্বর। অবিস্মরণীয় দিন। কিন্তু আমি তখন তা জানতাম না। আজ হিসেব করে আপনার কাছে বল্‌ছি।

প্রতিদিনকার মত সেদিনও অপরাহ্ণে পাড়ার এই সব ছেলেদের সঙ্গে হা-ডু-ডু খেলতে সুরু করেছি। এমন সময় অন্য পক্ষের খেলোয়াড় শম্ভুনাথকে তার ঘরের লোক ডাকতে এল। শম্ভুনাথ খেলা ছেড়ে বললে—ভাই, আমার আর খেলা হবে না। দাদার গুরুদেব আজ দেহরক্ষা করেছেন কিনা? দাদার সারাদিন উপবাস। দাদার কাজগুলো আমাকেই করতে হবে। বাড়িতে তাই ডাকছে…

শম্ভুনাথের পথ আগলে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় দেহেরক্ষা করেছেন রে তোর দাদার গুরুদেব? পাঠমন্দিরে?

শম্ভুনাথ যাবার সময় তাড়াতাড়ি বলে গেল—যাঃ! পাঠমন্দিরে নাকি? সে অনেক দূরে—পণ্ডিচেরীর নাম শুনেছিস? পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন!

ভাবি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম? সে আবার কোথায়? ভূগোলের মধ্যেও তো নামটা পড়িনি?

ডাক্তারবাবু অমনি প্রশ্ন করেছিলেন—সে কি? ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীর নাম বইয়ে পড়োনি? কোন্ ক্লাশে পড়ো?

সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মরণ হয়ে যায়—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পেয়েছি। চন্দননগর পণ্ডিচেরী গোয়া……আচ্ছা, তারপর শুনুন—

সেদিন যেন আমি একসঙ্গে অনেকগুলো নতুন কথা শুনে ফেললাম! শম্ভুর দাদা নির্মলদার কথা অবশ্য আগে অনেক শুনেছি, তবু যেন তাঁর কথাও নতুন ক'রে শুনলাম। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম: গুরুদেব মানুষের এতখানি প্রিয় হয়? তাঁর জন্যে লোকে উপবাস করে? কিন্তু আমাদের খেলার সঙ্গী এই শম্ভু এত সব জানলো কি ক'রে? শম্ভুর দাদাকে কে শিখিয়ে দিলে—গুরুদেব দেহরক্ষা করলে উপবাস করতে হয়? অথচ আমি কেন আজ পর্যন্ত কিছুই বুঝলাম না, কিছুই শিখলাম না?

সমস্ত অন্তরটা আমার এক বিপুল দৈন্যে ছেয়ে গেল! মনে হলো, আমি কিছু নয়, কোন গুণ নাই আমার! সেদিন আর খেলা হল না।

বাড়িতে ফিরে এসেও আমি সেই তুচ্ছ ছোট্ট ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। মাকে সাত বার বললাম—জানো মা, গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন ব'লে শম্ভুর দাদার আজ উপবাস? ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত মনটা আমার শুধু পণ্ডিচেরীর গুরুদেবের কথাই বারবার ফিরে ফিরে চিন্তা করতে লাগলো! তারপর রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কত স্বপ্ন দেখলাম গুরুদেবের, তা আর এখন স্পষ্ট মনে নেই।

সব শুনে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—এসব তোমার সত্যি কথা?

—সত্যি কথা বৈকি! প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঘটনা এখনো আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে।

ডাক্তারবাবু তারপর বলেছিলেন—তবু তখন তোমার পাঠমন্দিরে আসতে ইচ্ছে করতো না? তা যা হয়েছে, হয়েছে। আজ তো পাঠমন্দির দেখলে? এবার থেকে রোজ এসো। তুমি এই দেশেরই ছেলে, তোমাকে আবার নেমন্তন্ন করতে হবে কেন? এটা তো তোমাদেরই পাঠমন্দির—এই মন্দির, এই ফুলের বাগান, ঠাকুর, সবই তো তোমাদের!

সব আমাদের? অন্তরে-অন্তরে বিস্ময় মানলাম! এমন কথা তো কেউ

আমাকে আজ পর্যন্ত বলেনি? এতদিন আমি গরীব ছিলাম—আজ ফুল তুলতে এসে একেবারে যে রাজা হয়ে গেলাম! আগে ভাবতাম, যাদের ওষুধ, বই কিংবা ফুলের প্রয়োজন কেবল তারাই আসে পাঠমন্দিরে। কিন্তু আমার তো ওসবের প্রয়োজন নাই? তবে আমি কি করতে যাব?

কিন্তু মুখ ফুটে তাঁর একটা কথারও সে-সময় উত্তর দিতে পারলাম না। অবশ্য উত্তর পাবার আশাও তিনি রাখেননি। পাঠমন্দিরে যে নতুন আসে তাকেই বোধহয় তিনি এমনি আহ্বান জানান, তাতে সে আসুক বা না-আসুক।

পরন্তু আমার সেদিন তাঁর কথাগুলি বড়ো ভাল লাগলো। মনে হলো, তিনি বুঝি শুধু আমাকেই প্রথম বললেন, এর পূর্বে আর কাউকেই এভাবে আহ্বান জানাননি।

সেইদিন থেকেই পাঠমন্দিরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিত্য-নিয়মিত পাঠমন্দিরে যাই, সেখানের বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করি, লাইব্রেরী গোছাই, মন্দিরের ঘর-দোর সাফ করি, ফুল-পাতা দিয়ে ঠাকুর সাজাই, ক্লাশে পাঠে সমবেত ধ্যানে যোগ দিই। শেষ পর্যন্ত পাঠমন্দিরে যাওয়া যেন একটা নেশায় পরিণত হ'ল।

কিন্তু এমনি সময়ে একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল। সংসারে আমার একমাত্র অবলম্বন মা একদিন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে এনে ওষুধপত্র দিলাম। পরের দিন সকালে পাঠমন্দিরে ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটলাম মায়ের চিকিৎসার জন্য পরামর্শ নিতে।

তিনি শুনে বললেন—সন্ন্যাস রোগ? তাহলে তো তোমার মা বাঁচবেন না!

—বাঁচবেন না? বলেই আমি সেখানে আছাড় খেয়ে পড়লাম। ডাক্তারবাবু কিন্তু আর একটি কথাও বললেন না—কোন সান্ত্বনার কথা নয়, ভাল-মন্দ কোন কথাই নয়। এমন কি তাঁর চেয়ার-টেবিলের তলায় পড়ে আমি মরলাম কি বাঁচলাম তা-ও চোখ চেয়ে তিনি দেখলেন না! কিন্তু সামনে ছিল শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতিমূর্তি। উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতিমূর্তির পায়ের তলায় লুটিয়ে কাঁদলাম। তাঁরা তেমনি ভাবে বসে-বসেই আমার বুক-ফাটা আর্তনাদ শুনলেন, আমাকে রক্ষাও করলেন।

আরও একদিন মা বেঁচেছিলেন, কিন্তু আমার চেতনায় তিনি সেই মুহূর্তেই দেহত্যাগ করলেন। তারপর দেশ থেকে চলে এলাম কলকাতায় মামাদের কাছে। সেখানে আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হলাম।

কিন্তু পড়াশুনা করতে কিছুতেই আর মন লাগল না। মাকে হারিয়ে বিশ্ব-সংসার সব শূন্য দেখতে লাগলাম। মনে হল, কি নিয়ে থাকব এখানে?

এখন ইচ্ছে করলে দেশে গিয়ে পাঠমন্দিরে থাকতে পারি। ডাক্তারবাবুও রাজী। কারণ সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে পাঠমন্দিরে এসে আমার ওঠার পক্ষে সংসারে যা সবচেয়ে কঠিন প্রতিবন্ধক ছিল সেই মা-ও চলে গেলেন। এতদিন পাঠমন্দিরে যারা থাকতে এসেছে তারা কেউ আমার মত এমন আত্মীয়শূন্য হয়ে আসেনি। পরে সেই আত্মীয়েরাই, বিশেষ ক'রে বাবা-মা পাঠমন্দিরে এসে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুকে গালাগাল দিয়ে হোক, তাদের আপনজনকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে হোক, আবার ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য ঝামেলারও সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু আমার জন্যে ঝামেলা বাধাবার আর কেউ রইল না। মামা, কাকা ভগ্নিপতি ক'রে যে-সব আত্মীয়েরা ছিলেন, তাঁরা থেকেও না-থাকার মতন—কাকা জানেন মামারা আমার গার্জেন, মামারা জানেন কাকা গার্জেন। আসলে এঁরা আমার না থাকার মধ্যেই। ডাক্তারবাবু এমনি সুযোগের অপেক্ষাই করছিলেন।

কিন্তু ডাক্তারবাবু অপেক্ষা করলে কি হবে? আমার এখন সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না। কেবলই মনে হয়, সেই একটি মাত্র স্থান আছে যেখানে গিয়ে আর একটি মাকে পেয়ে বাঁচতে পারি—সেটি হল পণ্ডিচেরী। শেষপর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে মায়ের কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম!

'শৃণ্বন্তু' পত্রিকাতে পড়তাম—মা শিশুদের ক্লাশ নিচ্ছেন, কাউকে জন্মদিনে কার্ড দিচ্ছেন, কাউকে ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করছেন, কারুর সঙ্গে কথা বলছেন—হাসছেন। আমি সেইসব পড়ে বিস্ময় বোধ করতাম। ঠিক বিশ্বাস করতে পারতাম না, তা নয়; বরঞ্চ আমি নিজেকে ঐ পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম ক'রে নিয়ে ভাবতাম—আশ্রমে গেলে আমিও ওইভাবে মায়ের হাত থেকে ফুল পাবো, আশীর্বাদ পাবো? যে-মাকে ধ্যানে পাই, স্বপ্নে পাই, যে-মায়ের কথা বইয়ে পড়ি, সেই দিব্য জননীকে স্থূল চোখে দেখতে পাবো? এ যে তখন কত বড় বিস্ময় আমার কাছে, তা অন্য কাউকে ব'লে বোঝানো যাবে না।

কখনো মনে মনে আশ্রমের সেইসব সাধক-সাধিকাদের কথা চিন্তা করতাম যাঁরা মায়ের কাছে থেকে থেকে দিনরাত তাঁকে সেবা করছেন, যেমন—মায়ের স্নানের জল তুলছেন, রান্না ক'রে খাওয়াচ্ছেন, খাবার বাসন ধুয়ে দিচ্ছেন, কাপড় পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছেন, মায়ের হুকুম পালন করছেন আনন্দে! আমারও তেমন মায়ের সেবা করবার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠতো!

কিন্তু মুশকিল হল, সেখানে যাব কি করে ? শুনেছি আশ্রমে ওখানে থাকতে হলে মায়ের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু আমি কেমন করে মায়ের অনুমতি পাব ?

ঠিক এম্‌নি সময়ে কলেজে পুজোর ছুটিতে দেশে এসেই এবিষয়ে পরামর্শ দেবার মত একজনকে পেয়ে গেলাম।

দূর গ্রামের এক গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্‌ পণ্ডিচেরী দর্শন ক'রে আমাদের পাঠমন্দিরে বেড়াতে এলেন। কিভাবে যেন এই পাঠমন্দিরের খবর পেয়ে একবার দেখতে এসে তাঁর খুব ভাল লেগে যায়। তারপর থেকে তিনি স্কুলের ছুটি পড়লেই পাঠমন্দিরে বেড়াতে আসতেন, আর কিছুদিন ক'রে কাটিয়ে যেতেন।

আমি আগে কখনো তাঁকে দেখিনি, এবার কলকাতা থেকে এসেই দেখলাম। ডাক্তারবাবুই প্রথমদিন তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন—তোমাদের এই এক দিদি। আমাদের পাঠমন্দিরটিকে ওর খুব ভাল লেগে গেছে—ও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, অনেক পাঠমন্দির দেখেছে, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখেনি। ও বলেছে, এখানেই ওর জীবন দেবে…ব'লে ডাক্তারবাবু মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন। অর্থাৎ, সেই দিদি ও-কথা বলেন নি, তিনিই কৌতুক করে বললেন আর কি !

আগে-আগে ডাক্তরবাবু যদি আমার সামনে কাউকে পাঠমন্দিরে থাকার কথা বলতেন, আমার তখন মনে হত—যাকে তিনি বললেন সে বোধহয় অমনি রাজী হয়ে গেল। তাহলে আমার কি হবে ? আমি তো থাকতে পাবো না ? পাঠ-মন্দির তো একজনের বেশি কাউকে নেবে না ?

কিন্তু এখন আর তা হল না। কারণ এখন যে আমি পণ্ডিচেরীর স্বাদ পেয়েছি ! তাই এই দিদির আগমনে মনটা খুশী হয়ে উঠলো—আমি যেমন থাকতে পারব না, তেমন পাঠমন্দির আর একজনকে তো পাবে ? দিদিকে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে বললাম—খুব ভাল হবে দিদি, আপনি আসুন। আমরা দেশের মানুষ হয়েও তো যে-যার কাজ নিয়ে বাইরে-বাইরেই রইলুম……।

কিন্তু আমার সেই প্রস্তাবে কারো উৎসাহ পেলাম না। বরং প্রসঙ্গটা আমার দিকে ঘুরে গেলো। ডাক্তারবাবু অভিমান করে আমার কথা তাঁকে বলতে লাগলেন : এই ছেলেটি অনেকদিন থেকেই পাঠমন্দিরে আসছে, মন্দিরের প্রতি অন্তরের একটা টানও আছে। তবু এর সম্বন্ধেও কিছু বলা যায় না। কারণ কত ছেলেকেই তো এতদিন দেখলুম—পাঠমন্দিরে ঢুকেও শেষে পালিয়ে গেল, আর এ তো এখনো জালেই পড়লো না ? এর আর আশা কি ?

সেই দিদি চুপ ক'রে শুনতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ থেমে আবার

বলতে লাগলেন—তবে সত্যি বলতে কি, আমি এখন আর কারো ওপরই ভরসা রাখি না। জেনে নিয়েছি, আমাকেই শেষ পর্যন্ত পাঠমন্দির আগ্‌লে থাকতে হবে। কিন্তু তোমাকেও বলি, তুমিই-বা আর কতকাল স্কুলের ঘানি টানবে? পণ্ডিচেরীর আশ্রম দেখা তো হয়ে গেল, এবার এখানে চলে এসো না?

মনে মনে ভাবি, এ তো কৌতুক নয়? এ যে ডাক্তারবাবুর সত্যিকারের আহ্বান? দিদির হয়ত সে-আহ্বানে সাড়া দেবার উপায় নাই। তাই দেখলাম তাঁর মুখটি সঙ্গে সঙ্গে এক নিরুপায় ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল।

তা হোক্ গে ম্লান। কিন্তু আমার এ কেমনতরো বুদ্ধি! আমারই সামনে ডাক্তারবাবু যাকে হাসি-কৌতুকের ছলে তাঁর অধ্যক্ষ জীবনের নিদারুণ দুঃখের কথা অমন করে শোনালেন এবং যা শুনে আর একজনের মুখখানি আবার ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল স্বচক্ষে দেখতেও পেলাম, তবু কিনা সেই মানুষেরই কাছে আমি পাঠমন্দির ছেড়ে পণ্ডিচেরী চলে যাবার পরামর্শ নিতে গেলাম?

ডাক্তারবাবুর কাছে এসব পরামর্শ নিতে বাধে। তাই এই দিদির পণ্ডিচেরী যাওয়া শুনে একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—দিদি, আপনি নাকি পণ্ডিচেরী গেছলেন বলে শুনলাম?

দিদি খুব খুশী হয়ে উত্তর দিলেন—হাঁ ভাই, একমাস পণ্ডিচেরীতে কাটিয়ে এলুম।

আমি তখন আর কোন ভূমিকা না করেই আসল কথাটা বলে ফেললাম—জানেন, আমার খুব আশ্রমে থাকবার সাধ? বরাবরের জন্যে থাকতে চাই। কেমন করে মায়ের অনুমতি পাব আমাকে একটু পরামর্শ দেবেন?

আমার প্রশ্ন শুনে তাঁর সদাহাস্য মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি পুনরায় হাসি টেনে উত্তর দিলেন—আশ্রমে গিয়ে বরাবরের জন্যে তুমি থাকতে চাও? কিন্তু মা তো এখন কাউকে আশ্রমে রাখছেন না! আশ্রমবাসীর সংখ্যা ইদানীং খুব বেড়ে গেছে কিনা? তাই আশ্রমে এখন ভীষণ কড়াকড়ি চলছে!

কে যেন হঠাৎ আমার প্রজ্বলন্ত উৎসাহে এক কলসী ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে! হতাশ স্বরে আমি বললাম—সে কি! মা এখন কাউকেই রাখছেন না!

তিনি এবার সংক্ষেপে বললেন—না।

তবুও জানতে চাইলাম—কতদিন এমন কড়াকড়ি চলবে জানেন?

তিনি বললেন—তা-কি বলা যায়? তবে মনে হয় এখন দু'চার বছর তো বটেই!

আর কিছু তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম না। জিজ্ঞেস করবার আর ছিলই-বা কি?

তাঁর কথা তো অবিশ্বাস করারও কোনো কারণ ছিল না। কেননা এই সন্থ-সন্থ তিনি আশ্রম থেকে ফিরে এসেছেন। আবার আশ্রমে একমাস যিনি থেকে এসেছেন নিশ্চই সেখানকার নাড়ী-নক্ষত্রের খবরও তাঁর জানা হয়ে গেছে! তার ওপর, তিনি স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্; আমাকে অকারণে মিথ্যেই-বা বলতে যাবেন কেন? আমি তাঁর সব কথা সত্যি ব'লে বিশ্বাস ক'রে নিয়ে মনে-মনে আঁতকে উঠলাম—ওরে বাবা! দু'চার বছর?

কিন্তু আমার যে আর দু'চার দিনও তর সইছিল না! আমার তখন এমন বুদ্ধি হল না যে, শুধু সেই দিদির কথা বিশ্বাস না ক'রে পণ্ডিচেরীতে শ্রীমাকে পত্র লিখি? তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান মিলে যেত? বাস্তবিক, সব দিক দিয়েই আমি ছিলাম বড় অজ্ঞান—আমার জ্ঞানহীনতার পরিচয় এই কাহিনীব প্রতি ছত্রে ছত্রে খুঁজলে বোধ হয় পাওয়া যাবে।

অবশ্য এখন অন্য কথা ভাবি: ভাবি—সেদিন এই রকম বুদ্ধি না থাকলে এত সব ঘটনাই-বা ঘটতো কি ক'রে? এই সব ঘটবার জন্যেই তো অন্তরস্থিত প্রভু আমায় এই বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন।

দু'চার বছর অপেক্ষা করতে হবে শুনে মনে মনে সংকল্প ক'রে ফেললাম—আর এখানে থাকা নয়! বৃন্দাবন, মথুরা কিংবা হিমালয়ের কাছাকাছি কোথাও চলে যাবো! শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বই-এ পড়েছিলাম—একটা জীবন ভগবানকে দিলে পরের জন্মে তিনি সাধনার উপযোগী জীবন দান করেন। তাই ভেবে নিয়েছিলাম, এ-জীবনটা শুধু এই ভাবেই কাটুক!

যেমন সংকল্প তেমনি কাজ স্বরু হয়ে গেল বেরিয়ে পড়বার। মায়ের দেহরক্ষার একটি বৎসর পূর্ণ হতে তখন কয়েকদিন বাকী ছিল। বাৎসরিক সপিণ্ডকরণাদির জন্য ধান বিক্রী ক'রে কিছু টাকাও সংগ্রহ হয়েছিল। ভাবলাম, এই সুযোগ! গয়াতে গিয়ে একবারে শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ সারবো, তারপর সেখান থেকেই বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু পরিকল্পনাটি গোপনে রাখলাম। আত্মীয় প্রতিবেশী সবাই জানলো যে, আমি পূজোব ছুটির পর আবাব কলকাতায় পড়তে যাচ্ছি এবং শ্রাদ্ধের কাজ আমি গঙ্গাতে করবো।

একেবারে ডাহা মিথ্যে বলিনি। আমার ধারণা ছিল, গয়াতেও গঙ্গা আছে, ফল্গুনদী হয়তো গঙ্গারই কোনো শাখা। কাজেই গঙ্গা বলতে কলকাতার গঙ্গা গয়ার গঙ্গা দুই-ই বুঝাবে।

সপিণ্ডনাদি করবার জন্যে যে পুরোহিত অপেক্ষা করছিলেন তাঁকে তাঁর পাওনা-

গণ্ডা চুকিয়ে দিতেই তিনি খুশী হয়ে বললেন—গঙ্গাতেই তো শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ করতে হয়,—খুব ভাল, খুব ভাল! একেবারে গয়াতে গিয়ে করতে পারলে তো সর্বোৎকৃষ্ট হতো?

সত্য কথা বলবার এমন সুযোগ আমিও ছাড়লাম না, তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললাম—আপনার আশীর্বাদ থাকলে তা-ই হয়তো হবে। আমারও ঐরকম ইচ্ছা আছে—

এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব হল না। সংসারে সব সত্য কথা বলারও বাধা অনেক। তারপর সত্যি-সত্যিই শীতকালের এক সন্ধ্যায় গয়া যাবার উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। রাত্রি ন'টায় ট্রেন ছাড়ে। হাতে অনেক সময়। গয়ার টিকিট ঘরের সামনে বসে-বসে ভাবছিলাম, পথের একজন সঙ্গী পাওয়া গেলে বড় ভাল হত! তা না হলে ট্রেনে উঠে এই রাত্রিতে কি আর গয়ার যাত্রীদের দেখা পাব? অথচ কাউকে যদি না পাই তাহলে শ্রাদ্ধ-শ্রান্তির কাজ একা করবো কি করে?

ভাবতে না ভাবতেই গবগরে নীল দেওয়া কাপড়-জামা-পরা এক ভদ্রলোক হাতে পান দক্তা টিপতে-টিপতে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ভায়ার যাওয়া হবে কোথায়?

আমি উৎকর্ণ হয়েই ছিলাম, উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—গয়া যাবো। আপনারা—?

ভদ্রলোক সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, যেন আমার কথা তাঁর কানে যায়নি এমনি ভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন—গয়াতে কি তোমার কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব আছে? গয়া কেন যাচ্ছো?

তাঁর কথা শুনে মনে এসে গেল,—বলি, হ্যাঁ, আত্মীয়ের বাড়িই বটে! আমার সবচেয়ে পরম আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি! কিন্তু মুখে শুধু বললাম—না, গয়াতে আমার কেউ নেই। লোকে যে জন্যে গয়া যায় আমিও সেই কারণে যাচ্ছি—পিতৃ-মাতৃ-পুরুষের পিণ্ডদান করতে।

মনে হল, আমার সেই কথা শুনেও তাঁর বিশ্বাস হল না। কিন্তু এমনি সময়ে তাঁর সঙ্গের স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন অল্প বয়েসী বাল-বিধবা যিনি ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এসে আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি ব'লে উঠলেন—ও হরিপদ দা'! উনি গয়া যাচ্ছেন পিণ্ডি দিতে, কিন্তু বেডিংটেডিং কই? ওই তো উনির ব্যাগ?

ও ভগবান! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই স্ত্রীলোকটি তাই বুঝি আমার কোলের ব্যাগটা লক্ষ্য করছিলেন? আর এই কারণেই বোধ হয়, হরিপদ দা'ও এতক্ষণ আমার গয়া যাওয়ার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না!

অথচ যে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর অভাব অপর একজনের চোখে সহজেই ধরা পড়ে, সে-সম্বন্ধে আমার কোন খেয়ালই নেই? সত্যিই এ-সব জিনিস যে বিদেশে অত্যন্ত দরকারী তা আমার একটিবারের জন্যেও মনে পড়েনি? কাজেই আমাকে গয়ার যাত্রী ব'লে বিশ্বাস করা একটু কঠিন ছিল বৈকি। এই শীতকালে গয়া যাচ্ছি, সেখানে আমাকে তিনদিন বাস করতে হবে, অথচ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য বস্তুগুলি—এই যেমন, শোবার বিছানা, খাবার বাসনপত্র, অন্ততঃপক্ষে পিপাসার জন্যে না হোক শৌচের জন্যেও একটা পাত্র পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি। আমার কাছে যে সাইড ব্যাগটা আছে সেটা দেখেও কারো আশ্বস্ত হবার উপায় নাই যে, ওটার মধ্যে হয়তো কিছু থাকতে পারে! সেটাতে যে-ক'খানা কলেজের বই আর জামা-কাপড় আছে সেগুলোর চেহারা বাইরে থেকেই সবার নজরে পড়ে।

তাই হরিপদ দা'ও তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—তাই তো! হাঁ ভাই, তোমার ওই ব্যাগটিই কি সব নাকি?

কথাটার উত্তর কি দেবো প্রথমটা বুঝে উঠতে পারলাম না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম—কি জানেন, হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছি কিনা,—মা-বাবার শ্রাদ্ধ করতে যাচ্ছি, বুঝতেই তো পারছেন, নিজের সুখের কথাটা কি আর মনে আছে? কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি! কিন্তু পয়সা কাছে থাকলে তো কোথাও কিছু আটকায় না শুনেছি?

কাছে আমার পয়সা থাক বা না-থাক, যুক্তিটা একেবারে অব্যর্থ। উত্তর শুনে তাঁরা নিরস্ত হলেন। ভদ্রলোক তখন বললেন—না-না, তার জন্যে বলিনি। এম্‌নি জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাকে। তা আমাদের সঙ্গে যখন তীর্থক্ষেত্রে যাচ্ছো তখন ও-সবের জন্যে পাণ্ডাঠাকুরদের কাছে তোমাকে হাত পাততে হবে না। অদূরে গাদা-দেওয়া বড় বড় দু'তিনটা বেডিং, একটা বড় ট্র্যাঙ্ক, দু'তিনটা স্যুটকেস এবং আরও কয়েকটা পোঁটলা-পুঁটলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন—আমরা যা এনেচি তাতেই একজন বাড়তি লোকের চলে যাবে—না কি বলিস্ রে সাবি?

সাবিত্রীও সায় দিলেন—হ্যাঁ, কেন চলবে না? খুব চলবে!

অর্থাৎ, হরিপদ দা'র কৃপা আমার লাভ হল, আমি তাঁদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম!

জানি, এমন ঘটনা কারো বিশ্বাস হবে না। কারণ প্রথমে আমার নিজেরই যে বিশ্বাস হচ্ছিল না—এ যে জল চাইতে না চাইতেই মেঘ! আমার সত্যিই মনে হলো, এমন অপূর্ব যোগাযোগ স্বয়ং ভগবানের দান!

পরন্তু আমার এত কথা বলার পরও যাদের বিশ্বাস না হল, তাদের জন্যে তবে বলি : এই হরিপদ দা' ছিলেন দাসপুর থানার 'সেথো' ! তাহলে হবে তো ?

সেথো, মানে দেশে দেশে যাত্রী সংগ্রহ ক'রে তাদিকে তীর্থ দর্শন করানোই যাঁর ব্যবসা। এই কারণেই বোধহয় তিনি যার চাল-চুলো নাই সেই আমার মত মানুষকেও সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে বিদেশ যাবার পথে সঙ্গী ক'রে নিতে সাহস করতে পারলেন !

সেথোর যাত্রী জুটেছিল মাত্র তিনজন—একজন পুরুষ আর দু'জন স্ত্রীলোক নিয়ে একটি পরিবার। আমাকে নিয়ে হল মোট চারজন। আমাকে যাত্রী পেয়ে সবাই খুশী হলেন। কারণ সেথোর কিছু আয় বাড়ল, আর অন্য যাত্রীদের যৌথ খরচপত্রের ব্যাপারে একজন অংশীদার মিলল।

পরের দিন সকালে ট্রেন থেকে নেমে সেথোর সঙ্গে তাঁর পরিচিত গুপুত পাণ্ডার যাত্রীশালায় গিয়ে উঠলাম। যাত্রীশালায় পাণ্ডা নিজে থাকেন না, স্নান করার পর সেথো আমাদের পাণ্ডার কাছে নিয়ে গেলেন। তীর্থে গিয়ে পাণ্ডাঠাকুরকে তীর্থগুরুরূপে বরণ করতে হয়, তবে তীর্থের কাজ শুদ্ধ হয়। আমাদেরও তাই করতে হল। গয়ালঠাকুরকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করার পর তিনি একে-একে আমাদের হাতে পৈতেটা জড়িয়ে দিয়ে বললেন—আজ থেকে আমি তোমাদের তীর্থ-গুরু হলাম। এবার থেকে যতবার গয়াতে আসবে ততবার আমার কাছেই আসতে হবে !

এ-সব কাজ শেষ হলে সেথো আমাকে দেখিয়ে পাণ্ডাঠাকুরকে ব'লে দিলেন—এ ছেলেটি শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডকরণাদি একসঙ্গে করবে।

পাণ্ডাঠাকুর ভাল বাংলা বলতে পারেন, আমাকে বললেন—তাহলে অন্যদের চেয়ে তোমার খরচটা কিন্তু বেশি পড়বে বাপু।

বললাম—আমার কাজ বেশি, খরচটা বেশি দেব বৈকি।

পাণ্ডাঠাকুর তখন প্রসন্ন হয়ে অন্য সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাকে তিনগুণ টাকার অঙ্ক চেয়ে বসলেন।

শুনে আমি হাঁ ক'রে ভাবছি—এত কম টাকায় শ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডকরণাদির দু-দু'টো কাজ একসঙ্গে হয়ে যাবে ? দেশে আচায্যি ঠাকুরেরা শ'পাঁচেক টাকার মত হিসেব দিয়েও যে মন সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না !

গয়ালঠাকুর আমার মনের কথা ধরতে পারলেন না। ভাবলেন সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাকে বেশি বলেছেন ব'লে বোধহয় আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাই

তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন—ত্যাখো বাপু, তুমি শুধু এই টাকাটাই যা খরচ করবে! ব্যাস্ আর কিছু তোমাকে দেখতে হবে না—পিণ্ডদানের যা-কিছু লাগবে, কাপড়-গামছা সোনা-রূপা কাঞ্চনপাত্র নৈবেদ্য ফলমূল যাবতীয় দানসামগ্রী, মায় পুরোহিত ঠাকুরের খরচটি পর্যন্ত আমার। তুমি শুধু এ-সবের দামটা ফেলে দিয়েই খালাস হলে। আচ্ছা, এবার তুমি হিসেব করো দেখি—তোমার বাড়িতে হলে এই কম টাকায় এত বড় একটা কাজ সারতে পারতে?

সত্যিসত্যি আমি ঠিক এই কথাটাই যে বার বার হিসেব করছিলাম। আর মনে মনে বলছিলাম—আমাদের দেশের লোকেরা তবে কেন অত টাকা খরচ ক'রে শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে যায়? তারা সোজা গয়াতে চলে আসেনি কেন? শুধু খরচ কমের জন্যেও এ-কথা বলিনি, গয়ার শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ আর দেশের কাজ কি এক?

সুতরাং পাণ্ডাঠাকুরের কথায় আমি খুশী হবো না তো হবে কে? তাঁর খাতায় নাম ধাম লিখিয়ে সেখান থেকে আমরা গেলাম বিষ্ণুমন্দিরে।

মন্দির দর্শনের পর পিণ্ডদানের ক্রিয়া শুরু হল। সর্বসমেত ৪৩টি তীর্থবেদী আছে গয়াতে এবং সবগুলিতেই পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সবাই এতসব পারে না। অনেকে যে-তীর্থবেদীগুলি প্রধান সেগুলিতে পিণ্ডদান করেই কাজ সারে। ব্রাহ্মণঠাকুর আমাদেরও তা-ই করতে বললেন। পিণ্ডদান ক্রিয়া স্বরু হয় বিষ্ণুপাদপদ্ম থেকে, আর শেষ হয় অক্ষয় বটে। ব্রাহ্মণঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ফল্গুনদী, প্রেতশীলা, রামশিলা, ব্রহ্মকুণ্ড, রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, ভীমগয়া, রামগয়া ইত্যাদি স্থানে পিণ্ড দিতে হল। ভারি আনন্দে কাটছিল সময়টা! ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রম, মাথার ওপর মার্তণ্ডদেবের অগ্নিবৃষ্টি—এ-সব কিছুরই বোধ ছিল না। এমন কি, পাণ্ডাঠাকুরের কথা মত শ্রাদ্ধের উপকরণ যে শতাংশের এক অংশও ছিল না, এবং আমার মায়ের বাৎসরিক সপিণ্ডকরণের কাজটা যে পৃথকভাবে কিছুই হচ্ছিল না; অন্য সঙ্গীদের যা করাচ্ছিলেন পুরোহিত আমাকেও সেইরকম করাচ্ছিলেন, সে-দিকেও আমার হুঁশ ছিল না। মন্দিরের আশে-পাশে, নদীর তীরে কতজনকে দেখলাম পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে অষ্টাঙ্গে চন্দন লেপন ক'রে পুরোহিতের সামনে হোম করছেন। তাঁদিকে দেখেও আমার চেতনা হল না; ভাবলাম ওঁরা অন্য কোনো উদ্দেশে যজ্ঞ করছেন, আমার ওরকম করার প্রয়োজন নাই। অনেক পুরোহিত অনেক যজমান-যাত্রী দেখে, অনেক মন্ত্র শুনে ওই অভাবের বোধটা একবারেই ভুলে ছিলাম।

কিন্তু প্রমাদ ঘটলো তৃতীয় দিনে পিণ্ডদান ক্রিয়ার শেষে 'সুফল' নেওয়ার সময়।

পুরাতন বটবৃক্ষের তলায় সুফল দান করতে বসে পুরোহিত ঠাকুর প্রথমেই হাত পেতে বসলেন—যে যা দক্ষিণা দিতে চাও আগে আমাকে দিয়ে দাও, তবে আমি সুফল দেবো।

অমনি দলের সবাই প্রতিবাদ ক'রে উঠলো—দক্ষিণা আবার কিসের?

—বারে বাঃ, বাবুলোক! পিতৃ-মাতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করলে দানশেষে দক্ষিণা দিতে হয় তাও জানেন না বুঝি?

—কিন্তু সে তো পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে একবারে সব চুক্তি হয়ে গেছে?

—না বাবুমশাইরা, না। আমার দক্ষিণাটা চুক্তি হয়নি! পুরোহিত ঠাকুর একবারে কেঁদে পড়লেন।—বিশ্বাস না হয় আপনারা গিয়ে পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসুন গে। আসলে এই দক্ষিণাটুকুই আমার লাভ।

দলের একজন বললেন—সে কি রকম? আর আমরা যে অতগুলো টাকা দিলাম সেগুলো কি লাভ নয়? কৈ, সেথো কোথায় গেল, হরিপদ দা' বলুক না?

হরিপদ দা' বোধহয় জেনেশুনেই ঠিক সময়টিতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তাঁকে পাওয়া গেল না কোথাও।

ব্রাহ্মণ আসন থেকে ঘুরে বসে সবাইকে তখন নিবেদন করলেন—দয়া ক'রে আমার কথাটা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা: আপনারা যা টাকা-পয়সা দিয়েছেন সে-সবই পাণ্ডাঠাকুর পাবেন, আমি তো কিছুই পাবো না আমি পাবো শুধু মাসের ঠিকে বেতনটুকু। সারা দিনে হয়তো একটাকা কি দেড়টাকা আমার হিসেবে পড়ে। সব কথা শুনলে আপনাদেরও দয়া হবে, কিন্তু পাণ্ডার দয়া হয় না। কত দূর দেশে আমার বাড়ি, শুধু পেটের দায়ে পড়ে আছি এখানে। আমার একটা মাত্র মেয়ের অসুখ শুনেছি ক'দিন আগে, এমন কাজ বাবু, সেই মেয়েকে দেখতে যাবারও ছুটি পাইনি! এখন যাত্রী আসার সময়, এ-সময়ে ছুটি করলে পাণ্ডা গোসা ক'রে আমার নক্‌রী খেয়ে লিবে!

পুরোহিত ঠাকুরের একটা চোখের মণি সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু অন্য চোখটা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো!

তাঁর কথা শুনে আমরা আকাশ থেকে পড়ি! হায়রে! এমন পুণ্যকর্মের মধ্যেও এত বড় ফাঁকি? যে-পুরোহিত এই তিনটে দিন ধরে সকাল সাতটা-আটটা থেকে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত না খেয়ে না বসে রোদে পুড়ে একবার সীতাকুণ্ড,

একবার ব্রহ্মকুণ্ড, আর একবার বিষ্ণুমন্দির, ফল্গুনদী ক'রে দশ বিশটা জায়গায় মন্ত্র পড়তে পড়তে মুখে ব্যথা ক'রে ফেললে, সে-ই কিছু পেলে না? আর যে-পাণ্ডা তিনতালা বাড়ির ভেতরে পাখার তলায় অসংখ্য দাস-দাসী পরিবৃত হয়ে বসে থেকে একটা পুরণো চুপড়ীতে গামছা শাঁখ পৈতে, কাঞ্চনপাত্রের বদলে পেতলের রেকাবী ইত্যাদি একই জিনিসকে একই ভাবে হাত ফিরি ক'রে লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে প্রতিনিয়ত ঠকাচ্ছে, টাকাগুলো শুধু তারই লোহার সিন্দুকের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে?

এ-সব না জেনে বেশ শান্তিতে ছিলাম, কিন্তু এখন জেনে যে বড় কষ্ট হচ্ছে! এর প্রতিকারের তো কোনো উপায় জানিনে? তবে আগে জানতে পারলে হয়তো পাণ্ডার কবলে না পড়ে বাইরে কোথাও থেকে এই সব পুরোহিত ঠাকুরকেই পুরো টাকাটা দিয়ে পিণ্ডদানের কাজ করানো যেতে পারতো!

পুরোহিতের দুঃখে সবারই প্রাণ গললো! দলের সবাই তাঁকে সাধ্যমত দক্ষিণা দিলেন। কে কি দিলেন আমি দেখলাম না, ইচ্ছে ক'রেই দেখলাম না। তারপর আমার যখন পালা পড়লো তখন আমি পুরোহিতকে বললাম—ঠাকুর, পরে আপনাকে সন্তুষ্ট ক'রে দেবো।

ব্রাহ্মণ রাজী হলেন না। পাছে আমি তাঁকে ফাঁকি দিই এই ভয়ে তিনি জেদ ধরে বসলেন—যা দেবে এখনই দিতে হবে। আমি জানি, পরে আর কেউ কিছু দিতে চায় না।

তথাপি আরো একবার বললাম—পরে আড়ালে আপনাকে খুশী ক'রে দেবো।

তাঁর কিন্তু সেই এক কথা—

সবার সামনে তাঁকে না দেবার একটা কারণ ছিল: বাড়ি থেকে যে নগদ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম তাতে হিসেব ক'রে দেখেছি যে, বাসার খরচ পাণ্ডা-ঠাকুরের প্রাপ্য, সেথোর প্রাপ্য সব দিয়ে-থুয়ে আমার মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্তই যাওয়া চলে। তাই সেই টাকা থেকে আর খরচ করতে চাইছিলাম না।

কিন্তু এই টাকাগুলো ছাড়াও একটা আংটী ছিল আমার কাছে। সেটি কেউ যাতে দেখতে না পায় তার জন্যে কোঁচার কাপড়ে বেঁধে রেখেছিলাম। ভাবলাম, আমাকে যখন ভিখিরি হতেই হবে তখন এটা আর কী কাজে লাগবে? কারো কাছে বিক্রী করতে হলেও ন্যায্য মূল্য পাবো না, লোকে বরং সন্দেহ ক'রে পুলিশে দেবে। তার চেয়ে এটিই দিয়ে দিই—বৃন্দাবন যাবার টাকাটা থেকে কিছু বাঁচবে।

কিন্তু এটি সব দিক দিয়েই যে এমন অনর্থ ঘটাবে তা তখন কে জানতো? আংটীটি বের করতেই দলের সবাই কি যেন বলতে গেলো, কথাগুলো সে-সময়

আমার কানেই এলো না। যারা বললো তারাই শুধু শুনলো! মনে মনে অবশ্য বুঝতে পারলাম—সবাই ক্ষুণ্ণ হলো।

এমন কি, ব্রাহ্মণও সেটি পেয়ে খুব খুশী হতে পারলেন না। মনটার মধ্যে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ রয়ে গেল। পিণ্ডদানের পর প্রতিদিনই ব্রাহ্মণঠাকুর আমাদের বাসায় ভোজন করেন, অন্যদিনের মত সেদিনও ভোজনের সময় তিনি একসময় আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললেন—অঙ্গুরীর ওপরে এটা কি লেখা বলো তো?

আংটীটাতে বাংলায় আমার নাম লেখা ছিল, তা-ই তাকে তখন বললাম। ব্রাহ্মণ শুনে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন—আচ্ছা, এটা সোনার তো?

বললাম—আজ তো আমরা সমস্ত দিনই রইলাম, এর মধ্যে কোনো স্যাক্‌রার দোকানে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে আসুন না? আমার কাছে বেশি টাকা-পয়সা নেই ব'লে এটা দিতে বাধ্য হয়েছি, অমন জানলে দিতাম না?

সেই কথা শুনে তিনি যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আমাকে বললেন—তবে এটা আমাকে গোপনে দিলে না কেন? সব জানাজানি হয়ে গেল, এখুনি পাণ্ডার কানে যদি যায় তাহলে তিনিও আবার এতে ভাগ বসাবেন।

—সে কি, এই যে আপনি বললেন দক্ষিণাটা পাণ্ডার চুক্তির বাইরে—এটাই শুধু আপনার লাভ?

আমি ভয় পেয়ে গেছি দেখে ব্রাহ্মণ আমাকেই আবার অভয় দেন: আচ্ছা তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। কেউ আমার কাছ থেকে এ-জিনিস নিতে পারবে না। আমি খুব খুশী হয়েছি!

ব্রাহ্মণ প্রসন্ন চিত্তে বিদায় নিলেন।

আমি গয়াবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানালাম, যেন এই সামান্য জিনিসটি নিয়ে ব্রাহ্মণকে আবার বিপদে পড়তে না হয়, সবটুকুই যেন তিনি পান!

কিন্তু এ-ঘটনার এখানেই শেষ হলো না, যার জন্যে আংটীর ঘটনাটি উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম সেটা এবার বলি:

আগের দু'দিনে গয়ার অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু—ব্রহ্মযোনী পাহাড়, ফল্গুনদীর তীরে বন-পুল-মেলা ইত্যাদি দেখে এসেছি। শুধু বুদ্ধগয়াটাই দেখতে বাকী ছিল। গয়া থেকে কাল সকালেই চলে যাচ্ছি। তাই ঠিক হয়েছিল একটু বিশ্রাম নিয়ে বুদ্ধগয়া দর্শন করতে যাবো। সেদিন আহারাদির পর সবাই একটু তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিতে গেলাম। বারান্দার রোদ্দুরে একদিকে মেয়েরা আর

একদিকে আমরা কম্বল পেতেছিলাম। পিণ্ডদান ক'রে ফিরে এসে অবধি সকলের মনেই একটা গুমোট অবস্থা লক্ষ্য করছিলাম। কথাবার্তা সবই হয়, কিন্তু আগের মত নয়—কেমন যেন তাদের থেকে আমি পৃথক হয়ে গেছি! সেথো কি একটা কথা আমাকে বলি বলি ক'রেও বলতে পারছিলেন না, এবার বিশ্রামের সময় হয়তো সেই কথাটাই পাড়তেন। কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ শেষ ক'রে মনটা আমার এমন এক শান্তি ও আনন্দের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, কম্বলের ওপর শুতে না শুতেই ছোট ছেলের মত আমি কোথায় তলিয়ে গেলাম।

অল্পক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গতে চোখ খুলে তাকাতেই পাশের কম্বলে স্ত্রীলোক দুইটির চোখে চোখ পড়ে গেল। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আর একদিকে তাকিয়ে দেখি—অন্য সঙ্গীরাও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কি? আমি অমনি সন্ত্রস্ত হয়ে কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে উঠে বসলাম। অনুমানে বুঝলাম, সঙ্গীরা আমার সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা করছিলেন।

আমি উঠে বসতেই সেথো একটু দূরে ছিলেন আমার কাছে এসে বসলেন। তারপর তিনি এ-কথা সে-কথা আলোচনা করতে লাগলেন: অন্য সঙ্গীটিকে জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে গয়া থেকে তোমরা কোথায় যাওয়া ঠিক করলে গো?

এ-কথা জিজ্ঞেস করার মানে কি আমি বুঝলাম না। সেথো যখন তাঁদের দেশ থেকে যোগাযোগ ক'রে এনেছেন তখন সবই তো তাঁর জানা? তবে আবার এ-প্রশ্ন কেন?

অন্য ভদ্রলোকটি বললেন—বিনা পয়সার পাশ যখন পেয়েছি তখন প্রয়াগ পর্যন্ত যাবো। আরও যেতাম কিন্তু টাকার টান পড়বে। এখন বাড়াবাড়ি থাক, পরে আবার তখন দেখা যাবে—না, তুমি কি বলো হরিপদ দা'?

এই ব'লে সেথোর মুখের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

সেথো তাঁর কথায় কোনো রকমে সম্মতি দিয়ে এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তাহলে কোথায় যাবে?

বললাম—দেখি কতদূর যেতে পারি! কোথায় যাবো বললে হয়তো তাঁরা এখুনি ব'লে বসবেন আমাদের সঙ্গে চলো? কিন্তু আর আমি তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইনে। তাই এরকম উত্তর দিলাম।

উত্তরটা খুব সহজ হলো বটে, কিন্তু সেথো আবার আমায় প্রশ্ন করলেন—তোমার কাছে তাহলে বোধ হয় আরও টাকা আছে? না হলে এ টাকায় তো আর বেশী দূর যাওয়া সম্ভব নয়? আবার ঘরে ফিরতে হবে তো?

আমার টাকা পাছে হারিয়ে যায় এবং তাতে সেথো ও আমি উভয়েই কষ্ট পাই, তার জন্যে তিনি সব টাকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এই কারণে আমার তহবিলের খবরটা তাঁর অবিদিত ছিল না।

সেথো তাই এখন আমার অভিসন্ধি আন্দাজ ক'রে নিয়ে আমাকে চেপে ধরলেন—আমি যা জিজ্ঞেস করবো তা তোমাকে সত্যি ক'রে জবাব দিতে হবে?

বললাম—কি বলুন?

—তুমি আর বাড়িতে ফিরতে চাও না নাকি? তোমার মনের গতিক দেখে তো তা-ই বোধ হচ্চে! তা যদি হয়, তবে আমার সেথোর প্রাপ্যও মেটাও? সবার পাওনা-গণ্ডাই তো দিলে দেখলুম, তাহলে আমিই-বা বাদ রয়ে যাই কেন? মনে করেছিলুম ছেড়ে দেবো। কিন্তু না, আমার পাওনা সবই চাই—তাতে তোমার আর কোথাও যাওয়া হোক বা নাই হোক! না কি বলেন কুঞ্জবাবু? অন্য সঙ্গীটিকে সেথো সাক্ষী মানলেন।

অবশ্য সেথো যেমন জোর দেখিয়েছিলেন আমারও তেমনি জোর দেখাবার কারণ ছিল। কেননা, আমি ঘর থেকে তাঁর সাহায্যের ভরসায় গয়া আসিনি? সেই হিসেবে পুরো প্রাপ্য চাইবার অধিকার তাঁর ছিল না। তথাপি সব পাওনা-গণ্ডাই তিনি বুঝে নিয়েছেন এবং আমিও দিয়েছি স্বেচ্ছায় সানন্দে: বিষ্ণু-মন্দিরের যে-ধ্বজা ওপরের দিকে চোখ তুলতেই দেখা যায়, সেই ধ্বজা দর্শন করাবার নাম ক'রে তিনি বললেন—বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করালুম, দর্শনীর মূল্য দাও। আমি তা দিয়েছি। ফল্গুনদী না কি যেন দর্শন করিয়ে বললেন, দর্শনী দাও। তা-ও দিয়েছি। এম্নি আরো কি কি দর্শন করিয়ে তিনি দক্ষিণা নিয়েছেন। খাওয়া-থাকা হাত-খরচের জন্যে যৌথভাবে তো তিনি নিয়েইছেন।

তাছাড়া সপিণ্ডকরণাদির নামেও অন্য সঙ্গীদের চেয়ে তিনিই আমাকে দু'তিনগুণ টাকা বেশি দেওয়ালেন। জানিনা পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে তাতে তাঁর কি রকম ভাগ-বাটুরা? তার জন্যে কিন্তু পাণ্ডাঠাকুরকে আমি একটুও দোষ দিইনে। কারণ আমার যেমন ব্যারাম তিনি বরং সেইরকম ওষুধই দিয়েছিলেন। যদি তিনি অন্য সঙ্গীদের মতই আমার খরচের হিসাব ধরতেন, তাহলে আমার মন মানত কিনা কে জানে? হয়ত ভাবতাম, শুধু শ্রাদ্ধের কাজটাই হল, মায়ের সপিণ্ডকরণাদির কাজটা হল না!

কিন্তু আমার বক্তব্য হল, সেথো নিজেদের দেশের লোক হয়ে কেন জেনেশুনে আমার কাছ থেকে বেশি নেবার সুযোগ করে দিলেন পাণ্ডাঠাকুরকে? তিনি তো

জানেন সব যাত্রীরই একই ক্রিয়া-কর্মের ব্যবস্থা? তবে কেন তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন না আগে থেকে?

এই কারণেই বলছিলাম, তাঁর এই অন্যায় আব্দার না মানতেও আমি পারতাম। কিন্তু আমার কাছে তখন যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন—সব সমান! যে-ক'টা টাকা হাতে নিয়ে বেরিয়েছি তা দিয়ে তো আর সারা জীবন চলবে না? অথচ সারা জীবনই যে আমাকে কাটাতে হবে বৃন্দাবন মথুরায়! সুতরাং দু'দিন পরে হলেও যা ফুরোবে, তা যদি দু'দিন আগেই ফুরিয়ে যায় তবে তার জন্যে আক্ষেপ করব কোন্ যুক্তিতে? তাই খুশী হয়ে সেথোগিরির অতিরিক্ত প্রাপ্য যা তিনি চাইলেন সেথোকে মিটিয়ে দিলাম।

সেথো অবশ্য দয়া দেখিয়ে তারপর আমাকে বলেছিলেন—তুমি এখন যদি টাকাটা দিতে না পার, তাহলে বলো দেশে ফিরে গিয়েই দিয়ে দেবে? তাতেও আমার বিশ্বাস আছে। তীর্থের দেনা কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না! আর যদি বলো, বাড়িতে ফিরবে না—মানুষের এমন অনেক কারণ থাকে ঘরে না ফিরবার—তবে তুমি না-হয় আমার সঙ্গেই চল না? আমি তোমাকে তীর্থদর্শন করিয়ে আমার ঘরে নিয়ে যাব। আমারও তো ছেলেপুলে নাই, স্বামী-স্ত্রীতে থাকি—না কি বলেন কুঞ্জবাবু? সেথো আবার একবার সঙ্গীযাত্রীর অনুমতি চাইলেন।

আমি তাঁর কোন কথারই উত্তর দিলাম না দেখে সেথো চুপ করে গেলেন, এবং শেষে উল্টো সুর ধরলেন এই বলে যে—নাঃ! এসব কাজে আবার বাধা দেওয়াও ঠিক নয়! তোমার ভাই যা ইচ্ছা তা-ই কর, যেখানে খুসী সেখানেই যাও।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে তখন একজন আপত্তি করে উঠলেন—কিন্তু তাই ব'লে তুমি গয়া থেকেই আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে পাবে না। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাশী পর্যন্ত তো চল। তারপর যা হয় হবে। তাতেই রাজী হলাম।

বাস্তবিক এতসব কথা আপনাদের কাছে বলবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না আমার, বিশেষ করে পিতৃ-মাতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপার নিয়ে? পরন্তু গয়া থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে যে-ঘটনাটা ঘটে গেল সেদিন, পাঠকদের বিচারক-মনের কাছে তার একটা কৈফিয়ৎস্বরূপ এটুকু না বলেও আবার স্বস্তি পাই না!

তা যা হোক, পরের দিন সেথোর সঙ্গে ট্রেনের একই কামরায় উঠে কাশী রওনা হলাম। সেথো কর্মিষ্ঠ লোক, পথের মধ্যেই কয়েকজন নূতন যাত্রী জুটিয়ে ফেললেন, সারা রাস্তা তাদের সঙ্গে আনন্দ আহ্লাদ করতে করতে গেলেন। তারপর ষ্টেশনে

নেমে টাঙ্গার গাড়ীতে উঠে আমাকে শুধু একবার বলে গেলেন—আমরা সামনের কোন ধর্মশালায় উঠছি, অসুবিধে হলে আমাদের কাছে চলে যেও।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেইখান থেকেই সঙ্গীদের টাঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ তা-ও আর দেখা গেল না, জনারণ্যে কোথায় তারা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ মনটা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ল। মনে হল, এখনও বোধহয় সঙ্গীরা বেশিদূর যেতে পারেনি, একবার ছুটে গিয়ে তাদের হাতে-পায়ে ধরলে তারা নিশ্চয় আমাকে ফেলে যেতে পারবে না! আর তাছাড়া হাতে-পায়েই-বা ধরতে হবে কেন? সেথো নিজেই তো আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন? এমন অজানার পথে পা বাড়াবার প্রয়োজন কি? ফিরে যাই তাঁদের কাছেই!

এমন সময় মাথায় পাগড়ী হাতে লাঠি একজন হিন্দুস্থানী এসে আমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল, বললে—চলিয়ে বাবু, হামাদের আশ্রমে। তুমার কুছু অসুবিধা হোবে না।

কিন্তু আমি নিজে তো জানি আমার পয়সার দৌড় কতদূর? আর পকেটে পয়সা না থাকলে কম বন্ধুই খাতির করে! তাই তাকে বললাম—কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা-কড়ি বিশেষ কিছু নাই বাপু, তোমাদের আশ্রম কি বিনামূল্যে থাকতে দেবে?

লোকটি কি বুঝল তা সে-ই জানে। কিংবা হয়ত কিছুই সে বুঝেনি; আমার কথা না বুঝেই বললে—আচ্ছা আচ্ছা বাবু, চলিয়ে না? সব কুছু মিলবে।

শেষে তার সঙ্গে গিয়ে হরপার্বতী আশ্রমে উঠলাম। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিলাম: এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি।

কিন্তু হায়রে অর্থ! তুমি যেখানে নাই সেখানে অন্নও নাই আর আনন্দও নাই! এমন হৃদয়ের রাজধানীতে মা অন্নপূর্ণার কাশীতে এসেও কোথাও অন্নের সংস্থান হল না! হরপার্বতী আশ্রমে বিনামূল্যে শুধু থাকার ব্যবস্থাটা হয়েছিল, নিজের খরচে কোনরকমে একবেলা খেয়ে কাটালাম। শুনেছিলাম মথুরা বৃন্দাবনে খাওয়া থাকার ভাবনা নাই। তাই না-খেয়ে না-দেয়ে যেমন করে হোক সেখানে পৌঁছনো দরকার। রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুসন্ধান করে জানলাম, হাতে যে-ক'টা টাকা এখনো আছে তাতে প্রয়াগ পর্যন্ত যাওয়া যায়। কাজেই সে-টাকাটা থেকে আর খরচ করতে ভরসা কুলোচ্ছিল না।

আশ্রমের ম্যানেজার কালিবাবু বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি কিভাবে যেন

আমার উপবাসের কথাটা শুনে ফেললেন। শুনে ঘরের লোকের মত রেগেই অস্থির। হাত মুখ নেড়ে আমাকে বললেন—মরবে, এ ছোকরা নিশ্চয় মরবে না খেয়ে খেয়ে। এই কিছুদিন হল আর একজন অবধূত এসেছিল, সে-ও এমনি না খেতে পেয়ে গাছের কাঁচা পাতা চিবিয়ে প্রাণটা দিলে! আবার এ-ও সেইরকম মরবে বলে এসেছে কাশীতে! বলি—হ্যাগো, তোমার কি বাড়িতে কেউ নাই যাকে একটা খবর দিলে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়? থাকে তো বলো না—আমিই না-হয় তোমার হয়ে একখানা পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিই?

আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি! সত্যি সত্যিই তিনি বুঝি বাড়িতে পত্র লিখে বসেন! তাঁকে বাধা দিয়ে বলি—না না, ও চেষ্টা করবেন না? ভয় নাই আপনাকে আমি বিরক্ত করব না, কাল সকালেই আমি কাশী থেকে চলে যাচ্ছি!

এই বলতে তিনি যা হোক শান্ত হলেন।

পরের দিনই প্রয়াগ যাত্রা করলাম। কাশীর মত এলাহাবাদ ষ্টেশন থেকেও বটুরাম পাণ্ডার লোক এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। পাণ্ডার এইসব লোকেদের মনে হয় প্রতিদিন ট্রেন এলেই মনিবকে নূতন নূতন যাত্রী নিয়ে গিয়ে দেখাতে হয়, না হলে তাদের চাকরী থাকে না? তাই আমার মত যাত্রীরও স্থান হয়ে গেল পাণ্ডার বাড়িতে।

কিন্তু অন্নের সংস্থান হল না। হাতে যে-ক'টা পয়সা ছিল তাতে অন্নের ব্যবস্থাও হত না, ট্রেনের টিকিটও হত না। সেগুলো তাই ত্রিবেণী সঙ্গমে মাথা মুড়িয়ে খরচ করে এলাম। সারাটা দিন উপবাসে কাটল।

সন্ধ্যের সময় একদল বাঙালী যাত্রী এল পাণ্ডার বাড়িতে। তাদের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। আমি বৃন্দাবন যেতে চাই শুনে তিনি বললেন—তুমি কি নবদ্বীপ হয়ে এসেছো?

বললাম—না তো। নবদ্বীপ যাবার কথা আমার মনেই পড়েনি। শুধু বৃন্দাবনের জন্যেই প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তিনি বললেন—কিন্তু আগে নবদ্বীপ গেলে ভাল করতে।

ভাবলাম, তবে কি ভুল করলাম? নবদ্বীপ আগে না গেলে কি বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না বা যাবার অধিকার হয় না! বললাম—কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন—জানো তো, আগে ভজন তারপর কীর্তন। নবদ্বীপ হল তোমার ভজনের স্থান। সেখানে ভজন শেষ করে কীর্তন করতে যেতে হয় বৃন্দাবনে।

বললাম—কি জানি, অতশত বুঝিনে মশাই। আমি বৃন্দাবন যাচ্ছি সেখানে চিরকাল বাস করবার জন্যে।

ভদ্রলোক বোধহয় নবদ্বীপের বৈষ্ণব। গলায় তুলসীর মালাও যেন দেখলাম। তাই তিনি কীর্তন-ভজন সম্বন্ধে এত আলোচনা করলেন। একই স্থানে আমাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে দেখে আহারের কথা তিনিই জিজ্ঞেস করলেন, তারপর আমার আহার হয়নি শুনে তাঁদের ঘরে নিয়ে গিয়ে আহার করালেন। মনে হয় আমাকে তাঁর নবদ্বীপে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার বৃন্দাবন-প্রীতি দেখে তিনি অতটা আর সাহস করলেন না।

সেদিনটা কাটল এভাবে। পরের দিন রেল ষ্টেশনে গেলাম বৃন্দাবনের গাড়ীর সময় জানতে। এলাহাবাদ ষ্টেশনের একদিকে দোতলা-তেতলা বাড়ির মত উঁচু ব্রীজে উঠতে অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সেখানে দেখতে পেলাম ছাত্র এবং অফিসারবাবুদের সাইকেল ওপরে তোলার কাজ করছে অনেকে। দেখে ভাবলাম, মন্দ কি? এই কাজটা করেও তো আমার অন্নের সংস্থান হয়? চাই কি, সকাল বিকেল দু'বেলা করলে হয়ত বৃন্দাবন যাবার গাড়ী ভাড়াটাও হয়ে যেতে পারে?

এই কথা ভেবে সেই স্থানে দাঁড়াতেই তৎক্ষণাৎ একটা সাইকেল তোলার কাজ পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা ঘাড়ে তুলে ওপরে উঠতে লেগে গেলাম।

হা ভগবান! যে-কাজটাকে দেখে কত সহজ ভেবেছিলাম সেটা এত কঠিন? কিছুদূর উঠেই আমি হাঁপিয়ে পড়লাম। পা দুটো এমন ভারী হয়ে উঠল যে, মনে হল এবার এক পা বাড়ালেই সাইকেল সমেত আমি নীচে পড়ে যাব। তবুও মুখে 'না' করিনি। উঠছিলাম। কিন্তু যার সাইকেল সে আমার পেছনেই আসছিল, আমার যেতে দেরী দেখে সে সাইকেল কেড়ে নিয়ে গট্ গট্ করে ওপরে চলে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়ে গেলাম।

তারপর থেকে আর কোন কাজের চেষ্টা করিনি। বুঝলাম, উপবাস-ক্লান্ত দেহটা কোন দৈহিক শ্রম করারও যোগ্য নয়। এমন কি প্রয়াগ থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাবার কথাও চিন্তা করতে পারছিলাম না। কত দূর পথ কে জানে, উপবাস করে অতদূর হাঁটবো কি করে?

কিন্তু প্রয়াগে থাকলে তো উপবাস ছাড়া আর কোন উপায় নাই? তাই মরিয়া হয়ে উঠলাম বিনা টিকিটেই গাড়ীতে যাবার জন্যে। রাত্রি সাড়ে তিনটেয় একটা ট্রেন পেলাম। তাতেই উঠে পড়লাম।

ট্রেনে উঠে ম্যাকবেথের মত আমার অবস্থা হল : যাত্রী পুলিশ রেলওয়ে কর্মচারী সবাইকেই দেখে ভাবি, এই বুঝি তারা আমাকে চিনে ফেলল, এই বুঝি আমাকে ধরে ফেলল ! আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠি ! দেশ থেকে যা কাপড়-জামা এনেছিলাম প্রয়াগে সে-সব লোককে দিয়ে দিয়ে অনেকটা হাল্কা হয়েছিলাম। কিন্তু বিপদ তাতে বেড়েই গেল—পুলিশ এবং যাত্রীদের চোখে আমি যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলাম।

তথাপি সেইভাবেই বাকী রাতটুকু গাড়ীতে কাটল। প্রভাত হতে দেখি সেই কামরা-ভর্তি বাঙালী তীর্থযাত্রী। রাত্রে সব ঘুমিয়ে ছিলেন বলে বুঝতে পারিনি। পাশাপাশি যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের অনুরোধ জানালাম : প্রয়াগে এসে আমার হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেছে, দয়া করে আপনারা আমাকে বৃন্দাবন পর্যন্ত নিয়ে যাবেন ? গাড়ি ভাড়ার দামটা আপনাদের কাজ-কর্ম সেবা দিয়ে শোধ করে দেব ?

সবাই হেসে উঠলেন। একটি ছোকরা বললে—কি দিয়ে শোধ দেবে বলছে গো মামা ? সেবা দিয়ে ? হাঃ হাঃ ! ওসব চুরি করবার ফন্দী ! সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই চুরি করে একসময় কেটে পড়বে। ওরকম আমাদের অনেক দেখা আছে !

আর একজন বললে—এখুনি পুলিশে দিয়ে দাও ! পয়সা নাই তো ট্রেনে উঠল কেন ? দাঁড়াও—এই বলে সে নিজেই কষ্ট করে টিকিট-চেকারকে ডেকে আনলে। চেকার মহাশয় আমার কাছে টিকিট চেয়ে না পেতেই অতি অমায়িকভাবে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন।

আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্টের মোবাইল কোর্টে আমার অপরাধের বিচার হল। বিচারক ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলেন—দেশ কোথায় ?

বললাম——পশ্চিম বাংলা।

বললেন—বাঙালী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর।

বিচারক শুনে বড় রকম একটা 'হুঁ' শব্দ করে উঠলেন। মানে তিনি সব বুঝে ফেললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তা বিনা টিকিটে যাচ্ছিলে কোথায় ?

বৃন্দাবন যাচ্ছিলাম বলতেই তিনি বললেন—একেবারে হাওড়া থেকেই বিনা টিকিটে আসছিলে ? সাহস তো কম নয় ?

—আজ্ঞে না, স্যর ! প্রয়াগ পর্যন্ত টিকিট করে এসেছি। প্রয়াগে এসে পয়সা

ফুরিয়ে যেতে এই এলাহাবাদ ষ্টেশন থেকে এইটুকু পথ বিনা টিকিটে আসতে বাধ্য হয়েছি।

কিন্তু এত কথা বললে কি হবে? হাকিমের বুদ্ধি বেশি, তিনি আসল সত্যটা ধরে ফেললেন। আমাকে জেরা করলেন—তাহলে তুমি ঘরে আবার ফিরবে কি করে?

বিচারককে মনের কথাটা খুলে বললাম—বৃন্দাবনে বরাবর থাকবার জন্যে যাচ্ছি স্যর, আর ফিরে আসব না! দয়া করে যদি ছেড়ে দেন তাহলে আমি এবার এটুকু পথ হেঁটে চলে যাব।

বিচারক সে কথা বিশ্বাস করলেন না। বললেন মিথ্যে কথা। তুমি হাওড়া থেকেই বিনা টিকিটে আসছ! সেজন্যে কুড়ি টাকা জরিমানা করা হল! দিতে পারবে? হাকিমের কাছে কেঁদে পড়লাম—কুড়ি টাকা কোথায় পাব স্যার? টাকা থাকলে কি বিনা টিকিটে আসি? আর দেশে খবর দিয়ে যে টাকা আনবো তার জন্যে কি সময় দেবেন আপনারা?

হাকিম আর কোন কথাই শুনলেন না, রায় লিখতে সুরু করে দিলেন। মাত্র কুড়ি টাকার জন্যে আমার এক মাসের জেল হয়ে গেল। সেই কোর্টেই আরো সব অপরাধীর বিচার হল। শশী মহারাজও আমার মত বিনা টিকিটের আসামী। তাঁরও হল একমাসের জেল। কিন্তু কামাখ্যার শশী মহারাজের আরো একটা বড় পরিচয় আছে, এই প্রসঙ্গে সেটা একটু বলা দরকার:

শশী মহারাজ সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই তাঁর এ-পরিচয় পাইনি। তাঁর অঙ্গের গেরুয়া বসন রোদে জলে ময়লায় কালো চট হয়ে উঠেছে। হাতে তাঁর লোটা-চিম্‌টেও নাই কমণ্ডলুও নাই। শুধু তৈলবিহীন লম্বা লম্বা চুলগুলোতে জট্ পাকিয়ে তাঁকে ভিখিরি সাজিয়ে রেখেছে। তবে হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর শক্তির অহঙ্কার ছিল। তাই তিনি তখন ওইভাবে শক্তির আস্ফালন করতে পেরেছিলেন—'পুলিশের সাধ্যি কি আমাদের জেলের মধ্যে আট্‌কে রাখে? পুলিশ-ভ্যান্‌টা যখন অ্যাক্‌সিডেণ্ট করবে তখন বাছাধনেরা টেরটা পাবে!'

জেলের বাইরে এসে শশী মহারাজকে চিনতে পারলাম।

মহারাজ জেলগেট পার হয়ে দু'পা না আসতে আসতে একটা বাগানের বেড়ার ধারে গেল ফুল ছিঁড়তে। আমি ভয় পেয়ে যাই—আহা! করো কি মহারাজ, এই না জেল থেকে বেরোলে? আবার এখুনি পুলিশে ধরবে যে?

মহারাজ নিরুদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিলে—না হে না, আর ধরবেনা, ফাঁড়া কেটে

গেছে। এই ব'লে কতকগুলো ফুল ছিঁড়ে ঝোলার মধ্যে রাখতে রাখতে আপন মনে বললে, কই গো, কোথায় আবার লুকোলে? এতদিন ফুল-তুলসী পাওনি ব'লে রাগ হয়েচে বুঝি? ছাখো দিকি, তার জন্যে আমি কি করবো! তুমিই তো জেনে-শুনে এ-সব ঘটালে—না কিহে, তুমিই বলনা? মহারাজ আমাকে সাক্ষী মানলে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম—কাকে বলছেন?

আর বলো কেন! এই দামোদর ব্যাটাকে বলচি—আর কাকে বলবো? আছেই-বা কে আমার? তারপর অনেক খুঁজে-পেতে ঝোলার ভেতর থেকে একখণ্ড কালো কুচকুচে শালগ্রাম শিলা বের ক'রে আনলে। এই ছাখো! এনারই জন্যে আমার এই হাল্যং—বুঝেচো?

এই দামোদর হলেন তাঁর গৃহদেবতা, সন্ন্যাস নিয়ে দেবতাকে সঙ্গে ক'রে সেই যে কবে পথে নেমেছিলেন, আজও তিনি ঝোলার মধ্যে তেমনি রয়েছেন, বরং যত্ন-আর্তি প্রেম-অনুরাগ তাতে আরো কিছু বেড়ে কী অপূর্বই না হয়ে উঠেছে। চোখের কোণে আমার জল এসে গেল, মনে মনে বলি—আমি তো দামোদরকে এমন ক'রে পাইনি, আমার না হয় যা হোক হল। কিন্তু দামোদরের সঙ্গে যার নিত্য বাস, তারও জীবনে এত বিপত্তি?

এখন শশী মহারাজকে সন্ন্যাসী জেনে, তাঁর কাছ থেকে একটা দরকারী পরামর্শ নিতে গেলাম। বললাম—মহারাজ, আপনি তো অনেক জায়গাতেই ঘুরে বেড়ান, কখনো পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গেছেন?

শশী মহারাজ মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন—কেন বলো তো?

মানে, পণ্ডিচেরী যাবার রাস্তাটা আমি জানতে চাই। জেলে থাকতে প্রতি-দিনই আমি পণ্ডিচেরী যাবার স্বপ্ন দেখতাম,—গাছপালা পাহাড় পর্বত মেঘ ছাড়িয়ে 'মেঘদূত'-এর মেঘের মতো বহু দূরের পণ্ডিচেরী উড়ে চলেছি! কিন্তু সত্যিসত্যিই তো আর সেখানে উড়ে যাওয়া যায় না? কিভাবে কোন্ দিক দিয়ে পণ্ডিচেরী যাওয়া যায় বলতে পারেন···

কথার মাঝে আমাকে থামিয়ে দিয়ে শশী মহারাজ বললেন—আবার পণ্ডিচেরী যাবে কি করতে? আমার সঙ্গে চলো—আমি তোমাকে গয়া কাশী দিয়ে আসামের কামাখ্যা মন্দিরে নিয়ে যাবো।

বললাম—আবার বিনাটিকিটে?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আর কোন হতভাগা আমাদের ধরতে সাহস করবে না!

আমি জেদ ধরে বললাম—না মহারাজ, ওইটি আমাকে মাপ করতে হবে। এখুনি আমাকে বৃন্দাবন যেতে হবে, পরে তখন ও-সব ভাবা যাবে।

মহারাজ অমনি রাগ ক'রে বললেন—তবে তুমি যাও! আমি কিন্তু ও-পথে আর পা বাড়াচ্ছিনে! এই ব'লে আমাকে ছেড়ে তিনি অন্য পথে হন্‌ হন্‌ করে চলতে সুরু করলেন।

পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া সঙ্গীটিকে পথেই বিদায় দিতে হলো। আমি একা এসেছিলাম, আবার একাই চললাম শ্রীবৃন্দাবনের পথে!
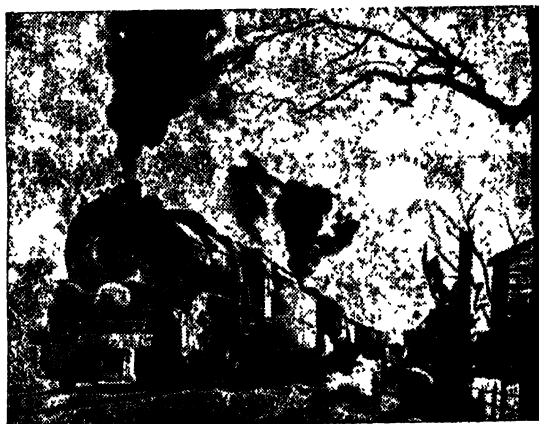
[চার]

বৃন্দাবনের প্রতি আমার কেমন যেন একটা মমতা ছিল। বৃন্দাবনের নাম শুনলেই সমস্ত অন্তরটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠত! পদাবলী সংগীত শুনতে শুনতে চোখের সামনে যে ছবি ফুটে উঠত, হৃদয়ে যে রসলোকের আবির্ভাব ঘটত, তেমনি হত ঐ স্থানটির নাম শুনলেই!

তাছাড়া, শুনেছিলাম বৃন্দাবনে অনেক ছত্র আছে, সেখানে একটিবার হাজির হতে পারলেই ভোজন পাওয়া যায়। তা-ই শুনে মনে মনে একটা হিসেব করে নিয়েছিলাম—তবে আর আমার ভাবনা কি? বৃন্দাবনের ছত্রে গেলে রুটি তো পাব? আর বিনা পয়সায় কলের জল তো আছেই? তারপর বাকী থাকে মাথা গুঁজবার মতন একটা আশ্রয়। শুধু রাতটুকুর জন্যে—তা যেমন করে হোক জুটে যাবে। কিছুদিন গাছের তলায় পাহাড়ের গুহায় থাকতে থাকতেই রূপ-সনাতন গোস্বামীদের মতন যমুনা কিনারে লতা-পাতা দিয়ে একটা ছোট্ট গোছের কুটীর বেঁধে নেওয়া যাবে? মোটের ওপর, কি করে কি হবে জানি না, শুধু এইটুকু জানি বৃন্দাবনে একটিবার পৌঁছতে পারলেই আর আমার নিজের ভাবনা ভাবতে হবে না। যে-ভাবেই হোক জীবন সমস্যার একটা সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু হল না। বৃন্দাবনে মাত্র পাঁচ ছ'টা মাস কাটতে না কাটতেই বুঝতে পারলাম, ভুল করে বৃন্দাবনে এসেছি। এখানে আমার মত মানুষের স্থান হয় না। বৃন্দাবন সাধু-বৈষ্ণবের জায়গা। পরন্তু আমি না সাধু, আর না বৈষ্ণব। এমনকি, ছত্রে রুটি পাবার জন্যে শুধু কাপড়টা রাঙাতেও পারলাম না। তেমন করেও অনেকে ওসব দেশে জীবিকানির্বাহ করছে চোখের সামনে দেখলাম। কিন্তু তাদের দেখেও মনে বল পেলাম না। কারণ তাতে আদর্শে বাধে। শ্রীঅরবিন্দের সাধারণ পোশাক, আমি তাহলে কাপড় রাঙিয়ে সাধু সাজি কেমন করে? তাছাড়া এ যে মিথ্যাচার? এ যে নিজেকে ঠকানো, অন্যকে ঠকানো? কাজেই ওদিকটা বাদ দিতে হল।

এমন কি আমি ভিখিরী সাজতেও পারলাম না। বৃন্দাবনে ভিখিরীদেরও মান-সম্মান আছে, ছত্রের রুটিতে সাধু-বৈষ্ণবদের মত তাদেরও সমান অধিকার আছে, তাদেরও কোন অভাব হয় না—বস্ত্র জোটে অর্থ জোটে, শীতকালে গায়ে দেবার কম্বল-চাদরও জোটে। কিন্তু আমার কিছুই জোটে না, আমার চেহারা বেশ-বাস দেখে কেউ ভিখিরী মনে করে না! মনে করবে কি করে? পরনে থাকে বাঙালী ভদ্রলোকের কাছা-কোঁচা আঁটা ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী সার্ট না থাকলেও একটা

ভাল গেঞ্জি থাকে, আর তার ওপর থাকে নূতন চাদর। কাজেই আমাকে দেখে ভিখিরী ভাববে কার এমন দুঃসাহস ?

তারপর আর একটা উপায়ই মাত্র বাকী থাকে যাতে কোন মঠে আশ্রমে না গিয়ে শুধু সেবাকর্মের বিনিময়ে লোকে যেমন চাকরী করে তেমনভাবে স্বাবলম্বী হয়ে বৃন্দাবনে বাস করতে পারি। তা-ও করে দেখলাম। কিন্তু তাতেও ভিন্ন মত ভিন্ন আদর্শে বিরোধ বাধে, অন্তরের শান্তি বিঘ্নিত হয়। বৃন্দাবনে এসে এরকম অবস্থায় যে পড়বো, রুটি পাবার জন্যে যে শেষ পর্যন্ত আমাকে কোন সাধু-মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিতে হবে, কিংবা কোন মঠ-আশ্রমের দুয়ার ধরতে হবে, তা যেন আগে থেকে জেনেই সর্বজ্ঞ গুরু আমার মথুরা জেলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখলেন—'তুমি আর কারো কাছে যেও না, আমি তোমায় গ্রহণ করেছি !

সত্যি কথা বলতে কি, শুধু এই কারণেই চিরকালের প্রেমের দেশে আমার বাস করা হল না। প্রতি পদে বাধা এসেছে, কত রকম পরীক্ষার মধ্যে পড়েছি, আর বার বার গুরুদেব আমাকে রক্ষা করেছেন। সে এক অদ্ভুত কাহিনী—রাধা-কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শনের এক অপরূপ অনুভূতি ! চিরকালের প্রেমের দেশের সে-কাহিনী পৃথকভাবে বলার ইচ্ছে রইল।*

তা যাই হোক, পাঁচ-ছয় মাস বৃন্দাবনে কাটবার পর একদিন পণ্ডিচেরীই চলে যেতে বাধ্য হলাম।

বৃন্দাবন থেকে পণ্ডিচেরী যেতে হলে মথুরা ষ্টেশন দিয়ে যেতে হয়। খুব বড় জংশন মথুরা। এদিকে বিহার বাংলাদেশ দক্ষিণ ভারত, আর ওদিকে দিল্লী পঞ্জাব হরিদ্বার যেখানেই যাও এই মথুরা রেল ষ্টেশন দিয়ে যেতে হবে।

এসব খবর আমাকে দিয়েছিল বৃন্দাবনে আমার একজন সঙ্গী। সে এসব খবর জানে ভাল। দু'দিন ছাড়া সে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে।

বৃন্দাবন থেকে আসবার আগের দিন তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম—কি করি বলোতো ? বৃন্দাবনে পৌছে পথ চলার সমস্ত অভিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিয়ে একদিন বলেছিলাম, যাক্ আর আমার এসবের কোন প্রয়োজন নাই ! আর কখনো আমাকে বৃন্দাবনের বাইরে গিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে না, জীবনের শেষ ক'টা দিন এখানেই কেটে যাবে ! কিন্তু জীবনটাকে যত ছোট ভেবে বসেছিলাম তত ছোট তো নয় ? এখন যে আবার দেখছি অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়ে পড়ছে ?

*'চিরকালের প্রেমের দেশে' শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

আমার সঙ্গী এমন বুদ্ধির জন্যে যা হোক তিরস্কার করলে না। শুধু বললে—তা কি হয়? জীবনে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। কখন্ কি যে লাগবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে?

বলেছিলাম—কি করব বলো, আমার মনের গডনটাই যে এই রকম? দেশে থাকাতেও এমন হত: বছরে দু'চারবার কলকাতা যাতায়াত করতে হত, অথচ, যতবারই কোলাঘাট হাওড়া ষ্টেশন দিয়ে গিয়েছি এসেছি ততবারই মনে হয়েছে—আমি কি বার বার এমনভাবে যাব আসব নাকি? এইবারই আমার শেষ যাত্রা। কাজেই কি হবে ভবিষ্যতের জন্যে পথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে? কি হবে জেনে কোন্ পথে টিকিট ঘরে যেতে হয়, কোন্ কাউণ্টারে হাওড়ার টিকিট পাওয়া যায়, কোন্ প্ল্যাটফর্মে ক'টার সময় ট্রেন আসে? জানি, একবার ভালভাবে সবকিছু দেখে নিলেই আমি সব করতে পারব; তবু ইচ্ছে করেই কখনো ওসব দেখে-শিখে রাখিনি। যাদের সঙ্গে পথে বেরুতাম তারাই সেসব করে দিত।

বৃন্দাবনের সঙ্গী হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—আচ্ছা মন তো তোমার? এটুকু শিখে রাখতেও এত আলস্য?

আমি বলেছিলাম—না, আলস্য তো নয়? ঐ যে তোমাকে বললাম ইচ্ছে করেই শিখিনি। কেন শিখিনি জান? তখন থেকেই জানতাম, বেশিদিন আমাকে দেশে থাকতে হবে না, আর পডাশুনা করবার জন্যে এভাবে কলকাতা যাতায়াতও করতে হবে না। শীগ্‌গীর আমি পণ্ডিচেরী চলে যাব! সেই পণ্ডিচেরী-যাওয়া আমার এতদিনে ঘটছে। কিন্তু কেমন করে যাব? কোন্ পথে কোন্ ট্রেনে যেতে হয়, কিছুই যে জানিনে? তুমি তো গয়া কাশী দক্ষিণভারত বেড়াতে যাও, আমাকে পথের একটা মোটামুটি নির্দেশ দিতে পার?

সঙ্গী হাসতে-হাসতে বলেছিল—এই কথা! আরে কি হবে ট্রেনের নাম ধাম জেনে? তুমি তো আর টিকিট কিনে যাবানা? দক্ষিণমুখো যে ট্রেন পাবা তাতেই উঠে পড়বা, যেখানে নামায়ে দেবা সেইখানেই নামা পড়বা। অত ভাব-বার কি আছে? এই মথুরা ষ্টেশনে গিয়া সব খোঁজ-খবর নাও গা।

মনে-মনে বললাম, তাই বটে! এত ভাববার কি আছে? এই তো এমন সহজ উপায় পড়ে আছে, আর আমি কিনা আকাশ-পাতাল ভেবে সারা হচ্ছিলাম? এক নিঃশ্বাসে আমাকে পণ্ডিচেরী যেতে হবে কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছে? তিন দিনের পথকে তিন সপ্তাহে গেলেও তো আমার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নাই?

পূর্ণিমার আগের দিন বৃন্দাবন থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে মথুরার বলরামদেবের ঘাটের কাছে এসে দেখি এক জায়গায় একটা প'ড়ো বাড়ীর বারান্দার ওপর কয়েকজন সাধু শুয়ে বসে বিশ্রাম করছেন। তাদের কাছে উপস্থিত হতেই যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সাগ্রহে আমাকে আহ্বান করলেন।

সোজা রেল ষ্টেশনে চলে যাবার মত সাহস পেলাম না। তাই তাঁদের কাছেই বসে পড়লাম। ইচ্ছেটা সাধুদের কাছ থেকে ষ্টেশনের কিছু খবর সংগ্রহ করা।

সকলেই তাঁরা বাঙলা-ভাষী। তাঁদের কাছে মধ্যাহ্ন ভোজন মিলল, ষ্টেশনের সংবাদও পাওয়া গেল। তাঁদের একজন বললেন—রাত্রে মাদ্রাজের একটা ট্রেন আছে, কিন্তু সময়টা তো বলতে পারব না ?

আমার কাছে তখন এটুকু সংবাদই যথেষ্ট। বাকীটা ষ্টেশনে জেনে নিলেই চলবে। অপরাহ্ণের সময় সাধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম।

কিন্তু ষ্টেশনে ঢোকার আগে থেকেই বুকের ভেতরটা একটা অজানিত ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। দূর থেকেই দেখতে পেলাম পাহারাওয়ালা পুলিশে সারা ষ্টেশনটা গিজ গিজ করছে। সর্বনাশ! ট্রেনে ওঠা তো দূরের কথা, ওই পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে মাদ্রাজের গাড়ীর সময়টা জানব কিভাবে ?

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখি অদূরে ষ্টেশনের ঘেরাটোপের বাইরে একটা সিমেণ্টের বেঞ্চে বসে দু'জন নবীন সন্ন্যাসী কথা বলছেন। কানে এল তাদের বাংলা কথাবার্তা। ধড়ে যেন আমার প্রাণ এল! যাক বাঁচা গেল! একে তো দূর বিদেশে স্বদেশের মানুষ, তায় আবার অল্প বয়েস নবীন সন্ন্যাসী—দয়া-মায়ার শরীর। নিজেকে নিজে বললাম, পুলিশের ভয়ে তাহলে আমাকে ফিরে যেতে হবে না! ওঁরা যখন সন্ন্যাসী, তখন ওঁরাও নিশ্চয় বিনা টিকিটের যাত্রী ? ওঁদের সঙ্গে যাব। পুলিশ-চেকার যদি ওঁদের ছেড়ে দেয়, তাহলে আমাকেও দলের লোক মনে করে ছেড়ে দেবে। এভাবে মথুরা ষ্টেশনটা তো আগে পার হই, পরে তখন দেখা যাবে ?

এখন জেনে নেওয়া দরকার সন্ন্যাসীদ্বয় কোন্‌দিকে যাবেন ? কেননা তাঁরা পশ্চিমের দিকে গেলে আমি তাঁদের সঙ্গী হতে পারব না, তাঁদের আলাদা প্ল্যাটফর্ম আলাদা ট্রেন হবে ?

এতসব কথা এক নিমেষে ভেবে নিয়ে যেই সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়েছি, অমনি দেখি তাঁরাও আমার ওপর কৃপা-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আমি সাহস পেয়ে

তাঁদের সম্মুখে গিয়ে শ্রদ্ধাবনত দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করলাম—আপনারা কোথায় যাবেন কৃপা করে যদি একটু জানান…

সন্ন্যাসীদ্বয় আমার সে-কথার উত্তর না দিয়ে দু'মুখ থেকে একসঙ্গে প্রতিপ্রশ্ন করে বসলেন—আপনি কোথায় যাবেন ?

শ্রদ্ধাসহকারে জানালাম—আজ্ঞে, পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাব।

তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে আসছেন ?

বললাম—এই বৃন্দাবন থেকে আসছি।

ভাবলাম তাঁদের প্রশ্ন বুঝি শেষ হল, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর পাব। ও হরি ! তারপরে আর একটা আধটা প্রশ্ন নয়, দু'মুখ থেকে একেবারে অসংখ্য প্রশ্নবাণ এসে পড়ল আমার ওপর ! তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কোন্ সম্প্রদায় ? কোন্ বর্ণ ? কোন্ জাতি ? কোন্ তীর্থ ? কোন্ আশ্রম ? ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন ! এসব যে সামাজিক জাতি-বিভাগের প্রশ্ন নয়, সাধু সন্ন্যাসীদের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বিভাগের প্রশ্ন—সেসব তত্ত্ব আমি বৃন্দাবনে থাকতে থাকতে সংগ্রহ করেছিলাম। গুরুর সঙ্গে শিষ্যেরও যে জাতি বদল হয়, তাঁরা আমার কাছে সেই পরিচয় জানতে চান ?

এইখানে একটা কথা পাঠকদের জানানো দরকার। তা না হলে সন্ন্যাসীদ্বয়ের ওরকম প্রশ্ন করার তাৎপর্য বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাওয়ার সঙ্গে আমার জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের কি সম্পর্ক ? পণ্ডিচেরী আশ্রমে তো যে কেউ যেতে পারে, নয় কি ? তবে কেন তাঁরা আশ্রমে যাব বলতেই আমার কাছে এসব খোঁজ করছিলেন ?

কারণ আছে :

প্রথমেই একটা কথা আপনাদের বলতে ভুল হয়ে গেছে যে, বৃন্দাবন থেকে আসবার সময় এবার আমার বেশ-বাসটাও অমনি একটু পরিবর্তন করে নিয়েছিলাম। কাপড় গেঞ্জি আর চাদরটা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ডোর কৌপীন পরিধান করে পথে নেমেছিলাম।

তবে নিছক খেয়ালের বশে কিংবা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজবার ইচ্ছায় এই বেশ নিইনি ? নিয়েছিলাম কাউকে ঠকাব না বলে। একে তো বিনা টিকিটে রেল-কোম্পানীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাচ্ছি ? তার ওপর ভদ্রবেশে গেলে যে আরো ঠকানো হবে ? লোকে ভাববে, আমি টিকিট কিনে যাচ্ছি ? পরন্তু এই বেশ থাকলে আমাকে অপরাধী হতে হবে না। সবাই বুঝবে আমি বিনা টিকিটে

যাচ্ছি। আপনারা হয়ত মনে মনে বলছেন—আচ্ছা তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার কি একটু লজ্জাও করল না ঐভাবে হঠাৎ ডোর কৌপীন প'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা করছিল বৈকি ? দারুণ লজ্জা করছিল ! ডোর কৌপীন আবার একটা আবরণ নাকি ? মনে হচ্ছিল, আমি সম্পূর্ণ ন্যাকেড্ ! তবু লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে পথে তো বেরুলাম, কিন্তু সামনে যেই লোকজন আসছে দেখি অমনি পথের পাশে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই, তারপর তারা পার হয়ে গেলে আবার পথ চলি। প্রথম বেরুবার মুখে গোবিন্দ মন্দিরের সামনের রাস্তায় আমার এক বৈষ্ণব সঙ্গীকে দেখেও অমনি ভাবে সরে পালাচ্ছিলাম। সে দেখতে পেয়ে বললে—আরে, এতে লজ্জার কি আছে ? গুরুদেবের আশ্রমে যাবে, এই সর্বরিক্ত বেশই তো যথার্থ বেশ ? কিন্তু আমার গুরুর আশ্রম যে গহন বন-জঙ্গলের মধ্যে লতা-পাতার কুটীর নয়, সভ্য জগতের একেবারে মাঝখানটিতে অট্টালিকা-ইমারতের আশ্রম এবং সেই আশ্রমে যে শত-সহস্র শিক্ষিত সুসভ্য সাধক-সাধিকা থাকেন—তা কি সেই সঙ্গী জানত ? তাছাড়া আমি নিজেই কি তখন জানতাম শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কেমন ? তাহলে এ দুঃসাহস করতে আমিই কি পারতাম ? তখন শুধু আমার একমাত্র ভাবনা কোনরকমে একবার আশ্রমে পৌছনো। তারপর সেখানে পৌছুতে পারলেই শ্রীমা যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দেবেন, আমার সব লজ্জা কষ্ট তখন ঢেকে যাবে !

কিন্তু থাক এসব কথা, যে-কথা বলছিলাম সেটা বলি : মথুরা ষ্টেশনের সেই সন্ন্যাসীদ্বয় আমার নেংটী-পরা বেশ দেখে আমাকে সন্ন্যাসী মনে করেই ঐ প্রশ্ন করেছিলেন আর কি ? কিন্তু আমি কোথায় পাব ওসব বস্তু ? গুরু তো বাইরের কিছুই দিয়ে যান নি ? অন্তরে শুধু আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন······এমনি ধরনের আরো কি কি বলতে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু তা আর বলতে হল না। আমার কথার মাঝখানেই সন্ন্যাসী দু'জন ছোট ছেলের মতন দু'হাতে তালি দিয়ে অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন—ওহো, বুঝেছি, বুঝেছি ! ডব্লু, টি, ডব্লু, টি, ! অর্থাৎ তারা বললেন—আমরা বুঝে ফেলেছি তুমি উইদাউট টিকিটে যাচ্ছ ! রেলকোম্পানীকে ফাঁকি দেবার জন্যে তোমার এরকম নেংটীপরা বেশ ! আর আমরা এতক্ষণ কিনা তোমাকে মস্ত বড় একজন সন্ন্যাসী ভেবে বসেছিলাম ? বাস্তবিক এমন একটা মজার ব্যাপার আবিষ্কার করতে পেরে সন্ন্যাসীদ্বয় আনন্দে উত্তেজনায় একেবারে ছোট ছেলের মত হাতে তালিই দিয়ে ফেললেন !

তা না-হয় তাঁরা দিলেন। কিন্তু এদিকে আমার অবস্থা তখন? ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা, কি ঘেন্নার কথা!

তবে লজ্জা-ঘেন্নার চেয়েও ভয়টাই আমার কাছে বেশি হয়ে উঠল। দেবীর নিকট বলি দেবার পূর্বে হৈ রৈ শব্দে একবার বাজনা বাদ্য বেজে উঠে বলির ছাগকে যেমন অর্ধমৃত করে ফেলে, তেমনি সন্ন্যাসীদের হাতের তালি আর সেইসঙ্গে মুখের ডব্লু, টি, ধ্বনির কী এক নিদারুণ ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা ধড় ফড় করে উঠে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। চারিদিক শূন্য দেখতে লাগলাম। হায় হায়! তবে কি পণ্ডিচেরী যাওয়া হবে না? সেদিন সত্যসত্যই যাওয়া হল না। পথের ভয় যেন আমাকে গিলে খেতে এল! অনেক লজ্জা অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে আবার আমি বলরামদেবের ঘাটে ফিরে এলাম।

পরের দিন পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় এদিন আনন্দের বন্যা নামে। মন্দিরে মন্দিরে, মথুরাবাসীদের প্রতি ঘরে ঘরে দেবতার উৎসব-আড়ম্বরের যেমন সমারোহ বৃদ্ধি হয়, তেমনি সাধু-সন্ন্যাসী ভিখিরীদেরও ভোজনের নানা সুযোগ উপস্থিত হয়। একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, একজন মথুরাবাসী আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি বাড়ির মস্ত উঠোনে সাধু-সন্ন্যাসীরা ভোজনে বসেছেন। আমাকেও তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে নানাবকম সুখাদ্য ভোজন দিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সকলের দৃষ্টিই একবার ক'রে এই ডব্লু,টি-র ওপর এসে পডতে লাগল! কিন্তু কেউ যা হোক কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

সেদিন দেবতা বোধ হয় আমার ওপর অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। তাই চারি-দিকেই শুভযোগ দেখতে লাগলাম। অপরাহ্নের সময় ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরুলাম, দেহে মনেও কী যেন এক বিশেষ শক্তি অনুভব হতে লাগল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল রাস্তার এক হাত ওপর দিয়ে দিয়ে চলেছি। পা দুটো কিছুতেই যেন মাটিতে ঠেকতে চাইছিল না! সত্যিসত্যি আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমি সচেতন হয়ে একবার সেই সময় বুঝতেও চেয়েছিলাম—সত্যিই কি আমার পা দু'টো মাটিতে ঠেকছে না? যদিও লোকে এসব আজিগুবি কথা আজ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি তখন বাস্তবিকই দেখলাম, আমার দেহের অস্তিত্বই নাই! আমি যেন মাটির এক হাত ওপরে উড়ে উড়ে চলেছি।

কোন্ রাস্তা দিয়ে কিভাবে জানি না, একবারে যখন ষ্টেশনের কাছে এসে পড়েছি এবং একদল পুলিশ যখন আমাকে এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে ছেঁকে ধরেছে যে আমার পা বাড়াবার আর একটুও উপায় নাই, তখন সহসা ধ্যান ভেঙ্গে গেল।

সেই পুলিশের দল তখন আমাকে হিন্দীতে কি সব যেন জিজ্ঞেস করছিল। কিন্তু আমার চোখ-কান তখনো নিজের বশে আসেনি। তাই প্রথমটা তো তাদের কথা কানেই এল না। তারপর কানে যদি-বা এল, তাদের মুখের খাস হিন্দী বুলি এক বর্ণও বুঝতে না পেরে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম—আরে! এরাও কি তবে আমাকে ডব্লু, টি, ব'লে চিনে ফেলেছে নাকি? অ্যাঁ, কি বলছে? জেলে দেবে আমাকে?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত এই ভয়টা এসেই আমার ধ্যানের নেশা ছুটে গেল! ভাল করে মনোযোগ দিয়ে শুনি তাদের কথা—না তো? ডব্লু, টি, আর জেলের কথা তো একবারও তারা বলছে না?

বস্তুতঃই তারা কি একটা কথা বার বার বলছে আর হাত জোড় করে একেবারে মশাই মশাই সুরু করে দিয়েছে—'আপ যো কোই একঠো নাম্বার বাতা দীজিয়ে জী?—শুধু এই করছে! আমি যত বলি, কুছ মালুম নেহি, তত তারা এসব সাধু মহারাজের শুদ্ধা বিনয় ভেবে আরো বেশি বেশি 'হাঁ-জী' 'হাঁ-জী' করে!

তাদের একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল গতকালের ঘটনাটা: তাই তো! কাল যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরা শহরে ঢুকছিলাম তখনও ঠিক এমনিভাবে পথের দু'পাশে অনেক লোক এই রকম কথাই বলেছিল তো? আমি তখন শুধু কপালে হাত ঠেকিয়ে তাদের প্রণাম জানিয়ে বলেছিলাম —বাপু হে, তোমাদের কথা আমি একবর্ণও বুঝতে পারিনি। তোমরা আমায় মাপ কর!

গতকাল তাদের ঐভাবে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, তখন আমি পথ চলছিলাম, আর তারা দূর থেকে ঐ সব কথা বলছিল। পরন্তু এখন যে আমাকে পুলিশের এই গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়েই গাড়ীতে উঠতে হবে? সুতরাং আজকের উপায় কি হবে?

পাঠকদের হয়ত জানতে ইচ্ছে করছে, কি এমন মহার্ঘ বস্তু যা মথুরার প্রায় অর্ধেক লোক জানবার জন্যে সেদিন পাগল হয়ে উঠেছিল? সমস্ত বিবরণটা আমি আপনাদের বলতে পারবো না। তবে তাদের কথায় আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম সেইটুকুই বলি: মনে হয় সেই সময় মথুরা সহরে কোন রেস্ বা ঘোড় দৌড়ের বাজি চলছিল যার নম্বরটা জানবার জন্যে সবাই প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। তাই তারা বার বার বলছিল, কই ভি একঠো নাম্বার বাতা দীজিয়ে মহারাজ!

কিন্তু মহারাজের সেই এক উত্তর—কুছ মালুম নেহি!

শেষে বেগতিক দেখে তারা খাতির করা সুরু করে দিলে, বললে—জী, আপ কঁহা যায়েঙ্গে ?

বললাম—পণ্ডিচেরী ।

পণ্ডিচেরী বুঝতে পারল না দেখে আবার বললাম—মাদ্রাজ যাউঙ্গা ।

আমার মুখের হিন্দী কথা শুনে তারা বললে—জী, আপ বঙ্গালী আছে। ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি, লেকিন মাদ্রাজ কা গাড়ী তো বহোত্ লেট হোবে ? রাত ন'বাজে আয়েগী। আপ হামলোককা ডেরামে ততক্ষণ বিশ্রাম লিয়ে লিন। আপ রহনেসে আপকা কৃপামে হামারা আশা পুরি হো যাই তে যায়গী !

'হাঁ-না' আমার উত্তর দেবার আগেই একটা অমনি খাটিয়া এসে গেল।

কোয়ার্টারের সামনে সেটা পেতে দিয়ে একজন আমাকে ধরে বসিয়ে দিলে। চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভীড় জমে উঠেছিল, তাদের সরিয়ে দিয়ে আমার বিশ্রামকে আবার নির্বিঘ্ন করে দিলে।

আমার তখন যা অবস্থা, শুধু পুলিশ কেন, বাঘ-সিংহের ডেরাতেও প্রবেশ করতে পারতাম ! একটু নিরিবিলি পেতেই সেই খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়লাম। আর শোওয়া মাত্রই কি ঘুমিয়ে পড়লাম ? এতকালও যে-পুলিশদের যমের মত ভয় করেছি, আজ তাদের খপ্পরের মধ্যে পড়েও কি আমার কোন বোধ নাই ? আমি যে পণ্ডিচেরী যাবার জন্যে ষ্টেশনে এসেছি, ঠিক সময়ে গাড়িতে উঠতে হবে এবং সেজন্যে যে চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে, সে-বোধও কি আমার তখন ছিল না ?

বাস্তবিকই সে-বোধ আমার ছিল না। তা নইলে অমন নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়লাম কি করে ?

পুলিশেরা যাহোক দায়িত্ব পালন করলে। তারাই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে নিজেদের ভাগের রুটি ও ডাল-ঝিঙে-আলুর তরকারি খাইয়ে ন'টার আগে ট্রেনে তুলে দিলে। শুধু তাই নয়, সীট ঝেড়ে পরিষ্কার করে যাত্রীদের সঙ্গে এক আসনে আমাকে বসিয়ে দিয়ে গেল।

পুলিশের সেই যত্ন-আপ্যায়ন দেখে কামরার যাত্রীরা পর্যন্ত এতটুকু টুঁ শব্দ করল না আমার সেই বেশ দেখে। অবশ্য যাত্রীদের সঙ্গে বসা আমার ভাল লাগল না। পুলিশেরা চলে যেতেই আমি দরজার কাছে গাড়ীর মেঝেতে নেমে বসেছিলাম।

সেই থেকেই বিনা টিকিটে গাড়িতে আসছিলাম। রেলকর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে কোনরকম ছল-চাতুরী অবলম্বন করে আসিনি। বরং যাতে তাঁরা দেখতে পান এবং দেখতে পেলেই বিনা টিকিটের যাত্রীকে চিনতে পারেন, তারই জন্যে দরজার কাছটিতে মেঝেতে বসেছিলাম।

অবশ্য এভাবে যাওয়ার অসুবিধেটাই ষোল আনা! রাত-বিরেতে যেখানে যখন পুলিশ-চেকারের নজর পড়ে সেইখানেই নামিয়ে দেয়, তা সে-জায়গাটা ষ্টেশনই হোক বন-জঙ্গলই হোক আর নদী-শ্মশানই হোক। শুধু তাই নয়, দু'ঘণ্টার পথ এভাবে যেতে লাগে আমার দশ ঘণ্টা এবং যেখানে যে-ট্রেনে চড়ে যাবার দরকার সেখানে আমি গিয়ে পৌছয় অন্য পথে অন্য কোন ট্রেনে বা হেঁটে।

এমনিভাবে মথুরা থেকে চার-পাঁচটা মাত্র ষ্টেশন আসতেই সেদিনটা কেটে গেল। একটা ষ্টেশনে আটকে পড়েছিলাম, পরের দিন সন্ধ্যার পর আবার একটা ট্রেন পেয়ে তাতে উঠে পড়েছিলাম।

তারপর ট্রেনে চড়ে আসতে আসতেই ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনাটা:

রাত তখন কত হবে জানি না। ট্রেনটা একইভাবে ছুটে চলেছে বসন্ত রজনীর জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠের পর মাঠ গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঝে মাঝে পাহাড় কেটে তৈরী আলোক বিহীন দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে, কখনো-বা শক্ত-কঠিন রেলওয়ে ব্রীজের ওপর দিয়ে বিকট শব্দ করতে-করতে। যখন এক একবার সচেতন হয়ে পড়ি তখন অন্ধের মত আর একটা ইন্দ্রিয় দিয়ে পথের ঐ সব দৃশ্যের অনুভব হয়।

কিন্তু এক সময় মনে হল ট্রেনের গতিটা কমতে কমতে একেবারেই থেমে গেল। যাত্রী ওঠা-নামার হৈ-হুল্লোড় ব্যস্ততা কিছুই কানে এল না। অথচ চোখ খুলে ষ্টেশন কিনা একবার দেখবারও আমার সামর্থ্য ছিল না, আমি তেমনিভাবেই ট্রেনের মেঝেয় পড়ে রইলাম।

কিন্তু ট্রেনটা বোধহয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সামনের দরজাটাও খোলা ছিল। তাই ষ্টেশনের পুলিশের দৃষ্টি পড়ে গেল আমার ওপর। পুলিশ এসে একটা লাঠির খোঁচা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলে—হেই, উঠ্ যাও হিঁয়াসে! উতার যাও!

রুক্ষ কঠিন আদেশ শুনতে পাচ্ছি। তথাপি চোখ মেলে তাকাতেও পারছিনা, আর উঠে দাঁড়াতেও পারছি না। মনে হচ্ছে, কে যেন আমার সমস্ত শরীরটা একরকম তীব্র আঠা দিয়ে গাড়ির মেঝের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে—আমি তাই শত

চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। মধুর হাঁড়িতে মাছি পড়লে তার যেমন নড়বার উপায় থাকে না, আমারও তখন সেই অবস্থা !

পরন্তু যে ডাকছিল তার যে আর অপেক্ষা সয়না ? এবার শুধু মুখের আদেশ আর লাঠির খোঁচাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হাত ধরে হিড হিড় করে টানতে টানতে পুলিশ আমাকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিলে।

অগত্যা আমি সেখান থেকে মাতালের মত টলতে টলতে অন্যত্র আবার একটুখানি আশ্রয়ের সন্ধানে চললাম।

ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা যেতেই অন্য একজন পুলিশ তার কাঁধের পিস্তলের উপর হাত ঠুকে আওয়াজ করে কাকে যেন ডাকতে লাগল শুনতে পেলাম। অন্য কাউকে ডাকছে ভেবে আমি আরও খানিকটা চলে এলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হল আমাকেই নিশ্চয় ডাকছে। পেছন ফিরে দেখি, সত্যিই তা-ই। আমি সেই পুলিশের দিকে তাকাতেই সে দূরের কাউকে হাত দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বললে—তোমরা সাথ লে যাও ইন্‌কো।

পুলিশের সঙ্কেতের অনুসরণ করে দৃষ্টি দিতেই নজরে পডল : কিছুদূরে একজন সাদা ব্যাগের মত একটা কিছু হাতে নিয়ে ঠিক যেন আমাকে লক্ষ করে এবং আমারই দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীবে এগিয়ে আসছেন।

আমি পুলিশের কথাটা শুনলাম বটে, কিন্তু উত্তরও দিলাম না, আর আগন্তুক কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষাও করলাম না। কারণ আমার সঙ্গী তো কেউ নাই ? কার জন্যে তবে দাঁড়াব ? তাছাডা দাঁডিয়ে অপেক্ষা করবার মত শক্তিও ছিল না আমার।

পুলিশ কিন্তু মনে করলে আগন্তুক আমারই সঙ্গী। পাছে তিনি আমাকে খুঁজে না পেয়ে রাত্রিতে অন্য কোথাও হারিয়ে যান সেজন্যই তার এই অনুকম্পা।

অবশ্য পুলিশের আগন্তুককে আমার সঙ্গী মনে করার কারণ ছিল : আমি ট্রেন থেকে নেমে আন্‌মনে খানিকটা সোজা হাঁটছিলাম। কোন্‌দিকে যাব. কোথা গেলে একটু নিরিবিলি আশ্রয় পাব তা যেন সহসা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় ওভার ব্রীজটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেদিকটায় নজর পড়ে যেতেই আমি বামদিকে ঘুরে সমকোণ তৈরী করে প্ল্যাটফর্মের সেই দিকে যাচ্ছিলাম। আগন্তুক পথ সংক্ষেপ করে আমাকে ধরবার জন্যে ট্রেন থেকে নেমেই একেবারে কোণাকুণি হেঁটে আমার দিকে মুখ তুলে আসছিলেন। তা-ই দেখে পুলিশ বুঝে নিয়েছিল আগন্তুক আমারই সঙ্গী, আমার সঙ্গেই যাবেন !

সেই গাড়ি থেকে আমরা দু'জনই কেবল নামলাম। আবার কি, আমি যে-কামরা থেকে নামলাম আগন্তুকও সেই একই কামরা থেকে নামলেন মনে হল। আগন্তুককে আমার সঙ্গী মনে করা পুলিশের এ-ও একটা কারণ। কিন্তু আমি আগন্তুককে ট্রেনের মধ্যে কিংবা বাইরে কোথাও ইতিপূর্বে দেখিনি।

আরো দেখিনি তাঁর মত মানুষকে। আগন্তুক পুরুষ না নারী তা যেন ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারলাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারলাম যে, আগন্তুকের অনেক বয়স হয়েছে; খুব শীর্ণ দেহ, হাতের সেই ব্যাগটি বইতেও যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তাঁর শরীরের উর্ধ্বাংশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, আর তিনিও আমারই মত টল্‌তে টল্‌তে পা ফেলছেন।

আগন্তুকের যতটুকু বর্ণনা দিলাম তা কিন্তু আমার সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় পেছন ফিরে দূর থেকে এক পলক দৃষ্টির দর্শন মাত্র। তার বেশি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা আমার অবশ্য সঙ্গতিও ছিল না মনও ছিল না। বাইরের কোন কিছুর প্রতি তখন আমার মনোযোগ নাই। আমি তেমনিভাবেই এগিয়ে চলতে লাগলাম।

ওভার ব্রীজটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেইখানটায় গরুর গাড়ির ছাদনীর অনুরূপ একটা ঘরের মত হয়েছিল। ঘরের দুটো দিক খোলা, আর দুটো দিক এবং ওপরের দিকটা বন্ধ। রাতের আশ্রয়ের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। সেইখানেই ঢুকে পড়লাম।

সেই ঘরের উপযুক্ত আবার শয্যাও জুটল। প্ল্যাটফর্মের অন্য জায়গাগুলো তবু একটু সান বাঁধানো ছিল, কিন্তু এ দিকটায় শুধু লাল করকচের সুরকী ঢালা। যে-অঙ্গটা তার ওপর রাখি সেই অঙ্গটাতেই সুরকীগুলো ঢুকে রয়ে যায়। সেই ফাগুন-চৈতি মাসেও ঠাণ্ডা বাতাস যেন টি-টি করে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই সেই সুরকীর শয্যা শরীরকে যতটুকু আচ্ছাদন করে রাখে, ততটুকুতেই দেহ-চেতনার সবখানি রেখে ঠাণ্ডা বাতাস এবং সুরকীর কণ্টক শয্যাকে একেবারে ভুলে গেলাম।

তা না-হয় ভুললাম। কিন্তু এমন কি কখনো হয়—ঐ টি-টি বাতাসের মধ্যে, এবং খালি গায়ে ঐ সুরকীর শয্যায় যেই এসে একটিবার শুয়েছি, অমনি গভীর ঘুমে এমন ঘুমিয়ে পড়লাম যে, জগৎ-সংসার তারপর রইল কি গেল কিছুই আমি জানতে পারলাম না!

অথচ সত্যিসত্যিই সেদিন ঐরকম ঘটেছিল! যে-আগন্তুক আমার থেকে মাত্র আট-দশ মিটার পেছনে আসছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত আমার কাছে সেই ঘরের

মধ্যে এলেন কিনা—সেটুকু দেখে যাবারও আমার সবুর সইলো না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এসব অতি সত্য কথা, একটুও আমি বাড়িয়ে বলছি না!

বোঝবার সুবিধের জন্যে একে ঘুম বলাই হয়ত ভাল। তবে সে এক অদ্ভুত ঘুম। ওঃ! সেই ঘুমের কী দুর্বার শক্তি! এ-পৃথিবীর সব কিছু থেকে সংযোগ ছিন্ন করে মুহূর্তের মধ্যে আমাকে গভীরে নিয়ে চলে যায়! মহাশূন্যের মাঝখানে যেমন অসংখ্য গ্রহ-তারকা পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে স্থান চ্যুত হতে পারে না, তেমনি মানুষও অসংখ্য কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার, আকর্ষণ-বিকর্ষণে একই কেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে; না হলে কে কবে যে কোন্ দিকে ছিট্‌কে পড়ত তার ঠিক থাকত না। কিন্তু সেদিন কে যেন আমার ঐ সমস্ত বন্ধন-সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল। আমি প্রলয়ের মুখে সমুদ্রের মাঝে হাল-পাল হীন ক্ষুদ্র নৌকার মত বিপুল এক শক্তির টানে ছুটে চলেছিলাম! যে জড়দেহ-চেতনা মানুষকে অহর্নিশ মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখে, সেই দেহচেতনার কোন বোধই আমার তখন ছিল না। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই—দেহের সুখ-দুঃখের কোন রকম বোধই নাই! যে-চিন্তা মনের সব সময়ের সঙ্গী, যে চিন্তাস্রোতকে রোধ করতে অন্য সময় চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে হয়েছে, সেদিন সেই চিন্তা পর্যন্ত মনের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতে পায় না! ষ্টেশনের মত হট্টগোলের জায়গায় রয়েছি—চারিদিকে ইঞ্জিনের বিকট শব্দ, রেলের সিটি, যাত্রী ও হকারদের কলকাকলি—কিছুই যেন কানে প্রবেশ করছিল না। সমস্ত পৃথিবীটাই কোন্ যাদুবলে আমার কাছে তখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে!

রয়েছে তখন শুধু একটিমাত্র প্রবেগ: অন্তরের গভীরে ডুবে গিয়ে একাকার হয়ে যাওয়া! শুধু তারই জন্যে সত্তার প্রতিটি কোষে কোষে সে কী তীব্র আর্তি! ধান কলের হালায় ধান ঢেলে দিলে ধানগুলোর মধ্যে যেমন এক দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়, এক তীব্র আকুলি বিকুলি সুরু হয়ে যায়—কে আগে গভীরে গিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? ঠিক তেমনি আমার সত্তার প্রতিটি কোষে উপকোষেও দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গিয়েছে কে তাদের মধ্যে আগে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

সামান্য ঘুমের মধ্যেই যদি কেউ এসে আচমকা ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয় তখন যে কিরকম কষ্ট হয় তা তো সবারই জানা আছে। তখন সে-যন্ত্রণাকে মনে হয় না কি মৃত্যুরও বাড়া? কিন্তু আমাকে যদি কেউ সেই অবস্থা থেকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিত তাহলে নিশ্চয় বলছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেল করে মরতাম!

কিন্তু কেউ আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলে না, চিৎকার করে কেউ ডেকেও তুললে না ; শুধু একসময় হঠাৎ কি করে জানি না অনুভব করলাম—কে একজন যেন আমার গায়ে জামা পরিয়ে দিচ্ছে। আমাকে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে, কণ্টক কঠিন সুরকীর ওপর শুয়ে কষ্ট হচ্ছে, তাই সস্নেহে জামা পরিয়ে দিচ্ছে! আহা! কতো যে যত্নে, কতো যে সাবধান সতর্কতার সঙ্গে সেই জামা-পরানোর কাজটি করা হচ্ছিল, তা আমি সেই গভীর তন্ময় অবস্থাতেও কিন্তু একটুখানি তার অনুভব করে ফেললাম!

সেই সবেমাত্র জামা-পরানোটা বোধ হয় শুরু করা হয়েছে—আমার একটা হাত মাটি থেকে তুলে জামার হাতার মধ্যে ঢোকাতে যাবে, আর অমনি আমি জেগে পড়েছি আর কি! এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম তো ছিলাম. কিছুই জানতে পারিনি ; কিন্তু এখন যেই জেগে পড়েছি সেই একেবারে পূর্ণ সচেতন—আগের পরের সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্তে অমনি স্মরণ হয়ে গেল!

আর সেই কারণেই কি যেন একটা বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেল আমার—এম্নি ভাব নিয়ে চীৎকার করে উঠেছি। অবশ্য গলায় তখন কত জোর ছিল তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে আমি নিজে জানি, খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলাম—আহা! করো কি, করো কি? আমি যে সন্ন্যাসী?

আর বেশি কথা নয়, শুধু এই ক'টি কথাই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঐ ক'টি কথার মাধ্যমেই আমি সেই ঘুমের মধ্যেও অনেক কথা অনেক ভাব প্রকাশ করে ফেললাম যেমন একজন আত্ম-সচেতন মানুষ করে থাকে। অর্থাৎ, যে আমাকে জামা পরাচ্ছিলো তাকে বলতে চাইলাম—আহা, দেখছো না—আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী? আর তুমি কিনা সেই সর্বত্যাগীকে আবার কাপড-জামা পরিয়ে তার সর্বত্যাগীত্ব ঘুচিয়ে দিতে চাইছো? কি বলবো, এখন এসব কথা বলতেও হাসি পায়! সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে দেখতে চাইলাম কে আমাকে জামা পরাচ্ছে? দেখতে পেলাম আমারই সামনে, একেবারে বুকের কাছটিতে বসে রয়েছেন সেই আগন্তুক যাঁকে আমি এই একটু আগে দূরে আসতে দেখেছিলাম।

প্ল্যাটফর্মের গ্যাস পোষ্টের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—আমার সেই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক তাঁর হাতের জামাটি টপ্ করে সরিয়ে নিলেন, হাত দু'টিও অমনি তাঁর কোলের মধ্যে চলে গেল এবং তিনি নিজেও শশব্যস্তে একপাশে সরে বসলেন।

আমার সেই সঙ্গীন অবস্থাতেও কে যেন স্মৃতির সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের

সংযোগ ঘটিয়ে দিলে। কেন না, সঙ্গে সঙ্গে বিচার এসে গেল—উনি আমার গায়ে দেবার মত জামা কোথায় পেলেন? আর অমনি আমার মনে পড়ে গেল—সেই যে আগন্তুকের হাতে একটা ব্যাগ দেখেছিলাম, সেটার ভেতর থেকেই তিনি নিশ্চয় ঐসব জামা বের করেছেন? সত্যিই দেখলাম তিনি খোলা ব্যাগটিও তৎক্ষণাৎ হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই আমার দেখা। হাতে তখন বেশি সময় ছিল না। কারণ আমার ঘুমের ট্রেন তখন হুইসেল দিয়ে চলতে স্বরু করে দিয়েছে, তাতে না উঠতে পারলেই আমি ফেল হয়ে যাব! কিন্তু তা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারব না, কিংবা আমি পারলেও অদৃশ্য শক্তি হতে দেবে না। তাই তৎক্ষণাৎ আমার চোখের পাতা ছুটোকে কে যেন জোর করে আঠা দিয়ে বন্ধ করে এতক্ষণ যেখানে ছিলাম সেইখানে হুস্ করে নিয়ে চলে গেল! আর কিছুই আমি দেখে যেতে পারলাম না।

তবে ঐটুকু সময়ের মধ্যে বাহ্য জগতের যে-সব অভিজ্ঞতা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলাম তা কিভাবে যে সম্ভব হয়েছিল, এখন তা-ই অবাক হয়ে ভাবি! তাছাড়া সেগুলি স্মৃতিতেও আবার কি করে অক্ষয় হয়ে রইল?

সে যা হোক, তারপর কতক্ষণ যে আগন্তুক ঐভাবে বসে রইলেন, কি করলেন এবং আমিই বা কতক্ষণ ঘুমোলাম—সে সব কিছুই আমার জানা নাই।

কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করলাম—কে যেন আমাকে জামা পরাচ্ছে?

'কে যেন'—বলছি এই কারণে যে, আবার আমি আগন্তুকের কথা সেই পরিবেশের কথা সব ভুলে গিয়েছি। আর ঐ 'কিছুক্ষণ পরে' যে বলছি, ওটাও আমার তখনকার অনুমান মাত্র। কেননা সেই সময়কার অনুভূতির সঠিক বর্ণনা দিতে হলে বলতে হয়—যেই ঘুমের মধ্যে চলে যাচ্ছি সেই আমার কাছে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। থাকছে শুধু আমার মন আর আমি। আসলে মনও ঠিক নয়, একটি সূক্ষ্ম চেতনময় সত্তা। সেই চেতন সত্তা থেকে যখনই এই বাস্তবের জগতে উঠে আসছি তখনই মনে হচ্ছে—এক ঘণ্টা-তু'ঘণ্টা বা একদিন-তু'দিন নয়, যুগ যুগ পৃথিবীর ওপর দিয়ে কেটে গেছে!

অবশ্য এ অনুভবটি নূতন নয়। অন্য সময় যখন এরকম ঘটত তখন আমি বাস্তব অবস্থায় ফিরে এসে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকতাম আর ভাবতাম—এই যে আমি এত যুগ পরে ফিরে এলাম, তবুও কি বাস্তবের পৃথিবী ঠিক আগের মতই

রয়েছে, না কিছু পরিবর্তন হয়েছে? অর্থাৎ এজগৎ থেকে আর এক জগতে আমার অবস্থিতিটা এত সত্য এবং গভীর হত যে, বাইরের পৃথিবীরও অনেক কিছু পরিবর্তন আমি আশা করে বসতাম।

স্পষ্ট মনে পড়ে তখনকার অনুভবের রূপটি: যেন সত্তার গভীরে কোথায় একটি সূক্ষ্ম চেতনার মধ্যে আমি বাস করছি। ঐ চেতনাটা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই। যেখানেই এই দেহ-মন-প্রাণকে রাখলাম, সেইখানেই তারা স্থির নির্বিকার হয়ে রয়ে গেল। ধারে পাশে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই যে এত বিপুল কর্ম কোলাহল, এই যে এত জীবন্ত অস্তিত্ব—সে-সম্বন্ধে কোন বোধই থাকত না। আর না-হয় সেই চেতনা সবকিছুকে এমন ব্যাপ্ত করে রইল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকত না। তার ফলে, দেহ-মন-প্রাণের কষ্ট-যন্ত্রণা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া কিংবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক সংবেদন পর্যন্ত সব বেমালুম ভুল হয়ে যেত!

এই রকম অবস্থা অনেকদিন থেকেই চলছিল। তাই শত কষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও বৃন্দাবন থেকে পা বাড়াতে পারছিলাম না। কিন্তু মথুরা ষ্টেশন থেকে এই অবস্থাটা খুব বেড়ে উঠেছিল, আর এই ভোপাল ষ্টেশনে এসে তা যেন আরো সঙ্গীন হয়ে উঠল!

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম—এবার জেগে উঠেই দেখি কি, আগন্তুক আমার মাথাটি কখন্ তাঁর কোলের ওপর তুলে নিয়েছেন, আমি তা জানতেও পারিনি। তারপর আমার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে জামাখানি মাথা দিয়ে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। আর সেই সময় জামাতে আমার নাকটা চাপা হয়ে যেতেই অমনি চম্‌কে জেগে উঠেছি!

আবারও তেমনিভাবে চোখ বন্ধ রেখেই তাঁকে বললাম—আহা! করো কি, করো কি? আমি যে সন্ন্যাসী।......

কোন রাগ-দ্বেষ নয়, কোন তিরস্কারও নয়, শুধু ঐ একই কথা বললাম। এবারেও তিনি আমার কথায় জামা পরানো বন্ধ রেখে তটস্থ হয়ে রইলেন। আমিও আবার পর মুহূর্তেই সেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম। এমন গভীর সে-অবস্থা যে, সত্তার কোন একটা অংশকে যে জাগিয়ে রাখব আগন্তুকের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে, তারও কোন উপায় থাকে না। সবটুকু অস্তিত্ব নিয়ে না ডুবলে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় না!

সারা রাত ধরে এই রকমেই চললো: আমি ঘুমিয়ে পড়লেই আগন্তুক আমাকে

জমা পরান, আর তিনি জামা পরানো সুরু করলেই আমি জেগে উঠি, তাঁর কাজে বাধা দিই। তারপর আবার ঘুমাই, আবার তিনি জামা পরান। এই-ই চলে।

পাঠকরা এই ঘটনাটিকে হয়ত পাগলের কাণ্ড-কারখানা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই তাঁরা এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। পাগল মানুষের কি এত ধৈর্য হয়? এত কি তারা ধীর স্থির বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, না এতখানি শান্ত যত্নশীল হয়?

পরন্তু আগন্তুকের ধৈর্যের তুলনা হয় না। আমি তো আরাম করে ঘুমিয়েছি, তিনি কিন্তু সারারাত আমাকে কোলে নিয়ে ঠায় জেগে বসেছিলেন। শুধু কি তা-ই? মুখে তাঁর একটি কথা পর্যন্ত নাই, এমন কি নিজের সুখ-সুবিধার সম্বন্ধেও একটা উচ্চবাচ্য নাই! শুধু ঐ নিঃশব্দে জামা পরানোটা ছাড়া তাঁর যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না! পাগল কি কখনো এমন শান্ত, সংযত হয়ে থাকতে পারে?

তিনি নিশ্চয় অসাধারণ অলৌকিক!

প্রকৃতপক্ষে আমাকে ঐ জামা পরানোটাও আগন্তুকের উদ্দেশ্য নয়। ওটা যদি তাঁর উদ্দেশ্যই হত তাহলে তিনি জোর-জবরদস্তি করেই হোক আর ভুলিয়ে-ভালিয়েই হোক জামা আমাকে পরাতেনই। আমার তখন কি ক্ষমতা ছিল তাঁর কাজে বাধা দেবার? আমি তো ঘুমে তখন অচেতন? অথচ প্রাতঃকালে জেগে উঠে দেখেছি আমার গা খালি, তিনি সারারাত চেষ্টা করেও আমাকে জামা পরাতে পারেন নি। সুতরাং ওটা তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল না।

তাঁর আসল উদ্দেশ্য হল আমাকে কৌশলে সারারাত জাগিয়ে রাখা, চেতন রাখা; এবং তা তিনি সক্ষমও হয়েছিলেন। আমাকে জাগিয়ে রাখবার জন্যেই তিনি আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। এসব যে ঘটবে তিনি যেন আগে থেকেই জানতেন। তাই জামা-কাপড়ের ব্যাগটি হাতে নিয়ে আগে থেকে তৈরী হয়েই এসেছিলেন!

কিন্তু আমি কেন আগন্তুকের কাজে বাধা দিয়ে বারবার ঐ কথা বলছিলাম সেটা একটু স্পষ্ট করে বলি: সত্যিই এটা আশ্চর্যের কথা, যে-মানুষের সব কিছু ভুল হয়ে যায়, সে কেমন করে ঘুমের মধ্যে একই কথা ব'লে বাধা দেয়? বাস্তবিক পক্ষে দেহ মন-প্রাণের বুদ্ধি দিয়ে আমি আগন্তুককে বাধা দিইওনি। বাধাটা এসেছিল আন্তর চেতনায় সত্য সংকল্প থেকে। সে সংকল্পটা হল: যদি সন্ন্যাসীই সেজেছি তাহলে সত্যকার সন্ন্যাসীর জীবনই যাপন করতে হবে—

পণ্ডীচেরী না পৌছানো পর্যন্ত সে-ব্রত আর কোনরূপেই ভঙ্গ করলে চলবে না, জামা-কাপড় পরাও আর চলবে না।

এই সংকল্পটা যেমন নিদ্রায় জাগরণে সবসময় ক্রিয়াশীল ছিল, তেমনি 'পণ্ডিচেরী যেতে হবে' এই সংকল্পটাও আমাকে মূর্তিমান গাইডের মত সকল বাধা-বিঘ্ন পার করে মথুরা থেকে ভোপাল পর্যন্ত এতটা পথ টেনে নিয়ে এসেছিল। তা নইলে মনে-প্রাণে তখন আর কোন সাধ-আশাই ছিল না। উদর পূরণের মত যে-সাধ অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় তার জন্যেও যেমন উৎকণ্ঠা ছিল না, তেমনি যে-পণ্ডিচেরী যাবার জন্যে এই পথে নামা, এত কষ্ট সহ্য করা, সেই স্বর্গে যাবারও আর সাধ ছিল না। কে বলতে পারে আগন্তুক না থাকলে এ জীবন হয়ত ভোপাল ষ্টেশনেই শেষ হয়ে যেত? হয়ত জড়-সমাধিই ঘটতো এই দেহটার? ঘুম বলে যাকে বার বার বর্ণনা করেছি তা যে একপ্রকার সমাধির অবস্থা, তা বোধহয় কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না? এর চরম অবস্থায় পৌছলে মানুষ আর সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না।

তারপর একসময় প্রভাত হল।

এতক্ষণ সব ভুলেছিলাম—রাত্রিবেলায় ট্রেন থেকে পুলিশের নামিয়ে দেওয়া, আগন্তুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া, তাঁর সারারাত ধরে জামা পরানো, কিছুই মনে ছিল না; এমন কি কেউ যদি তখন আমার নামটা জিজ্ঞেস করত তা-ও সহজে বলতে পারতাম কিনা সন্দেহ! কিন্তু শেষবারে আগন্তুকের জামা পরানোর চাপেই হবে বোধহয়, যেই চোখ মেলে প্রভাতের আলো দেখেছি, অমনি কবির অন্তরে বাক্‌দেবী যেমনভাবে অলক্ষে ভাব যুগিয়ে দেন ঠিক তেমনিভাবে আমার অন্তরে কে যেন পণ্ডিচেরী যাবার প্রেরণাটি কৌশলে ঢুকিয়ে দিলে! মনে মনে বললাম—তাই তো! আমাকে যে পণ্ডিচেরী যেতে হবে, আর সারা রাতটা আমি এখানে কাটিয়ে দিলাম? এতক্ষণ হয়ত কতদূর চলে যাওয়া যেত?

উঠে পড়লাম আবার পণ্ডিচেরীর ট্রেনের খোঁজ করতে।

কিন্তু উঠেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার উপায় ছিল না। একে তো পায়ে নাই বল। তারপর কর্‌কচের টুকরোগুলো শরীরে আষ্টে-পৃষ্ঠে এমন ঢুকে রয়েছে যে উঠে দাঁড়াতেও সেগুলো ঝরে পড়ার নাম করে না। তাই উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের সেই সুর্‌কি ঝাড়ছি, এমন সময় কিসের শব্দে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, সেই আগন্তুকও আমার সঙ্গে যাবার জন্যে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন—ব্যাগটি বগলে

নিযে। এর আগে তিনি যে কি করছিলেন, কি অবস্থায় ছিলেন, তা আমার লক্ষই পড়েনি আমি এমন আত্মভোলা হয়ে ছিলাম।

এখন তাঁকে দেখা মাত্রই রাত্রের সমস্ত ঘটনা একে একে স্মৃতিতে ভেসে উঠল।

পূর্বেও একবার আগন্তুকের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিযেছি, বলেছি তিনি পুরুষ না স্ত্রী তা আমি বুঝতে পারিনি? কিন্তু তখন না হয় তাঁকে দূর থেকে দেখেছিলাম, রাত্রে গ্যাসের আলোয় ভাল করে দেখা সম্ভব হয়নি? কিন্তু এখন একেবারে সামনা সামনি দেখেও কি ঠিক বুঝতে পারলাম না?

চেহারায় আকৃতিতে, পোষাকে পরিচ্ছদে, সর্ববিষয়েই তিনি অদ্ভুত। এমন মানুষ আমি জীবনে আর কোথাও কখনো দেখিনি! পরনে তাঁর বৃন্দাবন-মথুরার

স্ত্রীলোকদের মত দামী সিল্কের সালোয়ার-পাঞ্জাবী। কিন্তু পাঞ্জাবীর হাতা কনুই-এর ওপর থেকে পুরুষদের হাফ সার্টের' মত খুব ছোট করে কাটা। পায়ে যে জুতো পরেছেন, তেমন জুতো আমি কাউকে কখনো পরতে দেখিনি, এমনকি কোন জুতোর দোকানেও দেখিনি। প্রায় এক ইঞ্চির বেশি পুরু হাওয়াই চপ্পলের মত গড়ন সে-জুতোর। কিন্তু তা আবার রবার বা চামড়ার তৈরী নয়। বাহির

থেকে দেখলে মনে হবে—খালি সাদা কাপড়ের তৈরী। পা দু'খানিও খালি নয়, সাদা মোজা দিয়ে ঢাকা। এক হাতের কব্জিতে তাঁর টেনিস খেলার সময় হাতে লেগে গেলে খেলোয়াড়রা যেমন পট্টি বাঁধে তেমনি কাপড় বাঁধা। আবার তাঁর মাথাতেও একেবারে কপাল পর্যন্ত সাদা রুমাল দিয়ে বাঁধা। শীর্ণ জীর্ণ দেহ। দেহের রঙ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল সাদা।

কিন্তু সবচেয়ে যা বিস্ময়কর সবচেয়ে যা আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল, তা হল আগন্তুকের দু'টি আয়ত অপার্থিব করুণা মাখা আঁখি! সেই আঁখি দু'টি এবং সেই মূর্তিটি এখনো আমার মনের মুকুরে ঠিক তেমনি অবিকল আঁকা আছে, আজও আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাই!

পোষাকে-পরিচ্ছদে, আকৃতিতে প্রকৃতিতে তাঁকে দেখলে মনে হয় মথুরা-বৃন্দাবনের কোনো জমিদার ঘরণী কিংবা কোনো রাজরাণীই হবে-বা! কিন্তু সেই আভিজাত্যপূর্ণ বেশবাসের সঙ্গে যখন দেখি বাঙালী ঘরের সাধারণ গৃহস্থ বধুদের মত বগলে তাঁর কাপড়ে বাঁধা পোঁটলা, (সাদা চামড়ার ব্যাগটাকে তিনি বগলে এমন-ভাবে ধরেছিলেন যা দেখে আমি বার বার কাপড়ের পোঁটলা বলে ভুল করছিলাম), তখন সত্যিই অদ্ভুত লাগে! তখন তাঁকে কোন্ দেশীয় ভাববো বুঝে উঠতে পারি না!

বাস্তবিক এই কারণেই তাঁকে আমারই মত একজন পথিক ভেবে নিতে পেরে-ছিলাম, যিনি আমার মত বিনা টিকিটে ট্রেনে যাচ্ছেন ; পুলিশ নামিয়ে দিতে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। মনে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ-অবিশ্বাস স্থান পায়নি। এমন কি তাঁর মুখে বাংলা কথা শুনেও একবারের জন্যে মনে হল না এত রাত্রে একজন ধনী বাঙালী স্ত্রীলোক এলো কোথা থেকে?

সে যা হোক, অভিভূত হয়ে আগন্তুককে দেখছিলাম, বিশেষ করে তাঁর চোখ দু'টিকে। সে-চোখের দৃষ্টি এমন স্থির এমন গভীর যে বিশ্বাসই হয় না মানুষের চোখ ব'লে। মনে হয় যেন কোন পাথরের মূর্তির চোখ। সেই চোখের দৃষ্টিই কি অলৌকিক উপায়ে আমার সমস্ত চেতনাকে অধিকার করে নিলে ; আমি আর তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ-করতে পারলাম না।

এবার আগন্তুকই প্রথম কথা বললেন। হাত-মুখ নেড়ে নয়, সেই একাগ্র দৃষ্টির পলক ফেলেও নয়, সেইরকম একইভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন—"আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে আমি সাগরে নিয়ে যাবো"!

আগন্তুকের গলার স্বর এমন অদ্ভুত যে, তাঁর কথাগুলি প্রথম কানে যাওয়া মাত্রে মনে হল—ইনি কি বলছেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই তাঁর কথাগুলি বুঝে ফেললাম এবং যন্ত্র চালিতের মত তাঁর কথার উত্তরও দিয়ে ফেললাম। পাঠশালা-পালানো ছেলের মত ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম—সাগরে?

আগন্তুক সেই ভাবেই আবার বললেন—হ্যাঁ, সাগরে। সাগরে আমার বাপের বাড়ি।

তাঁর ঐ সাগর কথাটিকে আমি তৎক্ষণাৎ কলকাতার গঙ্গাসাগর বুঝে নিলাম। তাই ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলাম—ওরে বাবা! উনি কি আমাকে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যেতে চাইছেন নাকি? আবার সেই কলকাতা, আবার সেই দেশে যেতে হবে?

এসব অবশ্য মনে মনেই চিন্তা করলাম; কার্যতঃ আগন্তুকের কথার কোনরকম প্রতিবাদ না করে তাকেই অনুসরণ করলাম। কারণ তখনো আমার চেতনার ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও ছিল না। তাছাড়া কথা ক'টি বলেই তিনি চলতে সুরু করলেন। কাজেই আমারও দাড়িয়ে থাকা চলে না।

আগন্তুক আগে আগে চলতে লাগলেন, আমি চললাম তাঁর পেছনে। চলতে চলতে চারদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম: হ্যাঁ, খুব বড় একটা ষ্টেশন বটে। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি সব লাইনের ওপর। মাথার ওপর মস্ত বড় ওভার ব্রীজটা এ মুড়ো থেকে ও-মুড়োয় গিয়ে শেষ হয়েছে। সাইন বোর্ডে ষ্টেশনের নামটাও একবার যেন চোখে পড়ল। পরন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভুলে গেলাম। দূর! কি হবে ষ্টেশনের নাম মনে রেখে? তাই ডায়েরীর মধ্যেও কোথাও ষ্টেশনটার নাম খুঁজে পেলাম না। তবে কেন জানি না মথুরা থেকে মাদ্রাজ আসার পথে শুধু ভোপাল ষ্টেশনের নামটাই অন্তরে গাঁথা রয়েছে। যাঁরা ভোপাল ষ্টেশন দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করেন তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি আমার স্মৃতির সঙ্গে তাঁদের বর্ণনাটা বেশ মিলে যায়।

সে সব কথা থাক, তারপর যে-কথা বলছিলাম—সেই প্ল্যাটফর্মেই তখন দূরে একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, আগন্তুক সেই ট্রেনের দিকেই চললেন। চারদিকে বহু যাত্রীর ভীড়। আগন্তুক সেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে করে চলতে লাগলেন। প্রতিটি কামরাই ভীড়, কোন্ কামরায় উঠবেন তিনি যেন তা ঠিক করে উঠতে

পারছিলেন না। এমন সময় একজন পুলিশ তাঁকে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা দেখিয়ে দিলে। তিনিও অমনি সেই কামরাতে উঠে পড়লেন।

আশ্চর্য! কাল রাত্রে যে-পুলিশের দল আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে, তাদের আজ আবার এ কি ব্যবহার? কিন্তু তখন আশ্চর্য হবার ক্ষমতাটাও বেশি ছিল না। তাই আমিও সহজ বুদ্ধিতে আগন্তুকের সঙ্গে উঠে পড়লাম। কি ট্রেন, কোথায় যাচ্ছে—এ সব দেখবারও আমার ইচ্ছা বা কৌতুহল হল না।

আগন্তুক দরজার কাছাকাছি একটা বেঞ্চ দখল করে একপাশে ব্যাগটি রেখে বসলেন। আমাকে বললেন—তুমি এইখানে বস। বলে তাঁর বাঁ দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

যাত্রীদের সঙ্গে বেঞ্চে বসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি এমন করে বল্লেন যে, তার সঙ্গে বেঞ্চে না বসে পারলাম না।

বেশ মনে পড়ে আমরা পূবদিকে মুখ করে বসেছিলাম। কারণ যখন বসেছিলাম তখন প্রভাতের সোনালী আলো ট্রেনের জানালার ভেতর দিয়ে সামনের সীটের যাত্রীদের মাথার ফাঁক দিয়ে আমাদের বুকের কাছে এসে পড়ছিল। আর সেই রোদ্দুর পায়ের নীচে না নামা পর্যন্ত আমরা সেই ভাবেই বসে রইলাম। যাত্রীরা কেউ কিছু বল্লে না, পুলিশ-চেকাররাও কেউ কাছে এলো না আমাদের।

তারপর ট্রেন চলতে সুরু করল।

চারদিকের শব্দ কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। ট্রেনের যাত্রীরাও শান্ত হয়ে গেল। আগন্তুক কিছুক্ষণ পরেই তাঁর সেই ব্যাগটি থেকে না কোথা থেকে একটি টফি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও একটা টফি।

নীল কাগজে মোড়া টফিটি আমি হাত পেতে নিলাম। কিন্তু সেটি মুখে দিতে পারলাম না। মনটা এতক্ষণ এমন শূন্য ছিল যে, কোন চিন্তা ভাবনাই সেখানে প্রবেশ করতে পারছিল না। কিন্তু টফিটা হাতে পড়তেই মাথার মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা এসে পড়ল, আর এই প্রথম আমি পাশে বসা আগন্তুকের সম্বন্ধেও সচেতন হলাম, তাঁর সুখ-সুবিধার কথাও একটু ভাবলাম।

টফিটি হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলাম, যিনি আমায় টফি দিলেন তিনিও তো আমার মতই কাল থেকে অভুক্ত? যদি টফিটা কোন রকমে দু'টুকরো করা যেত তাহলে দু'জনেরই পেটে তবু কিছু পড়তো! কিন্তু টফিটা কাটবো কি করে? হাত দিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করতে গেলাম।

আগন্তুক সেটি দেখে ফেললেন। আর দেখেই আমার অভিপ্রায় বুঝে নিলেন। মধুর হাসতে হাসতে বললেন—ভাঙতে হবে না, ওটি তোমার জন্যে। তুমি খাও।

আমি তখনো বেশি কথা বলতে পারি না—সামর্থ্যও নাই, আর প্রয়োজনও ছিল না। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে টফিটি মুখে দিলাম। আগন্তুক আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু সেই সামান্য কাজটিতে আর একজন যে এত খুশী হতে পারে তা কি আমি জানতাম? আমার টফি খাওয়া দেখে আগন্তুক যার-পর-নাই খুশী হলেন, তাঁর সেই খুশীর প্রকাশ মুখে চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সস্নেহে আমাকে বললেন—দু'দিন তুমি কিছু খাওনি, খুব ক্ষিদে পেয়েছে—না?

ক্ষুধার কথা আমার মনে ছিল না। তাঁর কথা শুনে মনে পড়ে গেল—সত্যিই তো আমি দু'দিন খাইনি। তাঁকে বল্লাম—কি করে জানলেন আমি দু'দিন খাইনি?

তিনি বললেন—আমি জানি। আহা খুব ক্ষিদে পেয়েছে তো এবার? ট্রেণটা ধরুক, তোমার জন্যে খাবার এনে দেব।

এই বলে তিনি আমার আরও কাছে সরে এসে, মা যেমন সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্ত করে একাত্ম হয়ে তাঁর ছোট্ট শিশুকে আদর করেন, তেমনি ভাবে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন—আহা! বাছার আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। খুব কষ্ট হচ্ছে! কি করব, এখানে কোথায় খাবার পাব? গাড়ীটা থামুক, আগে আমি তোমার জন্যে খাবার এনে দেব……

গভীর আবেগ ভরে দু'হাত দিয়ে তিনি আমার মাথায় চোখে মুখে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। চোখে-মুখে তাঁর সে কী অপার্থিব স্নেহ-করুণা!

আমিও সব কিছু ভুলে নিজেকে ভুলে নির্বিকার চিত্তেই সেই স্নেহ গ্রহণ করতে লাগলাম। বার বার শুধু মনে হচ্ছিল, আজ যেন আমার বড়ো আনন্দের দিন! বড়ো শান্তির দিন!

মনে মনে এই অনুভব করতে করতেই হঠাৎ কেমন যেন তখন সচেতন হয়ে পড়লাম।

সচেতনতা অবশ্য আগে থেকেই একটু একটু আসতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তখন যেন নিজের সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে আরো বেশি করে সচেতন হয়ে পড়লাম।

আগেই একবার বলেছি, আমাদের সামনের বেঞ্চেই অন্য যাত্রীরা বসে আছে। সেইসব যাত্রীরাও যে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করবে এটাই তো স্বাভাবিক? অথচ এতক্ষণ তাদের যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না আমার চেতনার কাছে। কিন্তু এই সময় হঠাৎ তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়লাম—আচ্ছা, এই সামনের যাত্রীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে না তো?

আর ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলতেই তাদের চোখে চোখ পড়ে গেল। দেখলাম তাদের সকলেরই যুগ্ম আঁখির একাগ্র দৃষ্টির বিষয় শুধু আমরাই দু'জন!

তৎক্ষণাৎ আমি আবার একজন চালাক চতুর লোকের মত তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তরটাও দেখে নিতে চাইলাম—এরা আমাদের এমন বেশ-বাস চেহারা, এমন অস্বাভাবিক আচরণ দেখে কিছু মনে করছে না তো?

কিন্তু কই? একজন কৌপীন-পরা মানুষকে আগন্তুকের এরকম আদর করা দেখেও তো তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটছে না? তারা তো কেউ একটুও হাসছে না, লজ্জা করছে না? এমন কি, এসব আমাদের পাগলের কাণ্ড মনে করে এতটুকু অবজ্ঞা বা ভ্রূকুটিও তো করছে না?

তা-ই দেখে আবার আমি নিজের মধ্যে ফিরে এসে বিচার করে নিলাম: তাহলে নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। হাসবার বা অবজ্ঞা করবার মত কিছুই নাই। ওরা হয়ত ভাবছে আমরা মা-ছেলে—যেমন ছেলে তেমনি তার মা!

বাস্তবিকই তাদের চোখে মুখে দেখলাম কেমন যেন মুগ্ধ বিস্ময়। দেখছে—কিন্তু সে-দেখার মধ্যে ভাব নাই, উদ্দেশ্য নাই। সত্যি সত্যি বলছি, আমার সেই অবস্থাতেই এতসব আমি দেখেছি, চিন্তা করেছি। শুধু তাই নয়, তৎক্ষণাৎ আমি আবার সেই বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে আগন্তুকের চোখের দিকে তাকিয়েও দেখতে চাইলাম—আমার মত তাঁর মনেও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে কোন বিচার হচ্ছে কিনা?

কিন্তু হায় হায়! তাঁর যে একেবারে হুঁশ বলতেই কিছু নাই! ঠিক যেন একখানি সাদা পাথরের মূর্তি বসে আছেন—তাঁর চোখে না আছে পলক, আর না আছে লজ্জা-ঘৃণা ভাল-মন্দের বোধ! সঙ্গে সঙ্গে আমি কি ভেবে নিলাম জানেন?

ভাবলাম আগন্তুক বড় বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাই সংসারের ভাল-মন্দের প্রতি তাঁর আর কোন দৃষ্টিই পড়ে না! অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এরকম হয়।

ত্রিসত্য করে বলছি—এসব অতি সত্য কথা! ভগবান কেন আমাকে এমন শাস্তি দিলেন জানি না যে, এইসব সত্য ঘটনা অন্য কারো কাছে বাস্তব ভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কোনো প্রমাণই আমায় দিলেন না?

চলন্ত ট্রেনে বসে রয়েছি—জানালার ফাঁক দিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য প্রকাশ হয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। তাছাড়া আমাদের কামরার মধ্যেই কত যাত্রী, কত কথা-বার্তা, হট্টগোল, আগন্তুকের কিন্তু কোনো দিকেই দৃষ্টি নাই মনোযোগ নাই। তাঁর দুই চক্ষুর সমগ্র দৃষ্টি শুধু আমারই মুখের ওপর নিবদ্ধ। তিনি শুধু আমার চিন্তায় ব্যস্ত—কি করে আমাকে কিছু খেতে দেবেন! তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমিও দৃষ্টিকে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম নিজের মধ্যে।

আবার আমার কাছ থেকে বিশ্ব-সংসার মুছে গেল!

এভাবেও অনেকক্ষণ কাটল। কিন্তু পথের তো শেষ হবার নাম করে না? কতক্ষণ আর আগন্তুক আমার দিকে তাকিয়ে শরীরকে বাঁকিয়ে বসে থাকেন? এক সময় তিনি কখন্ সামনের দিকে ফিরে সোজা হয়ে বসেছেন। পা দু'টি তাঁর ট্রেনের মেঝের ওপর সমান্তরাল ভাবে রাখা, আর হাত দু'টি কোলের ওপর। তিনি যেন ঐভাবে ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় তন্ময়।

কতক্ষণ পরে ট্রেনের গতিটা মন্থর হয়ে এল। যাত্রীদের মধ্যে মহা ব্যস্ততা পড়ে গেল। জানালা-দরজায় ভিড় করে অনেকে বাইরের দিকে দেখতে লাগল। এই কারণে আমাদেরও মনোযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। আগন্তুক আমার দিকে ফিরে আবার সেইভাবে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন—খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? ট্রেণটা এবার ষ্টেশনে ধরলে যে হয়! তোমার জন্যে আমি খাবার এনে দেব। তুমি এখানেই বসে থেকো। তাঁর কথা আমি শুনলাম, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর করলাম না। শুধু ভাবতে লাগলাম—উনি বার বার আমাকে খাবার এনে দেবেন বলছেন, কিন্তু কোথা থেকে আমাকে খাবার এনে দেবেন? কাছে পয়সা থাকলে কি উনি নিজে না খেয়ে থাকেন?

কাজেই তাঁর কথায় তেমন গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু তাঁর ঐ আদর ও আশ্বাসটি আমার অন্তরে কেমন যেন এক সহানুভূতি মিশ্রিত ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলল। অন্তরে অন্তরে আমি এই করতে লাগলাম: আহা! কেন ইনি আমার জন্যে এত ভাবেন? অর্থ-সামর্থ্য দিয়ে আমি তো তাঁর কিছু করতে পারবো না? তবে ইনিই কেন আমার জন্যে এত ভাবেন?

আসলে আমি যে তখন সন্ন্যাসী। তখন আমি কারু স্নেহ-ভালবাসাও সহ্য করতে পারি না! কেউ আমার জন্যে ভাবুক, তা-ও পছন্দ করি না। কেননা, আমি কি দিয়ে সেই দানের ঋণ শোধ দেব?

চেতন হয়ে অবধি আগন্তুকের সংস্পর্শে এই হয়েছিল আমার একমাত্র ব্যাকুলতা,

আবার একমাত্র কষ্টও বলা যায়। আমি ঐ কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই এক-একবার ইচ্ছে করতো, তার কাছ থেকে অন্য কোন কামরায় অন্য কোন ট্রেনে উঠে যাই! তাহলে এ-কষ্ট আমার থাকবে না।

আবার ভাবি, উঠে যাব কোথায়? আগন্তুকের জন্যে এতক্ষণ এমন নিরাপদে যেতে পারছি, নইলে সব ট্রেনের কামরায় ইচ্ছা করলেই তো চেকারদের ভয়ে উঠতে পারি না? আর উঠলেও যে কোন সময় নামিয়ে দিতে পারে।

এই কারণে উঠি উঠি করেও এতক্ষণ ওঠা হচ্ছিল না। সীটে বসে বসেই এক-একবার ছট্‌ফট্ করি, আর এক-একবার ভুলে যাই! কিন্তু তবু এক জায়গায় ট্রেনের গতিটা কমতে দেখে ষ্টেশন আসছে ভেবে একবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আগন্তুক তা-ই দেখে বললেন—এমন সময় দাঁড়ালে কেন? ষ্টেশনের এখনো দেরী আছে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি তোমায় ঠিক নিয়ে যাব।

আবার তাঁর 'সাগরে নিয়ে যাবো' কথাটা স্মরণ হয়ে গেল! আবার তেমনি ভয়ে চমকে উঠলাম—সত্যিই কি ইনি আমাকে ছাড়বেন না নাকি? কোলকাতার ভেতর দিয়ে গঙ্গাসাগরে নিয়ে যাবেনই! ট্রেনটা কোন্ দিকে কোথায় যাচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না? তবে কি কোলকাতার কাছাকাছিই এসে পড়লাম নাকি!

এবার তাই তাঁর কাছ থেকে সরে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। তখনই সংকল্প করে ফেললাম—আর না। ট্রেনটা এবার কোথাও ধরলেই অন্য কামরায় কিংবা অন্য ট্রেনে উঠে যেতে হবে আমাকে। তা না হলে ইনি যা জেদী আমাকে নিশ্চয় কোলকাতায় টেনে নিয়ে যাবেন!

কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা সত্যিই বড় একটা ষ্টেশন ধরল। যাত্রীরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হুড়মুড় করে অনেকেই নেমে গেল ট্রেন থেকে। আমিও এবার উঠবো উঠবো করছি, এমন সময় পাশ থেকে আগন্তুক উঠে থপ্ থপ্ করে পা ফেলতে-ফেলতে নেমে গেলেন।

মনে পড়ল, তিনি সেই যে বলেছিলেন, গাড়ীটা ষ্টেশনে থামুক, তোমার জন্যে খাবার এনে দেব। হয়ত তিনি সেই কারণেই নামছেন?

একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ট্রেনটা মাদ্রাজেরই ট্রেন বটে। মনে মনে আশ্বস্ত হলাম—যাক, তাহলে আমি কোলকাতার দিকে যাইনি, মাদ্রাজের দিকেই চলেছি? সুতরাং নামতে গিয়েও আমার নামা হল না।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবুও আগন্তুকের দেখা নাই।

একবার ভাবলাম, যাক এ-কামরায় আর তিনি না-ই আসুন, ভুল করে অন্য কামরায় উঠুন—আমি তো তাঁকে এড়াতেই চেয়েছিলাম ?

কিন্তু যেই ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গেল, যাত্রীদের অনেকে ফিরে এল, তখন আমি আর নিস্পৃহ থাকতে পারলাম না। মনে হল, তিনি আমারই জন্যে কারো কাছে খাবার ভিক্ষে করতে গিয়ে কোথাও হয়ত আটকে পড়েছেন! আর আমি এমন চুপ করে বসে আছি ? তাঁকে আমার অনুসন্ধান করা দরকার।

আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। খাবারের দোকান, চায়ের ষ্টল, ফলের দোকান, জলের কল ইত্যাদি করে সারা ষ্টেশনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেললাম মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না।

ট্রেনটা ছেড়ে দিলে। আমি আর অপেক্ষা করতেও পারলাম না, সামনে যে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটা পেলাম তাতেই কোনরকমে উঠে পড়লাম। পরের ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালে আরো একবার আগন্তুককে খুঁজলাম। কিন্তু সেই ষ্টেশনে নয়, পরের ষ্টেশনে নয়, এমনকি সেই ট্রেনেও নয়, আর কোথাও তাঁকে দেখতে পাই নি।

অবশ্য কখনো পাই নি, এমন নয়। পেয়েছিলাম। অনেকদিন পরে ঠিক এই রকম বেশেই তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সে-ঘটনা যথা সময়ে বলা যাবে।

[পাঁচ]

কিন্তু এতক্ষণ বোধ করি পাঠকদের কারো বুঝতে বাকী নাই কে এই মহান আগন্তুক? বেশ বাস এবং রূপের বর্ণনা পড়ে সবাই বুঝতে পেরেছেন ইনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সর্বাধিনেত্রী আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী, যাঁর কাছে আমি তখন যাচ্ছিলাম এত কষ্ট সহ্য করে এত পথ ভেঙ্গে?

পরন্তু আমি তাঁকে কাছে পেয়েও চিনতে পারলাম না। তখন পর্যন্ত শ্রীমা'র ঐরকম মূর্তির ছবি কোথাও কখনো দেখিনি। অথচ ছোটবেলা থেকেই দেশের পাঠমন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখন থেকে শ্রীমা'র কতরকম ছবিই তো দেখে আসছি—জাপানে অবস্থানকালীন ছবি, বাঙালী মায়ের মত কাপড়-পরা মহালক্ষ্মীর ছবি, ধ্যানরতা ছবি, আশীর্বাদরতা ছবি, বরদায়িনী শ্রীমা'র ছবি? শুধু দেখিনি এই ষ্টেশনের মত অদ্ভুত মূর্তির ছবি! আর মা কি বেছে বেছে আমার কাছে সেই মূর্তিতেই এলেন তাঁর যে-মূর্তি যে-বেশবাস কখনো আমি দেখিনি?

তাছাড়া পাঠমন্দিরে আবার মায়ের জাপানের ছবিরই আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; মায়ের সেই নবীন বয়সের ছবি দেখে-দেখে চোখ এমন অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, বাস্তবে মায়ের জড়দেহ যে এমন জরাজীর্ণ হয়ে যেতে পারে, সামনের দিকে এমন ঝুঁকে যেতে পারে, ছবিতে যে ঝক্‌ঝকে সুন্দর দাঁত দেখি তা যে এমন হয়ে যেতে পারে তা যেন আমার পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল।

সুতরাং আমি যে তাঁকে চিনতে পারিনি, এ হল তাঁরই ইচ্ছা। এই রকমই তিনি চেয়েছিলেন—এই ব'লে নিজের মনকে এখন প্রবোধ দিই। এখন ভাবি, সেদিন যদি আগন্তুক সাগর না বলে আমাকে পণ্ডিচেরী নিয়ে যাব বলতেন, তাহলে তো আমি ভুল বুঝে তাঁর কাজে বাধা দিতাম না? কিন্তু তা যে হবার নয়। পৃথিবীতে যেখানে যত রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষই এমনি ভুল করে এসেছে। কাজেই এই ঘটনাটাই-বা ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন?

কিন্তু পরে যখন বুঝলাম আগন্তুক ঐ 'সাগরে নিয়ে যাব' ব'লে আমার অন্তরের কথাটিই সেদিন শুনিয়েছিলেন, তখন আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না!

পণ্ডিচেরী চলে যাবার আমার আগ্রহ দেখে পাঠমন্দিরের মা তখন বলতেন—আচ্ছা, তুমি সবসময় অমন 'আশ্রম আশ্রম' করো কেন? তুমি দেশের ছেলে, কোথায় তোমার জীবনটা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটাকে গড়ে তুলবে, তোমাকে দেখে

আর দশটা ছেলে এসে জুটবে? তা না করে তুমি কিনা আশ্রমে যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ?

আমি বলতাম—আশ্রম আশ্রম কেন করি জানেন? সেখানে যে মা আছেন?

তিনি বলতেন—আর এখানে বুঝি মা নেই? আশ্রমেও মা-শ্রীঅরবিন্দ, আর এখানেও তো সেই একই মা-শ্রীঅরবিন্দ? তাঁদেরই তো কাজ চলছে?

আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ, তাঁদেরই কাজ চলছে এবং এখানেও তাঁরা আছেন সত্য, কিন্তু তবু সে-থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। মায়ের সশরীরে অধিষ্ঠান এক কথা, আর তাঁর চেতনা-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা আলাদা কথা। আশ্রমের সঙ্গে কি পাঠমন্দিরের তুলনা হয়? আশ্রম হল সাগর, আর এইসব পাঠমন্দির পাঠচক্র, সোসাইটি ইত্যাদি হল নদী উপনদী খাল খন্দ। সব নদী উপনদী খালেরই গতি যে সেই অনন্ত সাগরের দিকে?

এখন ভাবি, নদী-নালা-খালের যে পরম গতি সেই সাগরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই তো করুণাময়ী শ্রীমা এই বেশে এসেছিলেন ষ্টেশনে? সেই আশ্রম-সাগরের কথাই তো তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন? তথাপি তাঁর 'সাগর' কথাটিকে আমি ভুল বুঝে বসলাম?

কিংবা কি জানি, তিনি হয়ত আর কোন বিশেষ অর্থে 'সাগর' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন? হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, আমি তোমাকে চেতনার অনন্ত সাগরে নিয়ে যাব?

কিন্তু ঐ-সব কথাও থাক্। আবার পূর্বের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। কেননা সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটার তো এখনো শেষ হয়নি? মাদ্রাজ-অভিমুখী আমাদের চলন্ত ট্রেনটার মত সেই ঘটনাটা এখনো এগিয়ে চলেছে:

আমি সেই একই ট্রেনে রয়েছি। ভোপাল ষ্টেশনের মত যদি-বা কোথাও আমাকে নামিয়ে দিয়েছে, তবু কোন না কোন উপায়ে আবার একটা ট্রেনে উঠে পড়েছি।

তারপর একসময় ভুলেই গেলাম আগন্তুকের কথা। কারণ, আমি যে তখন আর এক পরমাশ্চর্যের অন্বেষণে চলেছি! সেই উদ্দেশ্যের কথা প্রেরণার কথাই তখন আমার সমস্ত চেতনাকে ব্যাপ্ত করে রইল।

ট্রেনের মধ্যে একজন যাত্রী উপযাচক হয়ে দুটো সবুজ কলা দিয়েছিল, সেই কলা খেয়ে এবং ষ্টেশনের কলের জল পান করে দু'দিনের পথকে চারদিন লাগিয়ে

কত ট্রেন কত পথ পরিবর্তন করে একদিন মাদ্রাজ ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। তারপর মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরীর ট্রেনে চড়ে আর একদিন এসে পৌঁছলাম পণ্ডিচেরীতে। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলে ফেললাম তত তাড়াতাড়ি যদিও আসিনি।

একে তো মাদ্রাজের পর থেকে যা-কিছু দু'চোখে পড়ছে সে-সবকেই শ্রীঅরবিন্দের স্থান মনে করে কত যে প্রণাম নিবেদন করছি আর অন্তরে ধ্যান-তন্ময় হয়ে উঠছি, তার ইয়ত্তা নাই! তারপর প্রথম পণ্ডিচেরীর ভূমি স্পর্শ করেই অনুভব করলাম কি বিপুল তীব্র আনন্দ এর অণুতে অণুতে মিশে রয়েছে! প্রথম যেদিন বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম সেদিনও আমার এই দশা হয়েছিল, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলাম না! সেই তীব্র আনন্দে সত্তার সবটুকু যেন গলে ঝরে মিশে যেতে চাইছিল বৃন্দাবনের রজে! আজ আবার তেমনি হল! আমার সমগ্র সত্তা গেয়ে উঠল—'যা চেয়েছি যা পেয়েছি. তুলনা তাহার নাই!'

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য নাম স্মরণ করতে করতে ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের দরজা পার হয়ে এলাম। চেকার বা পুলিশ কেউ ধরলে না।

ষ্টেশনের বাইরে এসে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম—নাঃ! গাড়ীটা একেবারে সন্ধ্যে করে পণ্ডিচেরীতে এসে পৌঁছল! কোথায় ভেবেছিলাম দিনের আলোয় সবকিছু দেখেশুনে নূতন স্থানে উঠব?

সেই ভর সন্ধ্যেবেলায় কিছুতেই মনটা আশ্রমের দিকে যেতে চাইল না। এমন সময় আশ্রমে গিয়ে কাকে কি বলব? আমি তো আশ্রমের অতিথির মত ভব্য সভ্য হয়ে আসিনি? তাই ভাবলাম, আজকের রাতটা ষ্টেশনের কোথাও কাটিয়ে দিই, কাল নতুন দিনের নতুন প্রভাতে স্নান করে আশ্রমে মাকে দর্শন করতে যাব।

যোগ বুঝে সেইদিনই আবার কোথা থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ম্যাচ খেলতে এসে ষ্টেশনে ভীড় জমিয়েছে; তাদের জন্যে ষ্টেশনের মধ্যে কোথাও একটু নিরিবিলি স্থান পাওয়া গেল না। ষ্টেশনের পাশে একটা গাছতলায় বসে খানিকক্ষণ গীতা পাঠ করলাম। বৃন্দাবনে এক বৈষ্ণব সাধু দেশলাই বাক্সের মত ছোট একটি সংস্কৃত গীতাপুস্তক দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র আকার হওয়ায় সেটি আমার কৌপীনের ডোরের মধ্যেই সহজে রাখা যেত।

গীতাপাঠ শেষ করে ষ্টেশনে এসে দেখি ভীড় কেটে গেছে। প্ল্যাটফর্মের ভেতরে একটা জায়গায় বেগুনি রঙের কুর্তা-গায়ে জন দুই রেলওয়ে মজুর মাথায় একটা করে থান ইঁট দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছিল। তাদের পাশে আরও একটা ইঁট খালি ছিল, সেইটা মাথায় দিয়ে আমিও শুয়ে পড়লাম।

শোবার আগে পেট ভরে কলের জল পান করে নিয়েছিলাম, সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়েছিল, একবার শুয়ে পড়তেই সমস্ত শ্রম ক্ষুধার জ্বালা কোথায় চলে গেল এক মুহূর্তে। অতি সত্বর নিদ্রার গভীরে চলে গেলাম। আহা, সে বড় সুখের নিদ্রা! দেহের প্রতিটি কোষে কোষে তীব্র সুখ অনুভূত হতে লাগল। মনে হল আবার ভোপাল ষ্টেশনের মত অবস্থা আসছে!

কতক্ষণ কাটল তার হিসাব ছিল না। হঠাৎ একসময় মনে হল কে যেন ডাকছে। সেই নিদ্রার মধ্যেই তাকে কি যেন উত্তর দেবারও চেষ্টা করলাম, কিন্তু উত্তরটা বোধহয় স্পষ্ট হল না, তাই যে ডাকছিল সে তখন আরো অসহিষ্ণু হয়ে আবো রূঢ়ভাবে ডাকতে লাগল। কিন্তু কে সাড়া দেবে? শুনতে বুঝতে যদি-বা পাচ্ছি, কিন্তু কিছু করবার শক্তি পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে একপ্রকাব কষ্ট হতে লাগল।

অবশেষে আমার শরীরে চাবুকের ঘা এসে পড়ল! হ্যাঁ, এবার রোগের উপযুক্ত দাবাই পড়ল। তৎক্ষণাৎ আমি চমকে উঠে অস্ফুট স্বরে বলে ফেললাম—আই ক্যাণ্ট আণ্ডারস্টাণ্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, স্যর্! আপনার ভাষা আমি বুঝতে পারছি না, মশাই?

সে সময় আমি যে তামসিক নিদ্রার কবলে পড়িনি, সচেতন ধ্যানের অবস্থায় ছিলাম—এই ঘটনাটি তারই একটি প্রমাণ। এখন বুঝি, ঐ কথাগুলোর পেছনে কত বড় একটা সাইকোলজি ছিল যা সেই অবস্থার মধ্যেও প্রকাশ করে ফেলেছি: আমার কৃতকর্ম এবং অধিকার সম্বন্ধে আমি সচেতন। যেখানে আমি শুয়েছি সেখানে যদি একা শুতাম তাহলে অপরাধ হয় বটে, কিন্তু আমি যে আরো দু'জন মানুষের সঙ্গে শুয়েছি। সুতরাং আমার অন্যায় কিছু হয়নি। তবে আমাকে ডাকে কেন?

তারপর দ্বিতীয় সাইকোলজিটা হল: যে ডাকছে তার ভাষাটা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু তার ভাষাটা যাই হোক সে ইংরেজী কথা হয়ত বুঝতে পারবে? তাই তাকে ইংরেজীতে উত্তর দিয়েছি।

অবশ্য আমার প্রথম সাইকোলজিটার বিচারে ভুল হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের ভেতরে রাত্রি দশটার পর বাইরের কারো থাকবার যে অধিকার ছিল নাই, সেটা আমার জানা ছিল না। যারা আমার পাশে শুয়েছিল তারা তো ষ্টেশনের কুলি-মজুর, তারা তো থাকবেই।

সে যাকগে, তারপর কি হল বলি—সেই দারুণ আঘাতের চোটে আর্তনাদ

করতে করতে এবং যন্ত্রণা প্রশমনের নিমিত্ত প্রহৃত স্থানে হস্তের প্রলেপ দিতে দিতে উঠে বসলাম। তারপর চোখ খুলেই দর্শন করলাম—ষ্টেশনের শান্তিরক্ষক পুলিশের মূর্তি!

পুলিশ তখন আমার হাত ধরে মাটি থেকে তুলে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি লেখাপড়া জান? তুমি এখানে এভাবে শুয়ে কেন? তোমার দেশ কোথায়? ইত্যাদি···

সংক্ষেপে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

কথা বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা সিমেণ্টের বেঞ্চে আমার হাত ধরে শুইয়ে দিয়ে পুলিশ তারপর চলে গেল।

আমিও আবার শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার কে একজন আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগল। একবার মার খেয়েছি, তাই চেতনায় সেই আতঙ্কটা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

সামনেই দেখলাম সেই পুলিশ আবার এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার খাওয়া হয়েছে?

উত্তরে আমি শুধু বললাম—না।

—হয়নি? কিন্তু দোকান তো সব বন্ধ হয়ে গেল! এস দেখি ঐ দোকানটায় কিছু পাওয়া যায় কি না! পুলিশ আবার আমার হাত ধরে তুলল।

—এ কি আপদ? আমি যেন তাকে খাবার চেয়েছি? আমার যে খাওয়ার চেয়ে এ সময় বিশ্রামের প্রয়োজন বেশি, সেটা তাকে বোঝাই কি করে? বাস্তবিক কি যে সুখের আবেশে শুয়েছিলাম! সিমেণ্টের বেঞ্চটাকে মনে হচ্ছিল মায়ের স্নেহময় ক্রোড়।

কিন্তু এমন সুখের আবেশে যে ব্যাঘাত ঘটালো তার ওপর অভিমান করে যে বলব—যাও, তোমার দয়ার দান আমি চাইনে? আমি এখন কিছু খেতে চাইনে, বিরক্ত করো না আমাকে—তা-ও বলতে পারলাম না। শরীর, মন আমার নিজের বশে নাই, কাজেই কি করে তাকে বাধা দিই?

পুলিশের সঙ্গে যেতে হল দোকানে। পুলিশ দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করলে—কি কি খাবার জিনিস আছে বল দেখি?

পান-বিড়ির দোকান সেটা। দোকানদার কলা লেমনেড কেক থেকে আরম্ভ করে বিস্কুট লজেন্সের ফর্দ দাখিল করলে। পরন্তু আমার মত অনাহারীর বিস্কুট-

লজেন্সে কিছু হবে না ভেবে পুলিশ এবং সেই দোকানদার আমাকে বললে—কলা খাও। অনেক কলা আছে যত চাও তত খেতে পার।

কিন্তু আমি এই প্রথম দেবী দর্শনে পণ্ডিচেরী এসেছি, আর এসেই 'কলা-যাত্রা' করবো? কলা খেলাম না, একটি পাউরুটি ও লেমনেড নিলাম। পুলিশ সেগুলির দাম মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। পুলিশের এতখানি দয়ার জন্যে তাকে একটু ধন্যবাদ দিতেও পারলাম না।

তারপর দোকানে বসে পাউরুটি লেমনেড খেতে খেতেই চেতনা কিছুটা সহজ স্বাভাবিক হয়ে এল। ইতিমধ্যে পুলিশের নিজের পকেট থেকে খরচ করে খাবার খাওয়ানো দেখে, সেই রাতের বেলাতেও অনেক লোকের ভীড় হয়ে গেল দোকানের সামনে। তাদের মধ্যে এক ভদ্রলোক এসে আমাকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করতে লাগল, আমি কোথা থেকে আসছি, কেন আসছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শুনে সেই ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন—আমি তো আশ্রমেই কাজ করি।

আমি জানতে চাইলাম—আশ্রমের কি কাজ করেন?

তিনি বললেন—প্রেসের কাজ করি।

—এঁ্যা, আপনি আশ্রম প্রেসে কাজ করেন? আমার তখন মনে হল, বহু ভাগ্যগুণে আজ এমন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল যিনি আবার আশ্রম প্রেসে কাজ করেন! কেননা আমিও যে প্রেসের কাজটা জানি? এই কাজটার মাধ্যমে যদি আশ্রমে থাকার একটা ব্যবস্থা হয়? আহা মায়ের কি যোগাযোগ! পণ্ডিচেরী এসেই একেবারে আশ্রম প্রেসের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন?

তাকে জিজ্ঞেস করলাম—শ্রীমা প্রেসে আছেন? তাঁকে আপনি সব সময় দেখতে পান?

তিনি বললেন—সব সময় কি পাই? তিনি ক্বচিৎ কখনো প্রেসে আসেন। তবে সকালবেলার ব্যাল্‌কনি দর্শনে প্রতিদিন মাকে দেখতে পাই।

—ক'টায় মায়ের ব্যাল্‌কনি দর্শন হয়?

তিনি বললেন—সকাল আটটায়। তুমি মায়ের দর্শন করতে চাও?

—চাই বৈকি! মাকে দর্শন করবো বলেই তো এসেছি! কিন্তু আমি যে সবসময় দর্শন করতে চাই মাকে? একবার দর্শন করে তো এখান থেকে চলে যেতে পারবো না! আমি যে আশ্রমে চিরকালের জন্যে থাকতে এসেছি?

ভদ্রলোক বললেন—তা থেকো। মায়ের অনুমতি নিয়ে চিরকালই থেকো।

—কিন্তু আমার বস্ত্র নাই, হাতে অর্থ নাই, কি উপায় হবে আমার? মা আমাকে যে-কাজ দেবেন সেই কাজই করতে রাজী আছি—তাহলে মা কি তাঁর আশ্রমে থাকতে দেবেন? আশ্রমে তেমন কাজ কি আছে? শুধু কাজ করার জন্যে মা কি কাউকে থাকতে দেন? একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করে ফেললাম ভদ্রলোককে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা দেবেন না কেন? এখানে কত কাজ আছে, এমন কত মানুষ এখানে কাজ করে রয়েছে?

—রয়েছে! সহসা যেন আমার ফাঁসি কাঠে ঝোলাটা রদ হয়ে গেল—অন্তরটা এমনি এক বিপুল আনন্দে ছেয়ে গেল! আমি জানতে চাইলাম—কি কি কাজ করতে হয় এখানে?

—ক'টি বলবো তোমাকে, কাজ কি এখানে একটা আধটা? বাসন ধোয়া-মোছার কাজ, রান্না-বান্নার কাজ, গোশালার কাজ, বাগানের কাজ, ক্ষেত-খামারের কাজ, মেসিনারী কাজ, প্রেসের কাজ…

আমি শুনে বললাম—মা যে কাজ দেবেন সেই কাজই আমি করব। তবে প্রেসের কাজটা আমি ভালরকম জানি, মা যদি চান ঐ কাজটাও করতে পারি।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—প্রেসের কাজ জান তুমি? তবে তো খুব ভাল! আমি মাকে ব'লে ক'য়ে তোমার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেব।

—আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন? হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলাম আমি! সেই ভদ্রলোকের প্রতি মায়ের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে উঠল। বললাম—কাল তাহলে কি করে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, মায়ের দর্শনই-বা কেমন করে পাব?

তিনি বললেন—আমি তোমাকে নিয়ে যাব মায়ের দর্শন করাতে। তুমি খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে আশ্রমের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি তোমাকে আটটার আগে ডেকে নিয়ে যাব। তারপর যা করবার সব আমি করবো।

ভদ্রলোকের কাছে সে রাত্রে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এসে আগের বেঞ্চটায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না, আশ্রমে মায়ের কাছে থাকার সুখ-স্বপ্ন অন্তরের মধ্যে লালন করতে করতে রাত্রিটা কেটে গেল।

পরের দিন প্রত্যুষেই সমুদ্রের দিকের রাস্তাটা ধরে আশ্রমে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আসতে আসতে একটা জায়গায় কলের জলে স্নান করে

নিলাম। তখন ছ'টাই বাজেনি। মায়ের আট্‌টার দর্শনের অনেক দেরী আছে ভেবে এক জায়গায় একটু চুপ করে বসে রইলাম।

তারপর পথের লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে আবার আশ্রমের দিকে চললাম। পথের লোকেরা ডাইনিং রুমকেই 'ঐ যে আশ্রম' 'ঐ যে আশ্রম' বলে দেখিয়ে দিলে।

ডাইনিং রুমের গেটে তখন কেউ ছিল না। আমি ভেতরে ঢুকে পডলাম। সেই সময় উঠোনের বামদিকের বারান্দায় একজন সাধক বিরাট একটা গামলার লাল জলে কলা ধুয়ে ধুয়ে রাখছিলেন, আর তাঁর সামনে একটা ঠেলাগাড়ি ভর্তি কাঁচা-পাকা কলার কাঁদি। গাড়ির লোক সেই কলা নামিয়ে রাখছে তাঁর সামনে। সেই সাধকের কী তেজোপুঞ্জ শরীর! পরণে হাফ প্যাণ্ট গায়ে একটি গেঞ্জি। মুখে বিরাট একজোড়া গোঁফ, মাথায় বড়-বড় বাব্‌রি চুল কাঁধে এসে পড়েছে। তাঁকে দেখেই মনে হল প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিই। কিন্তু অতোটা আর করতে গেলাম না। কারণ এ-আশ্রমের কি নিয়ম-কানুন কে জানে?

তাঁর কাছে গিয়ে শুধু হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বললাম—দেখুন, আমি অনেকদূর থেকে আসছি, আমি আশ্রমে থাকতে চাই।

তিনি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—এটা আশ্রমের খাবার ঘর। তুমি মেইন আশ্রমে যাও, সেখানে মা আছেন।

সেখান থেকে আবার লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে শেষে আশ্রমের সামনে এসে পৌছলাম।

কিন্তু এই আশ্রম? এ যে স্বর্গরাজ্য! আহা, একি দেখলাম? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে কত মানুষ আশ্রমের মধ্যে ঢুকছে, আবার কত জন সেইসঙ্গে বাইরে আসছে। তাদের দেখলেই মনে হয় তারা কি যেন এক দায়িত্বপূর্ণ উৎসবে অতিশয় ব্যস্ত। তাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব দেখে আমার মনেও এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ খেলে গেল!

এতক্ষণ দূর থেকে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছিলাম, এইবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তারপর আরও একটু এগিয়ে দরজার একেবারে গায়ে দাঁড়ালাম। শেষে দরজার মধ্যে ঢুকে ডানপাশে একধারে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেও যেমন কেউ কিছু বললে না, তেমনি এই যে দরজার

ভেতরে এসে দাঁড়ালাম, এখানেও কেউ কিছু বললে না। অথচ সকলেরই দৃষ্টি একবার করে আমার ওপর এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। তা না-পড়ে পারেই না! কারণ আমি যেন সেখানের সবকিছু থেকেই একেবারে স্বতন্ত্র—আমার সেই চেহারা সেই ডোর-কৌপীন বসন, সব যেন সেই স্বর্গীয় পরিবেশের নিকট বিসদৃশ!

আমি যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তার অল্প একটু ব্যবধানেই ফুলগাছের ছাওয়ায় একজন সৌম্যদর্শন পৌঢ় সাধক চৌকির ওপর বসে একজনের সঙ্গে অতি মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন। কিন্তু সেই কথাবার্তার মধ্যেই এক-একবার আমাকেও তিনি লক্ষ্য করছিলেন।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সময়ও আছে এখনো আধ ঘণ্টা মায়ের দর্শন দেবার। এর মধ্যেই ষ্টেশনের সেই ভদ্রলোকটি নিশ্চয় এসে পড়বেন আমাকে দর্শনে নিয়ে যাবার জন্যে। ততক্ষণ আমি আশ্রমের ভেতরের দৃশ্যটা উপভোগ করে নিতে লাগলাম: কত নাম-না-জানা ফুলের গাছ, কতরকম পাতা বাহারের গাছ আশে পাশে, টবে মাচায়। যেদিকে তাকায় সেখানেই দৃষ্টি আটকে পড়ে। এমন কি আশ্রমবাড়ির দরজা-জানালা দেওয়াল চেয়ার টেবিল যা-কিছু দেখি সব কিছুতেই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর জাগ্রত উপস্থিতি দেখে দেহ-মন আমার আবেশ-মগ্ন হয়ে ওঠে।

এমনি সময় সামনের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বেজে গেল।

অমনি মনে পড়ে গেল—এবার তো তাহলে শ্রীমা দর্শন দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু প্রমাণও পেয়ে গেলাম—সেই সময় অনেককেই দেখলাম খুব যেন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আশ্রমের ভেতরে ঢুকছে! অনেকের হাতে আবার ফুলও দেখলাম। মায়ের হাতে দিয়ে হয়ত তারা প্রণাম করবে?

তাদের দেখে আমার অন্তরও ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু যে ভদ্রলোকটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন তিনি তো এখনো এসে পৌঁছলেন না?

এদিকে সেই দ্বার-রক্ষক সাধকেরও কথা শেষ হয় না। তা নইলে তাঁকেই আমার সব কথা জানাবো ভাবছিলাম, তিনিই মাকে সংবাদ দিতেন। তাছাড়া, বর্তমানে সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন—মাকে দর্শন করা, তাঁকে বললে হয়ত তিনিই ব্যবস্থা করে দিতেন?

কিন্তু তিনি যে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন? এসময় তাঁকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? তাহলে আমি এখন কি করি? অথচ একটু দেরী করলেই যে মায়ের দর্শন শেষ হয়ে যাবে?

অবশেষে ভেতরে যাওয়াই ঠিক করে ফেললাম। ভাবলাম এখন গিয়ে মাকে দর্শন করে আসি, তারপর ফিরে এসে এই সাধকের সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে'খন। অধিকন্তু মনে একটু সাহসও পেলাম এই কথা ভেবে যে, এতক্ষণ ধরে তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু কেউ তো কিছু বললে না আমাকে? যদি বিনানুমতিতে আশ্রমে ঢোকা নিষেধই থাকত, তাহলে যিনি দ্বারের কাছে বসে আছেন তিনি আমাকে এতক্ষণ দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দিতেন না, বিশেষ করে আমার এই বেশ ভূষায়? অথচ কতবার তাঁকে দেখেছি, তিনি আমারই দিকে তাকিয়ে দেখছেন এবং সেইভাবেই অন্যের সঙ্গে কথাও বলছেন। কাজেই আমার আশ্রমের ভেতরে যাওয়াও হয়তো দোষের হবে না?

তাছাড়া, এবিষয়ে আমার নিজেরও একটা অভিজ্ঞতা ছিল—অনেক আশ্রম মঠই তো এই ক'দিনে বৃন্দাবন মথুরা গয়া কাশীতে দেখে এসেছি! সেখানে কোথাও তো সর্বসাধারণের প্রবেশের বাধা নিষেধ নাই? ধনী-দরিদ্র দীন ভিক্ষুক নির্বিশেষে সকলেরই অবারিত দ্বার। আমি বুঝে নিলাম এখানেও বোধ হয় সেই রকম ব্যবস্থা।

কিন্তু এসব চিন্তা-বিচার তো অনেক আগেই করে ফেলেছিলাম? তথাপি আমার কমন্‌সেন্সকে একবারে বিসর্জন দিয়ে আশ্রমের ভেতরে ঢুকে পড়িনি। কারণ দ্বার-রক্ষী যখন একজন বসে আছেন দেখতে পাচ্ছি, তখন তাঁর বিনানুমতিতে ভেতরে যাওয়া কি উচিত? আর সেই কারণেই তো আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা অপেক্ষা করছি।

কিন্তু আটটা বেজে যেতেই আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারলাম না। এদিকে দ্বাররক্ষক সাধকের কথার মাঝখানে মূর্তিমান বিঘ্নের মত উপস্থিত হয়ে বিরক্ত করবার ইচ্ছেটাও কিছুতে হল না। সুতরাং যেমনভাবে একটু একটু করে দ্বারের ভেতর পর্যন্ত এসেছি তেমনি ভাবেই এবার ভেতরে চলে যাবার জন্যে সংকল্প করে ফেললাম।

যারা সে সময় আশ্রমের ভেতরের দিকে যাচ্ছিল তাদের পেছনে পেছনে আমিও চলতে লাগলাম! ভেবেছিলাম তাদের সঙ্গে গেলেই মা যেখানে দর্শন দিচ্ছেন, একেবারে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

যাচ্ছিলাম সামনের রিসেপ্‌শন্‌ হলের বারান্দা দিয়ে নয়, ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে গায়ে লতা-পাতা ফুলগাছের ভেতর দিয়ে সমকোণ তৈরী করে যে-রাস্তাটা সমাধির দিকে চলে গেছে সেই রাস্তাটা ধরে।

রাস্তাটার মোড়-মাথা পর্যন্ত এসে পড়লাম। সেখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি সাদা পাথরের উঁচু বেদীর ওপর নানা রকমের ফুল সাজানো। বেদীর চারপাশে দাঁড়িয়ে সাধক সাধিকারা ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন, না-কি প্রণাম করছেন বুঝতে পারলাম না। সেই দিকেই দৃষ্টি রেখে পথ চলছিলাম।

কিন্তু আর অধিক দূর আমাকে যেতে হল না।

চারদিক থেকে অমনি 'গেল গেল' 'ধর ধর' 'চোর চোর' রব পড়ে গেল! আর আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম!

সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন জন মালী যারা তখন ফুল গাছে জল দিচ্ছিল তারা ছুটে এসে ব্যাঘ্র যেরূপ পলায়িত শিকারের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, তেমনিভাবে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। তারপর অর্ধচন্দ্র দিতে দিতে আমাকে দরজায় পাহারারত সেই সাধকের কাছে এনে হাজির করলো।

চারিদিকে তখন চোর দেখবার জন্যে ভীড় জমে গেছে। সবারই মুখে 'চোর-চোর' কথাটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল! অনেকে বললেন, দিনের বেলায় এমন দুঃসাহসিক চোর নাকি আশ্রমে কখনো দেখা যায়নি। চোরের বুকের পাটা আছে বলতে হবে!

এক মুহূর্তে কি যে ঘটে গেল আমি যেন তখনো ভাল করে বুঝে উঠতেই পারলাম না! বজ্রাহতের ন্যায় আমি দ্বার-রক্ষী সাধকের পদতলে বসে পড়লাম।

এত যে লজ্জা অপমান, চোর চোর ধ্বনি, কিছুই যেন আমার কানে প্রবেশ করছিল না। আমি তখন শুধু নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম—এমন কিছু কি ক'রে ফেললাম যার জন্যে আশ্রমের মা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন?

মা অসন্তুষ্ট হবেন, আর আমি তাঁর করুণা হতে বঞ্চিত হবো, আশ্রমে আমার থাকা হবে না—এই আশঙ্কাতেই আমি তখন সারা! তা নইলে, সত্যি বলছি, 'এ-সব দুঃখকে কিছু নাহি মানি'—আমার কাছে সে-সময় লজ্জা-ঘৃণা-অপমানের আবেদন নিষ্ফল!

এদিকে সেই সাধক তখন আমাকে অনেক কিছু তিরস্কার করতে সুরু করে দিয়েছেন—তুমি তো আচ্ছা চোর হে। তুমি তো আচ্ছা চোর হে! তোমার বুদ্ধিকে বলিহারী! কখন্ ফস্ করে ঢুকে পড়লে বলো দেখি?······

কিন্তু এখন একটা কথা ভাবি—তিনি আমাকে অমন বাংলা ভাষায় তিরস্কার করছিলেন কেন? তিনি কি তবে এ-দেশীয় তামিল ভাষাটা জানতেন না? অথচ

তামিলদেশ যখন, তখন তো তামিল-চোর হওয়াই স্বাভাবিক? তাদিকে বাংলা ভাষায় তিরস্কার করলে মনের ঝাল মিটে বটে, কিন্তু তাতে চোরের কি?

তিনি কিন্তু সমানে ব'লে চলেছেন—এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে শেষকালে কোন্ ফাঁকে টুক্ করে ঢুকে পড়লে বলো দিকি? এ্যাঁ, তোমার সাহস তো কম নয়? কী মতলবে যাচ্ছিলে শুনি—চুরি করতে? তুমি তো আচ্ছা চোর হে?

তবু বলবো, আমার সেদিন ভাগ্য ভাল ছিল যে, সে-সময় সেখানে একজন বাঙালী দ্বার-রক্ষক ছিলেন! তা না হলে একজন অবাঙালী মানুষকে সেই অবস্থায় আমার অন্তরের সব কথা ব'লে বিশ্বাস করাতাম কি ভাবে?

প্রকৃতই আমি তো অপরাধী? তাই তাঁর একটি কথারও উত্তর না দিয়ে এতক্ষণ আমি চুপ করে সকল তিরস্কার শুনেই যাচ্ছিলাম। অবশ্য কি উত্তর দেব —তা যেন আমি খুঁজেও পাচ্ছিলাম না, যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম তখন। এই কারণেও চুপ করে ছিলাম।

কিন্তু তিনি বার বার ঐ কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—কেন যাচ্ছিলে বল দেখি? কি করতে যাচ্ছিলে? আমি তাই তখন হাত জোড় করে নিবেদন করলাম—কেন যাচ্ছিলাম শুনবেন? আপনি দয়া করে আমার সব কথা তাহলে শুনুন…

আমার মুখে বাংলা কথা শুনে তিনি নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। একেবারে চমকে উঠলেন—এ্যাঁ, তুমি বাঙালী নাকি?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালী।

—তা তো আগে বলোনি?

—বলি কি করে, বলবার যে আমি সুযোগই পেলাম না?

—কিন্তু না বলে আশ্রমে ঢুকছিলে কেন?

—সব বল্‌ছি, দাঁড়ান। একটু ভাল করে বসি। মাথাটা আমার ঘুরছে!

তারপর একটি একটি করে সব কথা শোনালাম: গতকাল ষ্টেশনের সেই ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করে মায়ের দর্শনের জন্যে আমি কতখানি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম এবং আটটা বেজে যেতেই কেন স্থির থাকতে পারিনি? বললাম আশ্রমের নিয়ম-কানুন আমি তো কিছুই জানিনে, তাই এরকম করে ফেলেছি—আপনারা আমায় মাপ করুন।

সেই সাধক বললেন—কিন্তু আমি তো এখানে বসেছিলুম, তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না কেন?

ওটাই আমার দোষ হয়ে গেছে। আপনি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করল না।

—তাই বলে তুমি না বলে ঢুকে পড়বে?

—কি জানেন, আমি দরজার বাইরে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম, তারপর দরজার ভেতরে ঢুকেও আধ ঘণ্টা দাঁড়ালাম—আমাকে কেউ কিছু নিষেধ করলে না; এমন কি আপনিও কথা বলতে বলতে অনেকবার আমাকে লক্ষ করেছেন. কিন্তু কিছু বলেন নি। তাই ভাবলাম, সবাই বোধহয় ভেতরে ঢুকতে পারে। আর তাতেই আমি সাহস পেয়ে গেলাম।

—ব্যাস্ অমনি ঢুকে পড়লে আশ্রমে? তুমি তো আচ্ছা চোর হে!

সেই সাধক আরো রেগে উঠলেন।

আমি তখন হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে। মনে হয়, তার এই দ্বার-প্রহরীর জীবনে আমার মত কেউ তাঁকে এমন ক'রে কখনো ফাঁকি দেয়নি? আবার কি, তিনি নিজে আমাকে ধরতেও পারতেন না। কারণ কখন্ আমি অতদূর চলে গেছি তা তিনি কথা বলতে বলতে লক্ষই করেননি। বাগানের মালীরা এবং অন্য লোকেরা চোর চোর বলে চেঁচিয়ে না উঠলে তিনি হয়ত টেরই পেতেন না।

সে যা হোক, চোরের মুখে বাঙলা কৈফিয়ৎ শুনে আমাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন না, যাঁরা ভিড় করেছিলেন একে একে তাঁরাও সরে পড়লেন। আমি তখন সেই সাধককে বললাম—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মাথার ঠিক রাখতে পারিনি, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।

এই কথায় তিনি একটু শান্ত হলেন। সহানুভূতির স্বরে বললেন—তা আশ্রমে এসেছ কেন? মায়ের দর্শন করতে?

—দর্শন করতে তো বটেই। কিন্তু শুধু তো দর্শন করা নয়, আমি আশ্রমে থাকতে চাই। কেন দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, কেন মথুরা বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না, কেন শেষে পণ্ডিচেরী চলে আসতে বাধ্য হলাম সব কথা তাঁকে বললাম।

কিন্তু একবার চোর নাম রটে গেলে কি ও-কলঙ্ক সহজে ঘুচতে চায়? আমি যা বলি তাতেই তিনি সন্দেহ করেন, আমার সকল কথা-ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে চান। তিনি জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তোমার এরকম অবস্থা হল কেন? তোমার কাপড়-জামা কি করলে? বললাম—রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি।

এর বেশি আর কিছু মুখে এল না। তাঁকে স্পষ্ট কথায় বলতে পারলাম না যে, জামা-কাপড় সব ত্যাগ করে আমি সন্ন্যাসী হয়েছি। কিন্তু যে-কথা তাঁকে

বললাম তাতে যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে, তথা আশ্রমবাসের পক্ষে আরো মুস্কিল হবে সে-বুদ্ধিও কি আমায় ছিল না?

সত্যিই তা-ই হল। প্রশ্ন কর্তা ভেবে নিলেন—হয় আমি মিথ্যা কথা বলেছি আর না-হয় আমি পাগল, কাপড়-জামা ভাল লাগে না বলে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি। দু'দিক থেকেই আমি আশ্রমবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত—ডিস্‌কোয়ালিফায়েড্!

তাই তিনি বললেন—কাপড়-জামা রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছ? এ কিরকম কথা?

—আহা! বুঝলেন না, বিনা টিকিটে আসতে হলে কি কাপড় জামা প'রে ভদ্রলোক সেজে আসা চলে?

—কিন্তু বিনা টিকিটে তুমি আসতে গেলে কেন?

—এতক্ষণ ধরে সেই কথাই তো আপনাকে বললাম: বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে বৃন্দাবনে বাস করবার জন্যে গেছলাম, কিন্তু সেখানে আমি থাকতে পারলাম না—সাধু সাজতেও পারলাম না—এমনকি কোন মঠে আশ্রমেও থাকতে পাবলাম না। কেননা শ্রীঅরবিন্দ আগে থেকেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

—তাহলে তুমি সোজা দেশে চলে গেলে না কেন?

—দেশে কার কাছে যাব? সংসারে একমাত্র আশ্রয় ছিলেন মা। সেই মা-ও দেহরক্ষা করেছেন। দেশে থাকতে না পেরেই তো বৃন্দাবন গেছলাম?

—তোমার দেশ কোথায়? দেশে কি করতে?

বললাম দেশের নাম। কলকাতায় পড়াশুনা করছিলাম সেটাও জানালাম। আমাদের দেশের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে বুঝলাম। কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন করলেন—তোমার দেশে কোন পাঠমন্দির আছে?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বললেন—পাঠমন্দিরের অধ্যক্ষের নাম কি?

ডাক্তারবাবুর নাম বললাম।

তিনি শুনে বললেন—তুমি তাহলে চৌধুরীকেও তো চিনবে যাঁর কলকাতায় বইয়ের দোকান আছে?

—তিনি তো আমাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়। তাঁর বইয়ের দোকানের নামটাও বলে দিলাম। সব শুনে তিনি আরো খানিকটা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন করতে ছাড়লেন না। বললেন—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়: তুমি তো বৃন্দাবনে থাকতে না পেরে পণ্ডিচেরী এলে, কেমন?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, পণ্ডিচেরী আশ্রমই যে তোমাকে স্থান দেবে তার তো কিছু নিশ্চয়তা নাই! বাস্তবিকই নাই। তোমার এই বেশে মা তোমাকে অনুমতি যদি না দেন তাহলে তুমি কি করবে? তাহলে তো এবার দেশে ফিরতেই হবে।

বললাম—না। এ-চিন্তাও বৃন্দাবন থেকে আসবার সময়ই করে এসেছি। মা যদি এখানে থাকতে না দেন তাহলেও দেশে ফিরব না। এবার হিমালয়ের কাছাকাছি কোথাও চলে যাব, সেখানে গিয়ে জীবিকার জন্যে যাই হোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে—হয়তো সাধু-সন্ন্যাসীর বেশই নিতে হবে। তবে যা-ই করি না কেন, 'মা-শ্রীঅরবিন্দকে' ছাড়তে পারব না।

তারপর সেই সাধকের পা জড়িয়ে ধরে বললাম—কিন্তু আপনি অমন অমঙ্গল কথা বলছেন কেন, মা অনুমতি দেবেন না? আমি যে কত আশা নিয়ে কত কষ্ট করে এসেছি তা তো শুনলেন? আমি ভুল বলেছি, হিমালয়-টিমালয় কোথাও আমি আশ্রম ছেড়ে যেতে পারব না! আপনি কৃপা করে আমার সব কথা মাকে জানান। আপনি আমায় কৃপা করুন। আপনার কৃপা হলেই মায়ের কৃপা লাভ হবে।

তিনি বললেন—ছাড়ো ছাড়ো, দেখছি আমি চেষ্টা-চরিত্র করে কি করা যায়। তুমি তাহলে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, তোমার বিষয় নিয়ে আমি আগে সেক্রেটারী নলিনীদার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করি, তারপর তোমাকে জানাব।

তিনি গেটে একজনকে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন, আর আমি বাইরে এসে ছোট দেবদারু গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল—যাক্, আজ একটা বিষয়ের চরম মীমাংসা হয়ে গেল! বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত আশ্রম-বাস এবার আমার ভাগ্যে ঘটতে যাচ্ছে। এই সুখ-চিন্তায় এক অপার আনন্দে ভাসতে লাগলাম!

[ছয়]

এমন ক্ষেত্রে যে-অবস্থাটা ছিল অতি স্বাভাবিক, সে-সময় আমার মন ছিল তার বাইরে, অর্থাৎ মায়ের অনুমতি 'কখন পাব, কখন আসবে' ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম না। লাগুক না কতক্ষণ সময় লাগবে—একঘণ্টা দু'ঘণ্টা, একদিন দু'দিন? আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। ধীর স্থির হয়ে মাকে প্রার্থনা করতে লাগলাম।

কিন্তু একটু পরেই, বোধহয় দশ মিনিটও নয়, সেই সাধক আমার কাছে ফিরে এলেন।

তাকে দেখা মাত্রই অন্তরটা ধক্ করে উঠল—যেন ভবিষ্যতের জ্ঞান এসে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম কি ঘটতে যাচ্ছে!

অথচ কাল রাত থেকেই অন্তরকে উন্মুখ করে রেখেছিলাম যাতে আশ্রমে থাকা হবে কি হবে না—আগে থেকে জানতে পারি। কিন্তু কোন কিছুই পাইনি। আমার স্থির বিশ্বাস সবরকম সম্ভবনাই খোলা ছিল আমার সত্তার কাছে।

কিন্তু এখন তাঁকে দেখেই আমি মনে মনে বলে উঠলাম—এত তাড়াতাড়ি উনি ফিরে এলেন খবর নিয়ে? এরই মধ্যে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আমার সব কথা বলা হয়ে গেল, আর আমার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত 'না' এসে পড়ল? নিশ্চয় মাকে জানানোই হয়নি!

কি করে বলব ব্যাপারটাকে? এখন এসব ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে অর্থ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা নইলে সে-সময় আমি খোলা চোখে দেখতে পেলাম মানুষের বিরোধিতার কাছে ভগবানও পরাস্ত হয়ে গেলেন!

সেই সাধক কাছে এসে আমাকে জানালেন—তুমি যেভাবে এসেছ ঠিক সেই ভাবেই আবার তোমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে।

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়ি, কানে শুনেও যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা—ঘরে ফিরে যেতে হবে?

তিনি এবার দৃঢ়স্বরে বললেন—হ্যাঁ, এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, নলিনীদাকে বলেছি। তিনি বললেন, শ্রীমা এরকম অশান্ত অধৈর্য যুবকদের পছন্দ করেন না।

'শ্রীমা পছন্দ করেন না'?—স্বপ্নাবিষ্টের মত আমিও তাঁর কথাটা উচ্চারণ করলাম। আমি যেন সাংঘাতিকভাবে একটা বৈদ্যুতিক শক্ খেলাম!

তিনিও আবার পুনরুক্তি করলেন—হ্যাঁ, শ্রীমা এ রকম পছন্দ করেন না। তোমাকে আবার ঘরেই ফিরে যেতে হবে। ঘরে গিয়ে বি এ. পাশটা অন্ততঃ শেষ ক'রে মায়ের অনুমতি নিয়ে আবার তখন এসো। মা তখন তোমাকে আশ্রমে থাকবার অনুমতি দেবেন।

একটা কথা কিন্তু এখানে লক্ষ্য করবার মত—তিনি আমাকে বললেন না যে, তুমি ডিস্‌কোয়ালিফায়েড্, আশ্রমে থাকবার অযোগ্য। মা তাই তোমাকে আশ্রমে থাকতে দেবেন না। তিনি শুধু বললেন—'শ্রীমা এরকম পছন্দ করেন না।'

যদিও অন্য লোকের কাছে কথা দুটোর একই অর্থ, তবুও আমার চেতনার কাছে ঐ কথাটা নূতনরকম প্রতিক্রিয়া সুরু করল সে-সময়। হ্যাঁ, সেই কঠিন কথা শুনে আমার প্রাণ আর্তস্বরে কেঁদে উঠেছিল ঠিকই—খুব কেঁদেছিল, পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল, কিন্তু তবু কদলী বৃক্ষের মত একেবারে ভূতলশায়ী হয়ে পড়েনি।

পড়েনি সে শুধু ঐ কথাটুকুর জোরে! 'শ্রীমা এরকম পছন্দ করেন না' শোনামাত্রই আমার আবেগধর্মী মন-প্রাণ এ-পথে যতখানি এগিয়ে এসেছিল, ঠিক ততখানিই আবার পিছিয়ে গেল। শ্রীমা যা পছন্দ করেন না আমি তাই করে এসেছি এতদিন? কেন এমন পূত-পবিত্র আস্পৃহার বৃক্ষে এই কুফল ফললো?

সত্যসত্যই আমি তৎক্ষণাৎ আবার ঘরে ফিরে যাবার জন্য মনকে তৈরী করে ফেললাম। এ যে আমার সেই পরিস্থিতির পক্ষে, দেহ-মন-প্রাণের একরোখা জেদের পক্ষে কত বড় কঠিন কাজ তা বোধ হয় অন্য কেউ জানলো না। জানলেন শুধু অন্তর্যামী ভগবান যিনি এমন অঘটন ঘটালেন সেদিন।

আহা! মায়ের কী অপরিসীম করুণা! লোকে অনেক আশ্চর্য ঘটনা দেখে তবে মায়ের কৃপার তারিফ করে। কিন্তু এখন বলতে ইচ্ছে করে—সেদিনের সেই ছোট্ট ঘটনাটা মায়ের অনেক বড় কৃপার নিদর্শন! এমন অবস্থায় লোকে আত্মহত্যা করে ফেলে, সমস্ত উচ্চ ও শুভ আশা ছেড়ে দিয়ে অতি সাধারণ জীবনে গিয়ে পড়ে। আর না-হয় মাতৃ-দ্বেষী হয়ে মায়ের প্রতি অভিমানে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। ঐ-সবই হত মায়ের কাজের পক্ষে বিঘ্ন-স্বরূপ। পরন্তু মায়ের কী করুণা, আমার প্রাণ-অশ্বের একটা সুদৃঢ় খেয়ালকে এক মুহূর্তে কত সহজে বদ্‌লে দিলেন?

বলেছি, তার আগে পর্যন্ত মনে মনে স্থির সংকল্প ক'রে রেখেছিলাম, কোনো কারণেই আর দেশে ফিরে যাব না; যদি আশ্রমে স্থান না হয় তবে আমি আবার বৃন্দাবনে কিংবা হিমালয়ের দিকে কোথাও চলে যাব! কিন্তু এখন এই কথা শুনে

ঘরের দিকে মন ফিরে গেল। এতদিন ঘর-বাড়ি, বন্ধু-আত্মীয়, সমস্ত চিন্তা যেন মন থেকে মুছে গিয়েছিল। স্বপ্নেও কখনো যে-সবের কথা উদিত হত না; এখন আমি সেই মন নিয়েই আবার ঘরে ফেরবার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

মনে মনে বললাম—ভুল, এ-সব ভুল! এতদিন যা আমি ক'রে এসেছি—এই এত ক্লেশ ভোগ, এতদূর পর্যটন, এত আকুল প্রয়াস—সব ভুল! এ-সব যখন আমার দেবতার কোনো কাজেই লাগল না তখন এ-সব ভুল ছাড়া আর কি? শ্রীমা যা পছন্দ করেন না, আমি কি তেমন কিছু করতে পারি?

আশ্রমে থাকবার জন্যে মায়ের অনুমতি ক'রে দিতে পারলেন না ব'লে সেই সাধকের উপরও কোন অভিমান বা বিদ্বেষ এলনা আমার মনে। কারণ অভিমান করবো কিসের জন্যে? তাঁরা কি করবেন? তাঁরা তো মায়েরই আজ্ঞাবহ মাত্র। যে-মায়ের চক্ষু-কর্ণ সর্বগামী, যাঁর অস্তিত্ব সর্বব্যাপী, সেই সর্বজ্ঞ মা কি আমাকে দেখতে পাননি; আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, তাঁরই আশ্রম-দ্বারে এ-সকল লাঞ্ছনা তিনি কি জানতে পারেন নি? যদি আমাকে অনুমতি দেবার মনে করতেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি নিজে হোক, অন্য লোক মারফৎ হোক সেইরকম ঘটনাই যে ঘটিয়ে দিতেন; এবং আমাকেও দিতেন সেই ব্যবস্থার অনুকূল জ্ঞান-বুদ্ধি-কর্তব্য? তিনি যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন, যত আড়ালেই থাকুন, আমার অবস্থা তিনি ঠিকই দেখে নিয়েছেন এবং যা ব্যবস্থা করবার তা-ও তিনি ঠিকই ক'রে রেখেছেন।

এর পরে যে-ঘটনাটি ঘটলো সেটি আবার আরো অস্বাভাবিক! সেই সাধককে বললাম—কিন্তু আমার যে বড় ক্ষুধা লেগেছে? কতদিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে না স্নান ক'রে এখানে এসেছি। শুধু ভেবেছি একবার আশ্রমে পৌঁছুতে পারলেই সব যন্ত্রণা সব ভাবনার অবসান হবে। আমি যে দু'হাত তুলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম! কিন্তু এখন আমি কেমন ক'রে যাব আবার অতখানি পথ? উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, চোখে অন্ধকার দেখি—আবার দেশে কিভাবে ফিরে যাবো? বলেইছি তো সে-সব কথা আপনাকে—বিনা টিকিটে আসার জন্যে পথে একমাস জেল খাটতে হয়েছে। আবার সেই বিনা টিকিটে কি ক'রে যাবো?

তিনি বললেন—যেতেই হবে! আমি কি করবো? যেমন কর্ম করেছ তেমনি তার ফল ভোগ করতেই হবে! তুমি বরং এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে কিছু খাবার দিচ্ছি, নিয়ে চলে যাও।

তাতেই আমি রাজী হয়ে গেলাম। বৃহৎ প্রাপ্তির বিনিময়ে শুধু একমুষ্টি অন্নতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

তবুও মনটা একবার কেঁদে উঠল, তাঁকে বললাম—এতদূর থেকে এসে এমন দ্বারের কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছি, একটিবার মায়ের চরণ দর্শনও কি ঘটবে না? এ যে আমার বহুদিনের সাধ!

তিনি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন—না। মায়ের দর্শনও তুমি পাবে না! একদিন থাকতে পারবে? আজই তো তোমার খাবার না হলে চলছে না—চোখে-কানে দেখতে পাওনি বলছ—তবে কাল পর্যন্ত তুমি থাকবে কি করে? তার চেয়ে যা বলি শোন—এই খাবার নিয়ে এখুনি সোজা তুমি ষ্টেশনে চলে যাও। কখন্ ট্রেন পাও দেখগে যাও…

তার রাগ দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে যাই! এই একটু আগে যে মানুষ ভেবেছিল মায়ের অনুমতির জন্যে একদিন দু'দিন অপেক্ষা করে থাকবে, তারই এখন সাহসে কুলাল না!

আমি চললাম তাঁর পিছু পিছু ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে।

আশ্রম বাড়ির ঠিক পেছনের ব্লকের বাড়িগুলোর মধ্যে তাঁর ঘর পড়ল। দরজার সামনে বড় রাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটা কাগজে মুড়ে দু'টি পাতলা স্লাইস্ রুটি আর দু'টি কলা এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন—আর কোথাও দাঁড়িয়ে থেকো না, সোজা ষ্টেশনে চলে যাও।

বিদায়কালে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বললাম—আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন যেন মায়ের কৃপা লাভ করতে পারি!

তিনি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বলছি—তুমি পাবে মায়ের কৃপা!

তারপর আমি যতক্ষণ না আশ্রম ছেড়ে চলে গেলাম ততক্ষণ তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন আমি ঠিক চলে যাচ্ছি কিনা।

আবার সেই পথ। আবার সেই ঘরে ফিরে যেতে হবে—যা একদিন নিদারুণ ভয় করেছিলাম!

কিন্তু আবার আমি কেমন ক'রে ট্রেনে উঠবো? আর কি সেই মনোবল আছে আমার? তারপর বাড়িতে গিয়েই-বা বলবো কি? কাউকে তো জানিয়ে আসিনি আসবার সময়! আজ আবার সাত-আট মাস পরে কি ক'রে গিয়ে উঠবো সেখানে?

দোষ আমি করিনি কোথাও—নিজের কাছেও নয়, অপরের কাছেও নয়।

তবু তো সত্য কথাটাও কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারব না? আর মিথ্যে ক'রে যা হোক একটা কিছু সাজিয়ে বলতেও পারব না! এক সঙ্গে হু-হু করে এত সব চিন্তা এসে পড়ল মাথার মধ্যে। মনে হল, শরীরে আমার এতটুকু শক্তিও নাই। আমি যেন অনেক কাল পরে রোগ শয্যা থেকে এইমাত্র উঠে এসেছি!

তবুও তো আমাকে যেতে হবে? সেই অবস্থায় টলতে টলতে কটি-কলা কাগজের পোঁটলায় তিনি যেমন দিয়েছিলেন তেমনিভাবে হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে আশ্রম থেকে ডাইনিং রুমের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। ডাইনিং রুম পার হয়ে পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এমন অবস্থা হল যে, আমি যেন আর এক পা-ও হাঁটতে পারছি না। শেষে বর্তমানে যেখানে ষ্টেট লেজিস্‌লেটিভ হাউস, সেখানটার সোজাসুজি রাস্তার পাশে পার্কের একটা গাছতলায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লাম।

এবার আর নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না। এতক্ষণ যা করতে পারিনি লোক-লজ্জার ভয়ে, এবার তাই সহজে ক'রে ফেললাম—সেইখানে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম! হে প্রভু! আমি কেমন ক'রে আবার এত খানি পথ যাবো? এ-যে সেই সাত-সাগরের তের নদী পারের পথ! কেমন ক'রে পার হবো বিনা কড়িতে?

এমনি সময় একজন যুবক আশ্রম ডাইনিং রুমের দিক হতে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে তিনি রাস্তার মাঝখান থেকে পার্কের ধারে এসে আমার কাছে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন। নেমে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কিন্তু তিনি কি বললেন, আমি তাঁর একটা কথাও শুনতে পেলাম না। আমি তখন কেঁদে আকুল, কানে আমার কোনো কথাই গেল না।

অথচ স্পষ্টভাবে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার জন্যেই সেখানে নামলেন। কিন্তু আমি যখন আমার সমস্ত চেতনাকে একত্রিত ক'রে কোনরকমে উঠে বসে তাঁর দিকে চেয়ে 'এ্যাঁ' ব'লে উত্তর দিলাম, তখন তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন; কিংবা কেউ যেন সেখান থেকে ইঙ্গিত ক'রে তাঁকে কিছু বলছেন, আর তিনি তাই শোনবার জন্যে সেদিকে তাকিয়ে আছেন—এমনি মনে হল। আর তারপরই আমাকে কিছু না ব'লে পুনঃরায় সাইকেলে চড়ে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেই ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেলেন।

ঘটনাটা এতই দ্রুত, এমনই অসতর্ক মুহূর্তে ঘটে গেল যে, আমার কিছুই আর

করবার রইলো না। অথচ কেন জানিনা আমার অন্তর 'হায় হায়' ক'রে উঠল! অনুভব করলাম—জীবনে আর একটি সুযোগ হারিয়ে ফেললাম! হয়তো আমার ব্যাপারটা আশ্রমের মধ্যে কানাকানি হয়ে যেতে আশ্রমের কেউ, কিংবা স্বয়ং মা-ই হয়তো কাউকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমার এ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখেই যিনি এসেছিলেন তিনি চিনতে পারলেন না! একটু উঠে যে তাঁকে খোঁজ করে দেখবো কিংবা আর একবার আশ্রমে ফিরে যাবো—সেরকম মনোবলও আমার নাই। তাছাড়া সেই সাধক আমাকে ফিরে আসতে দেখে পাছে কিছু বলেন সে-ভয়টাও আছে!

তাই সেইখানে পড়ে পড়েই মথুরা জেলের ঘটনাটা চিন্তা করছিলাম: সেই শ্বেত শ্মশ্রু-গুম্ফযুক্ত বৃদ্ধ কয়েদী বলেছিলেন আমার হাত দেখে—তোমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। সেদিন তার কথাটা বিশ্বাস করিনি, দম্ভ ভরে বলেছিলাম—নো এ্যাণ্ড নেভার! কিন্তু আজ তাঁর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

এই কিছুদিন পূর্বে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম: একজন আত্মীয় আমার হাত দেখে বলছে—ওঃ, হাত বটে একখানা! এক'শ টাকা ধরলে এক টাকা হয়ে যায়। অর্থাৎ, লোকে ধুলোর মুঠি ধরলে সোনার মুঠি হয়, আর তুমি সোনার মুঠি ধরলে ধুলোর মুঠি হয়ে যায়—একশ' টাকা ধরলে এক টাকা হয়ে যায়! তার কথা শুনে আমি একটুও দুঃখিত না হয়ে বলেছিলাম—তুমি আর বেশি কি বলবে? আমার ভাগ্যের কথা আমি ভালভাবেই জানি। তাই ভাগ্যের কাছ থেকে বড় কিছু আশাও রাখিনি, তাকে গ্রাহ্যও আমি করিনি। কিন্তু ডিভাইন গ্রেস্? সেখানেও কি একশ' টাকা ধরলে এক টাকা হয়ে যায়? সেদিন স্বপ্নের মধ্যেই 'ডিভাইন গ্রেস, ডিভাইন গ্রেস' উচ্চারণ করতে করতে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছিলাম।

সত্যি সত্যিই আজ আমার একশ' টাকা ধরে এক পয়সা হয়ে গেল—সোনার মুঠি ধরে ধুলোর মুঠি হয়ে গেল!

কিন্তু যত দুঃখ বাধাই থাক, অনেকক্ষণ সেখানে পড়ে থেকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তবু আবার উঠে দাঁড়ালাম। মনে পড়ে গেল গুরুদেবের সেই সুদৃঢ় অভয়বাণী: 'আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি, তুমি আমার!'

তবে আমার ভয় কি? আমি যেখানেই থাকি না কেন গুরু তো আমার সঙ্গেই আছেন! আবার বুকে বল এল। পার্ক থেকে আবার ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে করতে একসময় গাড়ী এসে পৌঁছলো। একটু ভয় ভয় করে একটা খালি কামরাতে উঠতে যাব এমন সময় শ্রীমায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মনটা আমার বড় ব্যথায় আবার টন্ টন্ করে উঠল! আহা, এ হেন স্বর্গ যেখানে স্বয়ং শ্রীমা আছেন, তা ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হবে? মনে হচ্ছিল, এ-সব ঘটনাগুলো যেন একটুও সত্য নয়, সত্য নয় মায়ের রাজ্য ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়া, সত্য নয় এই ট্রেনে ওঠা!

পরন্তু বাস্তব ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে দিল যে, এর চেয় বড় সত্য আর নাই। ট্রেন ছাড়বার শেষ হুইসেল পড়ে গেল। আর তো দেরী করলে চলবে না? ট্রেনে ওঠার আগে পণ্ডিচেরীর পবিত্র ধুলি সর্বাঙ্গে মেখে মনে মনে বললাম—যদিও সেই সঙ্গীন মুহূর্তে অমন কাব্য করে বলার মত অবস্থা ছিল না, তথাপি ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলাম যা কবির ভাষা দিয়ে বললে এই হবে:

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে দিবস গেল বয়ে,
তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি।
অন্তরে যা দেবার ছিল মিলেছে এক হয়ে,
চরণে তব গোপনে তার গতি।

পণ্ডিচেরী থেকে মাদ্রাজ।

এতটা পথ কিভাবে পার হয়ে এলাম আজ আর মনে নাই। শুধু মনে আছে মাঝখানে চিঙ্গেল পেট ষ্টেশনটার কথা। মাঝ-রাত্রে চিঙ্গেল পেট ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়েছিল। সেই রাত্রে আর গাড়ী পেলাম না, রাত্রিটা ষ্টেশনেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতে প্ল্যাটফর্মের একটা ফাঁকা জায়গায় এমনভাবে বসেছিলাম যে সূর্য উঠলেই দেখতে পাব, গায়ে রোদ এসেও লাগবে।

কিন্তু রোদ উঠতেই কোথা থেকে একদল যাত্রী এসে হুড়মুড় করে আমার চারদিক আড়াল করে দাঁড়াল। চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম, কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু অনুভবে বুঝতে পারলাম তারা তারপর আমার আশে পাশেই বসল।

তা বসুক। ষ্টেশনের বারোয়ারী জায়গা, যেখানে খুশী বসুক তারা। তাতে আমার কি? কিন্তু হঠাৎ সবাই চুপ-চাপ হয়ে গেল কেন? আসরের গান আরম্ভ হবার আগে বাদকদের হাতের স্পর্শে কিংবা যন্ত্রের ঠোকাঠুকিতে যেমন একটু টুং টাং আওয়াজ হয়, তেমনি এখানে ওখানে একটু আধটু হু-হু হি-হি ফিস্

ফাস্ শব্দ ছাড়া সমস্ত জায়গাটা যেন কোন্ যাদুবলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে!

ব্যাপার কি? এতগুলো মানুষ এল, অথচ তাদের সাড়াশব্দ নাই কেন? কি করছে তারা? চোখ খুলতে হল।

চোখ খুলতেই দেখি, একদল স্ত্রীলোক যাত্রী আমার চারদিকে গোল পাকিয়ে বসে আমার বেশ-বাস দেখছে আর মুখে কাপড় দিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। আমি চোখ মেলতেই তাদের হাসির বহর দারুণ ভাবে বেড়ে গেল—হো-হো, হি-হি হাঃ-হাঃ!

বৃন্দাবন থেকে বেরিয়ে অবধি এধন অবস্থায় আর কখনো পড়িনি, এমন লজ্জাও কখনো পাইনি! এতদিন দেহের বোধই ছিল না। কাজেই লজ্জা থাকবে কি করে?

এগমোর ষ্টেশনেও এমনি আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। এগমোর থেকে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে যাচ্ছিলাম কলকাতার ট্রেন ধরতে। কিন্তু আর হাঁটতে পারছিলাম না। ক্ষুধায় আমি অতিশয় কাতর। পথের ধারে একটা পার্ক পড়ল। পার্কের মাঝখানে পানা-ঢাকা মস্ত একটা পুকুর, সেই পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, কি করা যায়? এখানে কার কাছে খাবার চাইব? কে দেবে আমাকে খাবার?

চিন্তা করতে করতেই দেখি—নলরাজা যেমন বনমধ্যে বস্ত্র ছেদনের ইচ্ছামাত্রেই শনি স্বয়ং ছেদক-যন্ত্র হয়ে সেখানে দেখা দিয়েছিলেন, তেমনি খাদ্য-অন্বেষণ মাত্র আমারও সামনে একজন রহস্যময়ী স্ত্রীলোক হঠাৎ এসে উপস্থিত হল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সাদা পুরু কাপড়ের ঘাঘরা, মুখটি আর হাত দু'টি মাত্র খোলা। বাঁ-কাঁকালে বিরাট একটা ঝুড়ি। সেটার মধ্যে কি আছে দেখবার উপায় নাই। সেটাও কাপড় দিয়ে ঢাকা।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের কথা হল—সেই অপরিচিত স্ত্রীলোকটি কেমন ক'রে জেনে ফেললো আমার মনের কথা—আমি খাদ্যবস্তু চাই, অথচ ভিক্ষা করতে পারি না? কেউ যদি আমাকে দিয়ে দয়া ক'রে কাজ করিয়ে নিয়ে তার বিনিময়ে কিছু খাবার দেয়, তাহলে আমি নিতে পারি?

স্ত্রীলোকটি আমার সামনে ঝুড়ি নামিয়ে রেখে কী সব বললে। আমি তার ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। তাকে আমি হিন্দীতে বললাম—তুমি হিন্দী জানো?

স্ত্রীলোকটিও তেমনি আমার কথা বুঝতে পারলো না। তবে আমার চেয়ে

তার বুদ্ধি বেশি ; অনেক দূরে একটা বেঞ্চের ওপর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে সেখানে যাবার কথা বললে।

ভদ্রলোকটি হিন্দী জানতেন। স্ত্রীলোকটির কথা আমাকে তিনি হিন্দীতে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি এই বোঝাটি বইতে পারছেন না, তুমি যদি বয়ে দাও তো তোমাকে কিছু পয়সা দেবেন।

স্ত্রীলোকটি অদূরেই একটা বস্তির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—ওই ওখানে নিয়ে যেতে হবে।

আমি রাজী হয়ে গেলাম। ঐ কাজের জন্যে কত পয়সা দেবে তা-ও আমি জানতে চাইলাম না। স্ত্রীলোকটি নিজেই আমাকে বললে—ডান হাতটা সামনে তুলে ধরে পাঁচটা আঙ্গুল দেখালে। অর্থাৎ পাঁচ আনা দেবে পারিশ্রমিক।

পাঁচ পয়সা দিলেও আমি তখন রাজী হয়ে যেতাম, তার জায়গায় তো পাঁচ আনা! আমি কাজ করতে চাইলেই আমাকে কাজ দেবে কে? চেনা নেই, জানা নেই, অপরিচিত একজন পথের মানুষকে ডেকে কাজ দেওয়া—এ যে আমার সৌভাগ্য! আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম!

স্ত্রীলোকটি সেই বড় হেটো ঝাঁকাটা আমার মাথায় তুলে দিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

তারপর পথ চলছি তো চলছিই। আমাকে আঙুল দিয়ে দেখালে বটে সামনের ওই ঘরগুলো, অথচ সেই ঘরগুলো ছাড়িয়েও অমন কত দূর চলে এলাম, তবু পথ আর শেষ হয় না!

মনে মনে ভাবি—তা আর কি হবে? কাজটা যখন ঘাড়ে নিয়েছি তখন দূরে হোক কাছে হোক শেষ তো করতে হবে! আমি হয়তো ভুল বুঝেছি। হয়তো ঐ ঘরগুলো পার হয়ে আর একটু পথ গেলেই হবে। মানুষের মুখের কথা একটু আধটু কম বেশি অমন হয়েই থাকে।

কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। আমার মাথার সেই ঝাঁকাটা থেকে কিসের রস গড়িয়ে পড়তে লাগলো আমার গায়ে। ভাবি, স্ত্রীলোকটির অত বুদ্ধি, অথচ এটুকু আর তার হুঁশ হল না যে, আমার মাথায় একটা কাপড় দিয়ে দেয়? তাহলে তো রসটা গড়িয়ে আমার গায়ে পড়ে না?

অবশ্য সেই অসুবিধের কথাটা আমিও তাকে বলতে পারলাম না। তাহলে হয়তো একটা ব্যবস্থা করে দিত। বললাম না এই কারণে যে, আমি সব সময়ই আশা করছিলাম—এই বুঝি গন্তব্যস্থানে আমরা এসে পড়লাম! আবার কতক্ষণের

জন্যেই বা কাপড় চাওয়া, বিলম্ব করা? এটা তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই পসয়া নিয়ে চলো যাবো, তারপর সেই পুকুরটাতে গিয়ে গা-হাত-পা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেললেই হবে।

কিন্তু পথ যে শেষ হতে চায় না! আমার মনে হল—গোটা মাদ্রাজ শহরটাই যেন ঘুরে ফেললাম, তবু তার উদ্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছুতে পারলাম না!

এদিকে ঝাঁকা থেকে রস গড়িয়ে গড়িয়ে মাথার চুল জব্‌জবে হয়ে ভিজে গেছে। তারপর মাথা ছাপিয়েও সেই রস ঘাড় বেয়ে গাল বেয়ে বুকে পেটে কোমরে পিঠে এসে পড়ছে। মাথায় রয়েছে ভারি ঝাঁকা, একটু দেখবারও উপায় নাই! কিসের রস কে জানে? অসংখ্য বড় বড় মাছি সেই রস খাবার লোভে এসে বসছে আমার গায়ে, আর রস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ে তীব্র হুল বিঁধিয়ে দিচ্ছে!

আমি অস্থির হয়ে উঠি মাছির কামড়ে। কখনো-বা এক হাতে ঝাঁকা ধরে অন্য হাতে মাছি তাড়াই। কিন্তু সেই ফাঁকে অন্যদিকে কামড়ে অস্থির ক'রে তোলে। আবার কি, যেখানে গায়ের রসগুলো হাওয়াতে শুকিয়ে যাচ্ছে, সেখানে গায়ের চামড়াতে এমন অসম্ভব টান ধরছে যে সে-ও আর এক অস্বস্তিকর অবস্থা! নরক যন্ত্রণা আর কাকে বলে?

কি ক'রে যে তখন এসব সহ্য করেছি এখন ভাবতে অবাক লাগে! পথ চলতে চলতে এক-একবার ভাবি—ধ্যেৎ! কাজ নাই আমার পাঁচ আনা পয়সাতে! যার ঝাঁকা তাকে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু আবার ভাবি—এতদূর কষ্ট ক'রে এলাম, কে জানে হয়তো এতক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি এসে গেছি! আরও একটু না হয় দেখি!

বার বার আমি তাকে জিজ্ঞেস করি—কৈ, আর কত দূর? তুমি যে বললে ওই দেখা যাচ্ছে?

স্ত্রীলোকটি কোনো উত্তর দেয় না, হন্‌হন্‌ ক'রে আমার আগে আগে দ্রুত হাঁটে।

এ-তো মহা মুস্কিল! এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম—পাদমেকং ন গচ্ছামি! এই রইলো তোমার ঝাঁকা! ব'লে মাথা থেকে ঝাঁকা নামাতে যাচ্ছি, স্ত্রীলোকটি 'হাঁ হাঁ' ক'রে ছুটে এল। আবার মিনতির স্বরে বললে বুঝতে পারলাম —এই এসে পড়েছি আর কি! ঐ যে দেখা যাচ্ছে ঘর-গুলো, ওইখানে গেলেই হবে!

অগত্যা তা-ই আমাকে করতে হল।

অবশেষে যখন আমি সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি, ঠিক তখনই স্ত্রীলোকটি আমাকে ঝাঁকা নামাবার আদেশ দিলে। দু'পাশে বস্তি-বাড়ির মাঝখানে সরু গলি রাস্তার ওপর ঝাঁকা নামালাম। স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরজায় দরজায় ডাক দিয়ে এল। অমনি দেখতে দেখতে রাস্তার দু'দিকের সারি সারি দরজা থেকে ঘাঘরা বোরখা-পরা সব স্ত্রীলোকেরা হাতে কাঁসা রেকাবী বাটী যে যা পেয়েছে নিয়ে এগিয়ে এল ঝাঁকার সামগ্রী কেনবার জন্যে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, এ শুধু আজকের নূতন ঘটনা নয়, এমনি দিন-প্রতিদিনের ব্যাপার ; গৃহস্থ খরিদ্দাররা এ-বিষয়ে বেশ অভ্যস্ত আছে এবং তার জন্যে তারা অপেক্ষা করে থাকে।

কিন্তু কি তারা কিনতে আসছে? যে-ঝাঁকা আমি এত কষ্ট ক'রে মাথায় বয়ে নিয়ে এলাম, তার মধ্যে আছে কি—গাছের আম, না কোয়া-বের-করা কাঁঠাল?

এবার আমি তাই বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলাম সেই বস্তু দেখবার জন্যে।

অল্পক্ষণ পরেই স্ত্রীলোকটি বাড়ি বাড়ি খবর দিয়ে ফিরে এল। তারপর সে নিজেই ব্যস্ত হয়ে ঝাঁকার ওপরের ঢাকা খুলতে লাগল : প্রথমে কাপড়ের ঢাকা, তারপর কলাপাতার ঢাকা। কিন্তু সে কি একটা আধটা পাতা যে এক মুহূর্তেই শেষ হবে? পাতার পর পাতা। আমার অপেক্ষা যেন আর সয় না। এমনি সময়ে হঠাৎ আমার চোখের সামনে অতি বড় বিস্ময় বেরিয়ে পড়ল!

সে সময় ঝাঁকার ভেতর থেকে যদি দু'দশটা কেউটে গোখরোও ফণা তুলে বেরিয়ে পড়ত, তাহলেও বোধহয় আমি এত বেশি আশ্চর্য হতাম না! কিন্তু কেউটে গোখরোর পরিবর্তে বেরিয়ে পড়ল এক ঝাঁকা-ভর্তি সদ্য-কাটা লাল লাল চাকা চাকা মাংসের পিণ্ড!

আমি আশ্চর্য। স্তম্ভিত!

মনে মনে এবার বুঝে ফেললাম—আরে। এই মাংসের 'লা' জলই তবে এতক্ষণ আমার গায়ে এসে পড়ছিল? তাই এত মাছি কামড়াচ্ছিল?

ঘৃণা করব কি, এত বড় একটা তথ্য আবিষ্কার করতে পেরে ঘৃণার চেয়ে বিস্ময়টাই আগে এল। আমি যেন থ' হয়ে গেলাম! ভারি আশ্চর্য তো! এত মাংস? আচ্ছা, কিসের মাংস এগুলো? মুরগীর? না, পাঁঠার মাংস। কিন্তু একটা পাঁঠার মাংস কখনো এত হয়? নিশ্চয় দু'তিনটে পাঁঠা কাটা হয়েছে?

অবাক হয়ে আমি তখনো এইসব হিসেব করে চলেছি, আর ততক্ষণে আমার মহাজন স্ত্রীলোকটি হাতে দাঁড়ি-পাল্লা গুঁজে দিয়ে তার ভাষায় বলছে—ওহে

কালাচাঁদ, অমন করে কি এত ভাবছ? ওদের এগুলো ওজন করে করে দাও দেখি কেমন পার? তোমাকে কি এমনি এমনি পয়সা দেব ভাবছ?

তার কথা শুনে খরিদ্দার স্ত্রীলোকেরা অমনি খল্ খল্ ছল্ ছল্ শব্দে হেসে উঠল। আমারও অমনি হিসাব ভেঙে গেল। আমি তার কথামত মাংস ওজন করে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

আমার মন বোধহয় তখনো নির্লিপ্তই ছিল। কিন্তু বাধ সাধলো বিরাট দশকিলো ওজনের ঠ্যাংটা দেখে। সেটাই ওপরে ছিল। খদ্দেররা দু'-এককিলোর মত মাংস চায়, তাই সেই ঠ্যাংটার মাংস ছোট করে কেটে দেবার প্রয়োজন হল।

স্ত্রীলোকটি পাল্লার একদিকে এককিলো পোড়েন চাপিয়ে দিয়ে আমাকে হুকুম করলে—এই মাংসটা কেটে কেটে দাও। ব'লে ঝাঁকার এক পাশ থেকে একখানা দা আর ছোট কাঠের ফালি যেটার ওপর রেখে মাংস কাটতে হবে, আমার হাতে তুলে দিলে।

এতক্ষণ আমি যেন কোথায় ছিলাম, এ-সব কিছুই বুঝিনি। এইবার হঠাৎ আমার হুঁশ হল। আমি তৎক্ষণাৎ জেনে ফেল্‌লাম—আরে! এতো গো-মাংস! তা না হলে কখনো এত বড় ঠ্যাং হয়!

অমনি আমার আজন্মার্জিত হিন্দু-সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—গো-মাংস কেটে দিতে হবে আমাকে? কক্ষনো না? এই রইলো তোমার ঝাঁকা। তুমি তো এ-কথা আমাকে আগে বলনি? শুধু ঝাঁকা বয়ে আনবারই কথা ছিল, মাংস কেটে বিক্রি ক'রে দেবার তো কথা ছিল না? আমাকে পয়সা দিতে হবে না তোমার! প্রণাম করি তোমাকে আর তোমার কাজকে। আমি চললাম।

এই ব'লে পেছন দিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু ক'রে দিলাম। স্ত্রীলোকটি কিন্তু পয়সার কথা একবারও বললে না। সে যেন বেঁচে গেল। উপস্থিত ক্রেতারা আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। তারা নিশ্চয় আমার মত নগ্ন মূটের আচরণ দেখে মুখে কাপড় দিয়ে আবার খুব হাসছিল!

সে যাই হোক, সেখান থেকে আমি আবার ষ্টেশনের দিকে চললাম। পথে সেই পুকুরটা খুঁজে পেয়ে সেখানে ভাল ক'রে স্নান করে ফেললাম। কিন্তু যিনি আমাকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলেন, তিনি যে আমার জন্যে এমন উপাদেয় খাদ্যেরও ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন, তা তখনো জানতাম না?

ষ্টেশনের দিকে কিছুদূর যেতেই ক্যানেলের ওপর ব্রিজ পার হবার পূর্বে একটা ছোট্ট বাজার পড়ে। বাজারের একদিকে একজন স্ত্রীলোক বিশ-পঁচিশটা পাকা

কাঁঠাল নিয়ে বসেছিল। তার মধ্যে গোটা দুই কাঁঠাল আবার ভেঙ্গে বিক্রী করছিল। মাংস বিক্রেতা স্ত্রীলোকটি যেমন আমাকে দেখতে পেয়েই বুঝে নিয়েছিল তার মোট বইবার পক্ষে আমিই উপযুক্ত, তেমনি এই কাঁঠাল-বিক্রেতা স্ত্রীলোকটিও বুঝে নিলে আমার ক্ষুধা লেগেছে এবং তার কাঁঠালের যে-অংশগুলো বিক্রী হয়না সেগুলোর সদ্ব্যবহার করার পক্ষে আমিই উপযুক্ত। আমাকে দেখে তার দয়া হ'ল, পাশে রাখা কাঁঠালের ভুঁতিগুলো আমাকে খেতে দিলে।

বাস্তবিক তা-ই খেয়েই ক্ষুধারূপ ব্রহ্ম শান্ত হলেন। আমি সেখান থেকে ব্রিজ পার হয়ে ষ্টেশনে এসে পড়লাম।

আসবার দিনে দেখেছি সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের এক রূপ, আজ আবার তার এ-কি ভীষণ রূপ দেখছি! ষ্টেশনের বাইরে যেমন রিক্সা-ঠেলাগাড়ী-ট্যাক্সি-লরি বাস-মোটর ও যাত্রীর ভীড়, তেমনি ষ্টেশনের ভেতরে লাল-কালো-পাগড়ী পুলিশের ভীড়! হায় হায়! এ দুস্তর পুলিশ-সমুদ্র পার হয়ে ট্রেনে উঠবো কি ক'রে?

তবু তারি মধ্যে ঢুকেই যাত্রীদের যাকে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি—কলকাতার ট্রেণ কখন্ ছাড়বে বলতে পাবেন? কখনো হিন্দীতে কখনো ইংরেজীতে প্রশ্ন করি।

কিন্তু কে দেবে উত্তর? যাদের জিজ্ঞেস করি তারা তো আমাকে দেখেই বুঝে নিচ্ছে আমি বিনা টিকিটের যাত্রী? কেউ তাই প্রাণ ধরে উত্তর দিতে চায় না। শেষে ষ্টেশনের বেগুনি রঙের পোষাক পরা কুলীদের জিজ্ঞেস করি কলকাতার ট্রেনের কথা।

কুগ্রহ আর কাকে বলে? এত শত লোককে কাকুতি-মিনতি করলাম, কেউ একটা উচ্চ-বাচ্য করল না; মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। অথচ একজন সামান্য কুলীর কাছে আমি কি করে যে হঠাৎ বিরাট 'সাধুবাবা' হয়ে উঠলাম, সে-কথাটা আমার আজও হেঁয়ালী ঠেকে। সেই কুলী একেবারে ভক্তি গদগদ হয়ে আমাকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলে—কেয়া জী, আপ কাঁহা যায়েঙ্গে?

তাকে বললাম—কলকাতা যাব। কলকাতার ট্রেন কখন্ পাওয়া যাবে বলতে পার?

—কলকাত্তা যায়েঙ্গে? গাড়ী আভ্ভি আয়েগা। লেকিন আপকে পাশ তো টিকট্ নেহি হ্যায়?

বললাম—না।

সে অমনি আশ্বাস দিয়ে বললে—তো ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি—আপ ইধর

খাড়া হো যাইয়ে। হাম আভ্‌ভি টিকট্‌ লাউঙ্গা। বলে আমাকে হাতের ইশারায় একপাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে দ্রুতপদে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাবছি, আমাকে দাঁড়াতে বলে সে কী সত্যিই তবে টিকিট আনতে গেল? কলকাতা যাবার টিকিটের দাম দিতে পারবে সে?

নিজের মনেই আবার বলি—দূর! কোথায় পাবে সে টিকিট কেনার পয়সা? গরীব মানুষ, নিজেই হয়ত খেতে পায় না, হয়ত বৌ ছেলেদের না খাইয়ে নিজে মদ খেয়ে পড়ে থাকে! আর সেই মানুষ আমাকে দেবে টিকিটের দাম?

শত দুঃখেও হাসি পেয়ে যায়।

তার আসতে বিলম্ব দেখে আবার কখনো ভাবি—আচ্ছা, নগদ টাকা দিতে না পারুক, ট্রেনের পাশ এনে দিতে পারে কি? কারণ সে রেলের কুলী তো! তা না হলে আমাকে সে ভরসা দিয়ে গেল কোন্ সাহসে?

অকূলে কূল না পেয়ে আমি যেন তখন একটা তৃণখণ্ডের ওপর নির্ভর করেই সেই ষ্টেশনতরী পার হবার জন্যে কত রকম সম্ভব--অসম্ভব কল্পনা করতে থাকি। অবশ্য তারই মাঝে অন্য চেষ্টাও যে করিনি তা নয়। ভীড়ের ভেতর গিয়ে আরো দু' দশজনকে জিজ্ঞেস করে এসেছি কলকাতার ট্রেনের সময় ও প্ল্যাটফর্ম। কারণ কুলী যদি ঠিক বলতে না পারে! কিন্তু ফল হয়েছে একই: কেউ ভালভাবে বলেনি। বরং মনে হয়েছে, পুলিশদের দৃষ্টির কাছে আমি যেন বেশি ক'রে পরিচিত হয়ে গিয়েছি। এবার আমার ট্রেনে ওঠাই মুস্কিল! তাই অন্যদিকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সেই কুলী কিন্তু আমাকে খুঁজে বের ক'রে ফেলল। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বললে—লিজীয়ে আপকা প্ল্যাটফর্মকা টিকট্‌।

আমি হতাশ স্বরে বলি—প্ল্যাটফর্মের টিকিট, ট্রেনের টিকিট নয়? এ টিকিট নিয়ে আমি কি করবো?

—ঘাবড়াইয়ে ম্যত,—ইস্‌মে কাম হো যায়েগা।

ব'লে আমাকে টেনে নিয়ে চললো গাড়ী দেখাতে। তারপর আমাকে হাওড়ার ট্রেন দেখিয়ে সে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।

দেখলাম—হ্যাঁ, সেটা হাওড়ার ট্রেনই বটে। লেখা রয়েছে—হাওড়া-মাদ্রাজ। পরন্তু একজন যাত্রীকেও দেখতে পেলাম না। দূর পথের গাড়ী, তিল-

ধারণের স্থান থাকে না—আর এ-গাড়ী এখনো খালি? তবে বোধ হয় ছাড়বার অনেক বিলম্ব আছে!

মনে মনেই বলি—তা থাক। গাড়ীতে উঠবার এমন সুযোগ যখন হয়েছে তখন উঠে তো পড়ি! থাকব না হয় গাড়ীর মধ্যেই বসে! এই ভেবে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমি উঠে পড়লাম।

সেই কামরায় একজন লোক তখন ঝুড়িতে ক'রে কাঁচা শাকসব্জি নিয়ে চটের থলিতে বোঝাই করছিল। আমাকে দেখেই সে তার ভাষায় 'পো পো' করে একেবারে তেড়ে এল। আমি যত তাকে অনুরোধ করে বলি শুধু এই ষ্টেশনটার মত আমাকে যেতে দাও, তত সে মারমুখী হয়ে ওঠে।

এদিকে আমারও এমন জড়-ভরতের মত অবস্থা যে, সেই কামরা থেকে অন্য কোন কামরায় গিয়ে উঠব তা-ও পারি না। কত কামরাই তো খালি ছিল?

অবশ্য শুধু অবস্থার দোষ নয়, দোষ পুলিশের। ট্রেনের চারিদিকে প্ল্যাটফর্মে কোথাও এমন এতটুকু ফাঁক নাই যেখান দিয়ে গেলে পুলিশের নজরে না পড়ি। সর্বত্রই শুধু পুলিশ! কাজেই একবার যখন তাদের প্রখর দৃষ্টি এড়িয়ে একটা কামরায় উঠতে পেয়েছি, তখন কিছুতেই আর সেটা থেকে নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সেই লোকটি শেষে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে একজন পুলিশের হাতে সঁপে দিলে।

এই সব কাহিনী পড়ে সজ্জন পাঠকেরা এতক্ষণ হয়ত ভাবছেন, এই নিয়ে দু'বার হল। আবার সেই বিচারের প্রহসন হবে, আবার সেই জেল হবে। কিন্তু মানুষটা এই যে বিনা টিকিটে রেলে চড়ার কাহিনী লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এমন ফলাও করে বর্ণনা করছে, এতে পাঠকদের ঘৃণার ভয়ও কি নাই?

আহা! নাই আবার! সজ্জন পাঠকদের ঘৃণার ভয়েই তো এসব ঘটনা বাদ-দিয়ে অন্য ঘটনাগুলো শুধু প্রকাশ করব মনে করেছিলাম। পরন্তু মা তা শুনলেন না। তাছাড়া আমার মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করে, একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার যোগসূত্র রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে এবং প্রকাশ করেও তৃপ্তি পাই না। আর সেইজন্যেই তো একাহিনী লিখতে অযথা বিলম্ব ঘটছিল। কিন্তু এমনি সময়ে বর্তমান লেখকদের লেখা পড়ে আমার আক্কেল হয়ে গেল: আরে! এ অপরাধটা তো একটা অপরাধের মধ্যেই গণ্য নয়। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া আবার একটা অপরাধ নাকি? আর আমি কিনা তিলকে তাল ভেবে মাথা ব্যথা করে ফেললাম?

আধুনিক গল্পের নায়করা বিনা টিকিটে ট্রেনে তো চড়ছেই, সেইসঙ্গে আবার

বুক ফুলিয়ে সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে যে, পৃথিবীতে বোকা লোকেরাই নাকি গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে। কোনো বুদ্ধিমান মানুষ আজকালের বাজারে আবার টিকিট কিনে ট্রেনে চড়ে নাকি? তাহলে ট্রেনে চড়ে লাভটা কি হল?

ঠিকই তো? লাভটা তাহলে কি হল? কথাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে ধরে গেল। এতদিন ধরে আমি এমনি একটা জাষ্টিফিকেশনই খুঁজছিলাম।

তাছাড়া তারা তো মূর্খের মত যা তা একটা যুক্তিহীন কথাও বলছে না। এই বলার পেছনে দস্তুর মত জল্‌জ্যান্ত একটা দর্শনশাস্ত্র খাড়া করে রেখেছে তারা আগে থেকে। সেই 'দর্শন'টা বলছে: টিকিট কাটতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার জন্যে কি রেল-কোম্পানীর বেশি খরচ করতে হচ্ছে? আমি রেলে চড়লেও রেল চলবে, রেল-কোম্পানীর লোকজন খাটবে এবং তেল-কয়লা পুড়বে; আব না চড়লেও রেল চলবে, রেল-কোম্পানীর লোকজন খাটবে এবং তেল-কয়লার ধ্বংস হবে। কাজেই……

এই দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিলেই সহৃদয় পাঠকের আমার প্রতি যেটুকু ঘৃণা আছে এখনো, আশা করি তা আর থাকবে না। শুধু এই ভরসাতেই বুক বেঁধে একাহিনী বলতে সুরু করেছি।

কিন্তু আমরা আবার অন্য কথায় এসে পড়লাম। পূর্বের ঘটনায় আবার ফিরে যাওয়া যাক। যা বলছিলাম—আহা! আমাকে পেয়ে ষ্টেশনের মধ্যেই পুলিশের সে কি আদরের বহর! মরি মরি! মুখে সে কি অপরূপ হাসি ফুটিয়ে আমাকে হিন্দীতে তার জিজ্ঞেস করা—ক্যা রে! কল্‌কাত্তা যাওগে?

যেন আমার উত্তরটুকু শোনবার জন্যেই তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা উজাড় করে দেবার অপেক্ষায় ছিল। রস-কসহীন পুলিশের লোক হয়ে এমন নিখুঁত অভিনয় শিখলে কোথায় কে জানে?

আমি অমনি ভেবে বসলাম, তাহলে বোধহয় আমাকে ছেড়ে দেবে। আমি তো এখনো তাদের ট্রেনে চড়ে এক পা-ও যাইনি। তাই হয়ত জিজ্ঞেস করছে কল্‌কাত্তা যাওগে?

কিন্তু নাঃ। চাবুক তুলতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ আমার হাতের সেই কাগজটা তার নজরে পড়ে গেল। টাকা-পয়সা মনে করে একেবারে ছোঁ মেরে কাগজটা কেড়ে নিলে—এ ক্যা রে? প্ল্যাটফর্মকা টিকট্?

আমার হাতে প্ল্যাটফর্মের টিকিট দেখে পুলিশের চোখে সে কি আনন্দ—যেন

এক লাখ টাকার লটারী জিতেছে। আমাকে বললে—বারে বাঃ! প্ল্যাটফর্মকা টিকাট্সে যাওগে? তব তো অর ভি আচ্ছা!

বলেই সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি দিয়ে পুলিশের সে কি প্রহার! লোকে পশুকেও এমনভাবে মারে না।

আমি একটি কথাও বললাম না। বলবো কি? অপরাধ কি আমার একটা আধটা? একে তো বিনা টিকিটে ট্রেনে যাবার চেষ্টা করছিলাম? তার ওপর আবার প্ল্যাটফর্মের টিকিট দেখিয়ে পুলিশ-চেকারদেব চোখে ধুলো দিতে চাইছিলাম। কাজেই নীরবে প্রহার সহ্য করলাম।

কিন্তু এইটুকু শাস্তিই তো শেষ নয়? এ তো কেবল নাটকের সুরু। পুলিশ তাবপর সেইখানেই হাতে-কড়া পরিয়ে দিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলে দিলে।

তবে আমার ভয়ের কিছু ছিল না। কেননা আমি শুধু একা ছিলাম না, মথুরা জেলের মত এখানেও এ-পথের সঙ্গী অনেক এবং আমার প্রতি তাদের সহানুভূতিও অনেক। সঙ্গীরা আমাকে দেখে খুশীই হল এবং সেই খুশীর নিদর্শন স্বরূপ সবাই একটু মুচকি হেসে সরে গিয়ে আমার দাঁড়াবার স্থান করে দিলে।

যে-বিচারালয়ে আমাদের বিচার হল সেটা কি কোর্ট, না অন্য কিছু তা আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে—হাকিম আমাদের সবাইকে পাঁচ দিনের জন্যে কয়েদবাসের শাস্তি দিলেন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের টিকিট কিনে রেল-কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে আমার আরো দু'দিন বেশি শাস্তি হল—মোট হল সাতদিন সশ্রম কারাদণ্ড।

সকাল আটটা ন'টার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়েছিলাম আমরা, বিচারের প্রহসন মিটতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর বিচারের পরও আবার কোর্টের কাছে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সেই ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে সকলেই গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে হঠাৎ দরজাটা খুলে-গেলে দেখি, পুলিশের পরিবর্তে মূর্তিমতী অন্নপূর্ণারূপে একজন স্ত্রীলোক অন্নের পাত্র হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। সকলকে তিনি অন্ন পরিবেশন করলেন। আকাঁড়া মেটে চালের ফেন সমেত ভাত, আর ওলডাঁটা-আলুর তরকারী কী যে অমৃত লাগল সেদিন!

বাস্তবিক সেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি আমাকে মাদ্রাজ ট্রেনে করে হাওড়া ষ্টেশনে যেতে হত, তাহলে রাস্তাতেই কোথাও হয়ত প্রাণটা বেরিয়ে যেত। এদেশের লোকেরা সাধু-সন্ন্যাসীকেও ভিক্ষে দেয় না, আর আমার মত মানুষের কথা তো

বলাই বাহুল্য! সেই হিসেবে সাত দিনের মত খাওয়া-থাকার একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেল মাদ্রাজ জেলের মধ্যে।

একেবারে সন্ধ্যের সময়ে জেলে এসে পৌছেছিলাম। নাম-ধাম সই ক'রে ভেতরে ঢুকতে আরো দেরী হয়ে গেল। সুতরাং সেদিন আর জেলের কাজ করার সময় ছিল না। একেবারে খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে তালা-চাবি বন্ধ করে দিলে আমাদের।

তারপর সেই প্রথমদিনের রাত্রি যে কী কষ্টে ভোর হয়েছে তা লিখে প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই! একে তো নূতন জায়গায় নূতন মানুষ আমি। তাও আবার জেলের মানুষের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে আমাকে। ব্যারাকে ঢুকেই যে-দৃশ্য প্রথমে চোখে পড়ল, তাতেই আমি একবারে ভয়ে লজ্জায় আঁতকে উঠলাম। যে-সূর্যদেবের সর্ববস্তুতে সমান দৃষ্টি—বিষ্ঠায় চন্দনে ভালতে মন্দেতে যাঁর কোন বিকাব নেই, তিনিও যদি এ-দৃশ্য দেখতেন তাহলে বোধহয় লজ্জায় ঘৃণায় কুঞ্চিত না হয়ে তিনি থাকতে পারতেন না। প্রথমে গিয়েই দেখি অধিকাংশ কয়েদীই অঙ্গেব বসন ফেলে দিয়ে উন্মাদের মত ব্যাভিচার ক্রিয়ায় মত্ত। মানুষের সৎ-বুদ্ধি তো দূরের কথা, সেখানে জ্ঞান-বুদ্ধিরই বালাই নাই। এ শুধু মাদ্রাজ জেলেই নয়, প্রতিটি জেলেই এরকম লক্ষ লক্ষ নারকীয় দৃশ্য নিত্যদিন ঘটে চলেছে। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের আড়ালে এমন এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে জ্ঞানের আলো প্রবেশের একান্ত নিষেধ, যেখানে বাইরের মানুষের খোঁজ-খবর নেবারও কোনরকম উপায় নেই। সরকার এবং জনগণ শুধু সমাজের ক্ষতি-কারকের হাত থেকে নিস্তার পেয়েই তৃপ্ত—তার বেশি তাদের কৌতূহলও নেই, প্রয়োজনও নেই। সুতরাং এই জঘন্য অবস্থার পরিবর্তন হবে কি করে? কে করবে পরিবর্তন?

মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর জেল দেখে একদিন প্রাণ কেঁদেছিল। তাই তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানালাম—প্রভু, তুমি এদের সত্যপথ দেখাও; যেভাবেই হোক এই নারকীয় অবস্থার পরিবর্তন এনে দাও।

সে যাই হোক, এতক্ষণ আমার দৃষ্টিটা শুধু সেই ঘরের মানুষদের ওপরই নিবদ্ধ ছিল। এবার হঠাৎ ঘরের মেঝের ওপর যেখানে তারা বসে ছিল সেইখানে নজর পড়ল। আর অমনি নিজের মনেই বলে উঠলাম—বাঃ! মাদ্রাজ জেল এত বড়লোক? কয়েদীদের জন্যেও লাল রং-করা চকচকে পাকার মেঝে? মথুরা জেলে তো দেখে এসেছি এবড়ো খেবড়ো সিমেণ্টের মেঝে—তাও আবার যেখানে

সেখানে বড় বড় ফাটল। ভাবলাম, মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল জেল তো, তাই এরকম বড়মানুষী ব্যাপার!

কিন্তু তারপরেই মেঝে ছেড়ে দেওয়ালের দিকে নজর পড়ল। ও কি? দেওয়ালও মেঝের মত লাল চক্‌চকে? এমন তো কোথাও দেখিনি?

ভাল ক'রে নজর দিয়ে দেখি—সেই লাল রঙের অদল বদল হচ্ছে শরতের সান্ধ্য আকাশের মত। লাল রঙ ইতস্ততঃ নড়ছে চড়ছে, কোথাও আরো গাঢ় হচ্ছে; কোথাও আবার খয়েরী রঙ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি? কি তবে ওগুলো? লাল পিঁপড়ে? এত কখনো পিঁপড়ে হয়?

ধ্যের্। ওগুলো পিঁপড়ে হতে যাবে কেন? ওগুলো ছারাপোকা!

কিন্তু তায় বলে এমন অসংখ্য ছারপোকা?

সহসা এত বড় একটা আশ্চর্যের বিষয় আবিষ্কার করতে পেরে মনের মধ্যে তখন হয়ত আনন্দটাই আগে আসতে চাইছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনন্দটা এসেও এল না। তার পরিবর্তে এল বিষাদ—পরম আত্মীয়ের দুরারোগ্য ব্যাধির সংবাদ পাওয়ার মত মনটা আমার একনিমেষে বিষাদে ছেয়ে গেল।

কলকাতার বাসাতে দু'চারটে ছারপোকা দেখলেই মেজাজ গরম হয়ে উঠত—সেগুলোকে না পারতাম মারতে, আর না পারতাম দরাজ হৃদয়ে রক্ত দান করতে। আর এখানে যে দেওয়াল-মেঝে ভর্তি ছারপোকা! হায় হায়! কেমন করে রাত কাটবে আমার? রাত্রে আরামে ঘুমের কথা ভাবিনি। ও-বস্তুটা মন থেকে বাদই রেখেছি; জানি ওটা সুখী মানুষদের জন্যে, কয়েদীর জন্যে নয়। কিন্তু ঐ মেঝেতে আমি বসবো কেমন করে? সারা রাত কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব? অথচ বসলেই ওগুলোর ওপরে গিয়ে বসতে হবে, আর ওগুলো তখন আমার চারদিক ছাব্‌লে ধরবে।

বৃন্দাবন-মথুরায় যমুনার কচ্ছপ যারা না দেখেছে তারা যেমন কচ্ছপ যে কত বড় হতে পারে তার ধারণা করতেও পারবে না, তেমনি মাদ্রাজ জেলের ছারপোকা না দেখলে সে যে কী বিরাট তার কল্পনা করতেও কেউ পারবে না। বিড়াল যদি বাঘের মাসী হয় তবে ছারপোকা মনে হয় কচ্ছপের খুড়তুতো জ্যাঠতুতো বোন হবে। কয়েদীদের রক্তে পুষ্ট হয়ে সেগুলো যে হারে বাড়ছে দেখে এসেছি, এতদিন মনে হয় সেগুলো তাদের কচ্ছপ-দিদিদের মতই হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সে যাই হোক, ওই সাইজের আর অতগুলি ছারপোকাকে রক্ত ডোনেট্ করার মত সাফিসিয়েণ্ট রক্ত তো আমার শরীরে নেই। না খেয়ে না ঘুমিয়ে

শরীরের রক্তে যেটুকু জলীয় অংশ ছিল সেটুকু চলে গিয়ে এখন শুধু সারে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে যদি আবার দিতে হয়, তাহলে আমি বাঁচবো কি করে?

সে-সময় আমার বাঁচবার বড় সাধ ছিল। অন্য কয়েদীদের মত জেলেই তো আমার এ-জীবন শেষ হয়ে যাবে না! যারা বিশ-ত্রিশ বছর জেলে কাটাবে তাদের জীবনের শেষ নয় তো কি? কিন্তু আমি যে মোটে সাতদিনের জন্যে জেলে এসেছি! আমাকে যে আবার জেল থেকে বেরিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে বি. এ. পাশ করে আবার পণ্ডিচেরী আশ্রমে মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে। কি হবে আমার?

এ-সব কথা এখন শুনলে লোকের হয়তো ব্যঙ্গের মত মনে হবে; কিন্তু সত্যি সত্যি বলছি, সে-সময়ে এই ছিল আমার একান্ত ভাবনা—কেমন করে আবার আশ্রমে ফিরে যাবো? এ যে আমাকে করতেই হবে—এ ছাড়া যে আমার অন্য কোন গতি নেই!

কিন্তু এ-সব কথাও থাক এখন। মাদ্রাজ জেলের কষ্টের কথা আর অধিক বলতে চাইনে। শুধু দু'টো কথা বলে শেষ করি:

আমার জেলের কোর্স কম্প্লীট করতে শুধু দু'টো সাবজেক্টই মাত্র তখন বাকী ছিল—ঘানি-টানা আর গম ভাঙ্গা। মথুরা জেলে অন্য সবই হয়ে গিয়েছিল, বাকী ছিল ঐ দু'টো কাজ। মাদ্রাজ জেলে এসে তা পূর্ণ হয়ে গেল!

তবে জেলের ঘানি টানায় গম ভাঙ্গায় কষ্ট তো এমন কিছু নেই। অজ্ঞান-অন্ধ মানুষ মাত্রেই তো সংসারের চোখ-বাঁধা কলুর বলদের মত সব সময়ই ঘানি টানছে গম ভাঙ্গছে। তার জন্যে নয়, কষ্ট হল ওয়ার্ডারদের নির্দয় এবং অকারণ প্রহার। এক-একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান যেমন গরু ঠ্যাঙাতে খুব ভালবাসে—গাড়ী চলছে ঠিক, তবু দিয়ে দিলে দু'দশটা ঠ্যাঙানি বলদের পিঠে। এরাও ঠিক তেমনি। যাঁতা-ঘানি চলছে ঠিকই, তবু যে ওয়ার্ডার দেখাশুনা করছে তার যে তাহলে কাজ থাকে না! তাই সে একবার করে এসে এসে সবারই মাথায় ঘাড়ে পটাপট্ করে ভারী রুলের ঘা বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সেজন্যে চেতনাকে সবসময় সজাগ রাখতে হয়। অবশ্য জেলের মত জায়গায় এরকম সামান্য কষ্টের ব্যাপার নিয়ে আমার আক্ষেপ করা চলে না। ওটুকু তো থাকবেই, তা না হলে আর জেলখানা বলেছে কেন?

তা থাকুক। কিন্তু আর একটা কষ্ট কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। সেটা হল খাদ্যের ব্যাপারে: সকালে ইটালি-সম্বরম্ যদি-বা কোনরকমে সহ্য করা

যায়, কিন্তু দুপুরে ও রাত্রে সরষের মত রাই সিদ্ধর পিণ্ডি কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চাইত না। অথচ উদরে রয়েছে দারুণ ক্ষুধা। সেই খাদ্য তখন ফেলাও যায় না, আবার গেলাও যায় না—সে এক অদ্ভুত কষ্ট! ভেবেছিলাম মাদ্রাজ থেকে কলকাতা যেতে কতদিন যে লাগবে তার ঠিক নেই; পথের মধ্যে সাতটা দিনের খাওয়া থাকার এমন সুযোগ যখন ঘটলই, তখন উটের মত উদরে কিছু খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করে রাখা যাবে! তা আর হল না। বিধি বাম! সাতটা দিন প্রায় উপোস করে কাটল জেলে।

আট-দিনের দিন সকালে জেল থেকে আমার ছুটি হয়ে গেল। জেল গেট থেকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন জটা-জুটধারী কমণ্ডলু হাতে দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী।

জেলের বাইরে এসে সন্ন্যাসীকে হাত জোড় করে প্রণাম জানালাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, হয়ত আমার কৌপীন-বাস দেখে ভাবছিলেন আমিও সাধু-সন্ন্যাসী কি না। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি, বাঙালী না কি?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাঙালী।

—এবার কোন্ দিকে যাওয়া হবে? তিনি পথ চলতে চলতে আবার প্রশ্ন করলেন।

বললাম—কোলকাতা।

সন্ন্যাসী বললেন—যাও, আবার জেলে পুরবে।

এটা তো আমার জানাই ছিল। তবু তাঁর কথা শুনে আবার একবার নূতন করে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—জেলে পুরবে?

—পুরবে না তো কি? দেশে কি ন্যায়-নীতি আছে, না সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে যে তোমাকে ছেড়ে দেবে?

—তাহলে আপনি কেমন করে যাবেন? আপনিও তো বাংলাদেশে যাবেন?

সন্ন্যাসী তেজোদ্দীপ্ত স্বরে উত্তর দিলেন—যাবে আমার সঙ্গে? দক্ষিণ ভারতটা একবার পরিক্রমা করে আমিও যাব বাংলায়।

—মাপ করবেন, আজই আমি দেশে চলে যাচ্ছি। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতটা ঘুরেই তো এলাম!

—তা দেশে যাবে তো যাবে, এত তাড়া কিসের? ক্ষুধা লেগেছে, এসো না, কিছু সেবা লাগানো যাক!

ক্ষুধা আমারও লেগেছিল। সকালে কিছুই খেতে দেয়নি জেলে। মথুরা জেলে তবু নগদা আড়াই টাকা দক্ষিণা দিয়েছিল, মাদ্রাজ জেল খালি হাতে বিদায় দিয়ে দিলে। তাই সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলাম।

কথা বলতে বলতে দু'জনেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। খানিকটা যেতেই রাস্তার দু'ধারে কতকগুলো দোকান পড়ল। সন্ন্যাসী সেই দোকানগুলোর সামনে কমণ্ডলু নিয়ে দাঁড়াতেই দোকানদাররা কিছু না কিছু তাঁর কমণ্ডলুতে দিয়ে দিলেন। আমাদের দেশে যেমন মুড়ির মোওয়া হয় সেইরকম মোওয়া কয়েকটা পড়তেই সন্ন্যাসী একটা নিরিবিলি গাছতলায় গিয়ে বসলেন। তিনি আমাকেও সেই প্রসাদের ভাগ দিলেন।

সন্ন্যাসী যাই হোক আমাকে তারপর ধরে রাখবার চেষ্টা করলেন না। সেই-খানেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি যাত্রা সুরু করলাম। মাদ্রাজ থেকে অনেক দূর রাস্তা পায়ে হেঁটে এসে মাঝপথে ট্রেনে উঠে অনেকদিন পরে আমাদের দেশের পাশের গ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সমস্ত ঘটনাটা সবিস্তারে বললে আর একটা গোটা বই লিখতে হয়। কাজেই সেসব বাদ দিয়ে বলি: বন্ধু আমাকে তার নিজের কাপড়-জামা পরিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে নাপিত ডেকে চুল-দাড়ি কাটিয়ে সাইকেলে চড়িয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল।

বাড়িতে সবাইকে বললাম—আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। আর সত্যিই মাথা-খারাপ নয় তো কি! যে-মানুষ শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে গ্রহণ করেও পণ্ডিচেরী না গিয়ে বৃন্দাবন চলে যায়, কিংবা শ্রীমা'র অনুমতি না নিয়ে পণ্ডিচেরী যায়, তার মাথা-খারাপ নয় তো কি?

আত্মীয়-স্বজন পাড়ার লোক দেশের লোক, সবারই মুখে এক প্রশ্ন—তা গেছলি, গেছলি—কারো হাতে একটা সংবাদ দিয়ে গেলিনে কেন? তাছাড়া লেখাপড়া-জানা ছেলে তুই, সেখান থেকেও তো একটা পত্র দিতে পারতিস্? তাহলেই তো আমাদের আর ভাবনা থাকত না।

কিন্তু সব প্রশ্নেরই মোক্ষম জবাব হল ঐ এক কথা—মাথা-খারাপ হয়েছিল। বললাম—তখন না দেশের কথা, না আত্মীয়-স্বজনের কথা—কারু কথাই আমার মনে ছিল না। তবে যখন ফিরছি তখন মনে হল, দুটো ডানা থাকলে এক নিমেষে উড়ে চলে আসতাম। প্রাণটা হায় হায় করছিল—যাঃ! কলেজের সেস্‌ন্ আরম্ভ হয়ে গেল, এবছর আমার আর ভর্তি হওয়া হল না!

সবাই শুনে বলে—আহা! সত্যিই তো গা! ওর কি আর তখন মাথাতে

মাথা ছিল যে বাড়িতে পত্র দেবে? ভগবানের দয়ায় ও যে আবার ঘরে ফিরে এসেছে সে-ই ঢের!

তারপব আমার ফিরে আসার সংবাদটা পাঠমন্দিরেও সত্বর পৌঁছে গেল। পাঠমন্দিবের মা এবং ডাক্তারবাবু একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে তাদেবও ঐ কথাই বললাম—মাথা খাবাপ হযেছিল।

তাঁরা কিন্তু একবারও এরকম 'আহা আহা' কবলেন না। আমার চলে যাবার কাবণটা তাঁরা যেন দিব্যচক্ষে দেখেছেন এমনিভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় কোথায় ঘুরলে এ্যাদ্দিন? পণ্ডিচেরী গেছলে?

কি জানি কেন, এই সামান্য কথাটায় আমার খুব বেশি লজ্জা লাগল? জীবনে প্রথম প্রেম প্রকাশ হয়ে পডলে মানুষের যেমন লজ্জা রাখবার আর স্থান থাকে না, আমারও ঠিক তা-ই হল; লজ্জা রাখবার স্থান ছিল না। চোখ তুলে তাঁদেব দিকে ভাল করে তাকাতেই পারলাম না। মনে হল, আমি হাতেনাতে এঁদের কাছে ধরা পড়ে গেছি, মাথা খারাপ বলে এঁদেব ভুলিয়ে দেওয়া কিছুতেই চলবে না।

শেষে স্বীকাব করতে হল—আজ্ঞে হ্যাঁ, পণ্ডিচেবী গেছলাম। যাতে আমি মিথ্যে বলতে না পারি সেজন্যে ডাক্তাববাবু তখন আমার চোখে চোখ বেখে জিজ্ঞেস কবলেন—মায়ের দর্শন হল? মা কি বললেন?

যেমন তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তেমনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেও আমি পাবতাম। বলতে পারতাম, অসময়ে গিয়ে পড়েছিলুম, মায়ের দর্শন হয়নি। ব্যস্ চুকে যেত।

কিন্তু না। আমার তখন মনে হল, সমস্ত দুর্ভোগের ঘটনাটাই তাঁদের কাছে খুলে বলি। এসব কথা সবার কাছে প্রকাশ করলেও বোধ হয় আমার সাধনপথে জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফলে যে-সব বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে তা ক্ষয় হয়ে যাবে।

তাই তাঁদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। বললাম, আমি তো মায়ের অনুমতি নিয়ে আশ্রমে যাইনি। তাছাড়া স্বাভাবিক পোষাকেও যাইনি। কাজেই মায়ের দর্শন হল না। শুধু তাই নয়, সেই বেশে আশ্রমে ঢুকতে গালাগাল, অর্ধচন্দ্র ইত্যাদি অনেক কিছু উপরি-পাওনাও মিললো।

ডাক্তারবাবু বললেন—আশ্রমে থাকবার জন্যে মায়ের অনুমতির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সকাল বেলায় মায়ের ব্যাল্‌কনি দর্শন করতে তো কারো কোন বাধা নাই! রাস্তাব পথিক মুটে মজুর সাধু ভিখিরি, সবাই তো মাকে দর্শন করতে পারে সে সময়! তুমি তবে কেন পেলে না?

—সেই জন্যেই তো বলছি, আমার দুর্ভাগ্য। আমার ক্ষেত্রে ঘটনাগুলোও সব অন্যভাবে ঘটল : ষ্টেশনে একজনের কাছে ভুল খবর পেয়ে সকাল আটটার সময় আশ্রমের ভেতরে মাকে দর্শন করতে যেতেই তো ঐ শাস্তি হল। আশ্রম গেটের ঘটনাগুলো আবার তাঁদের বুঝিয়ে বললাম।

তাঁরা শুনে বললেন—কতক্ষণ ছিলে পণ্ডিচেরিতে ?

বললাম—ছিলাম তো পুরো একটা দিন। সেদিন মায়ের দর্শন না পেয়েছিলাম, না-ই পেয়েছিলাম, পরের দিন দর্শন পাব জানলেও আমি উপবাস করেও আরো একটা দিন পথের ধারে পড়ে থাকতাম। কতদিন উপবাস করেছি, আর এক-দিনের উপবাসকে কি আমি ভয় করি ?

আমার কথা শুনতে পাঠমন্দিরে তখন আরো দু'চারজন উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের একজন প্রশ্ন করলেন—তবে থাকলে না কেন ?

আমি বললাম—কি করবো বলুন, গেটের সেই সাধক আমাকে কিছুতেই থাকতে দিলেন না যে। তিনি কড়া হুকুম দিলেন—যেমন ভাবে এসেছ ঠিক তেমনি ভাবে এখুনি তোমাকে চলে যেতে হবে। এখুনি ষ্টেশনে গিয়ে দেখ্‌গে যাও কখন্ ট্রেন পাও।

আবার শুধু বলাই নয়, যতক্ষণ না আমি আশ্রমের গেট ছেড়ে ষ্টেশনের দিকে চলে গেলাম, ততক্ষণ তিনি গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেই ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন—কেন তিনি ওরকম করলেন তোমাকে ? তাতে তাঁর লাভ কি ?

—আহা বুঝলেন না ? তাঁর লাভ আবার কি ? বরং আমার যেটুকু মনে হয়—কারণ হল ভয়। তাঁর গেট-ডিউটির কাজে সেই যে একটু ত্রুটী ঘটে গেল—তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাকে লক্ষ করলেন না ব'লে আমি আশ্রমের ভেতরে ঢুকে গেলাম। সেই জন্যেই বোধ হয় আমাকে আশ্রম থেকে তাড়াতে পারলে তিনি যেন বাঁচেন। কেননা আমি যতক্ষণ সেখানে থাকব ততক্ষণ তাঁর ঐ দোষটাও অন্য লোকের আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে কিনা। তাছাড়া আমিও কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ঐ সব ঘটনায়। বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আমার ছিল না……

…তাই বলো, তুমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। তা না হলে তুমি পণ্ডিচেরীতে পুরো একদিন ছিলে বলছো, তার মধ্যে আর কোন আশ্রমবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না ? সকালে বিকালে কত আশ্রম বাসী সমুদ্রের ধারে ধারে বেড়াতে আসেন,

সিমেণ্টের বেঞ্চে বসে থাকেন গল্প করেন, আর তুমি তাঁদের কারো সাক্ষাৎই পেলে না? যদি সাক্ষাৎ পেতে তাহলে আশ্রমবাসীদের দয়ার পরিচয় পেতে—তাঁরা নিজেদের ভাগের খাবার খাইয়ে তোমাকে কোথাও হোক রেখে মায়ের অনুমতি করিয়ে দিতেন, অন্ততঃ মায়ের দর্শন করিয়ে তো দিতেনই।

শ্রোতাদের আর একজন তখন ডাক্তার বাবুকে বললেন—আমরা যে-বারে পণ্ডিচেরী গেলাম সেইবারেই তো, মনে আছে আপনার? একটি ছেলে ঘর থেকে পালিয়ে এসে আশ্রম প্লে-গ্রাউণ্ডের বাইরে দরজার কাছে বসেছিল। তার গায়ে তখন রীতিমত জ্বর, গায়ে বেশি জামা-কাপড়ও ছিল না। শীতে জড়ো হয়ে বসে সে কাঁপছিল। মায়ের কাছে কি ভাবে যেন সংবাদ গেল, তিনি ছেলে-টিকে দেখতে চাইলেন। মা তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে একজন আশ্রমবাসীব ওপব তার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে দিলেন। শুনে এসেছিলাম, তারপর থেকে সেই ছেলেটি আশ্রমেই বয়ে গেছে। আহা! মায়ের কৃপার কি অন্ত আছে, না তাঁব কৃপার কাছে কোন নিয়ম-কানুন আছে? কিন্তু তোমার কথাটা মাকে জানানোই হল না? আশ্চর্য তো!

—হ্যাঁ, আশ্চর্যই তো! আমিও তাঁদের কথায় সায় দিই। সেদিন পণ্ডি-চেবীতে এতটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ তাঁদের কথা শুনে মনে হল, সত্যিই আমি খুব বেশি ঠকে গিয়েছি।

নিরুপায় কষ্টের একটা দীর্ঘশ্বাসও বেবিয়ে পডল বুকের ভেতর থেকে।

কিন্তু এত সব বাধা এবার আমি সহ্য করবো কেমন করে? একদিকে এই বঞ্চিত জীবন, আর একদিকে ঘবে বাইরে লজ্জা উপহাস। ঘর থেকে বেরুলেই পাড়ার ছোট ছেলেরাও বলে—কি, আর পণ্ডিচেরী যাবে?

চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকলে বড়রা বলেন—হায় ছ্যাখো গো, পাগলেব মত কেমন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে! নাঃ, তোমার পণ্ডিচেরীর ঘোর এখনো কাটেনি দেখছি।

কিছুদিন পর দেশ থেকে কোলকাতায় গেলাম। সেখানে একদিন বৃষ্টির দিনে ফুটপাথে গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁডিয়ে থাকতে থাকতে পাড়ার একজন বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—ইদানীং আর দেশে গিয়েছিলেন নাকি?

তিনি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন—হাঁ্যা, গিয়েছিলাম তো? তুমি যখন পণ্ডিচেরী গিয়েছিলে তখন!

ভাবি, এই কথার এই উত্তর ? পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম আজ এক বছরের বেশি, আর যে-মানুষ প্রতি মাসে একবার দেশে যান, তিনি কিনা সেইসময় দেশে গিয়েছিলেন ? আসলে 'পণ্ডিচেরী' কথাটা তাঁর বলা চায়।

কিন্তু কেন যে সবারই পণ্ডিচেরীর প্রতি এত আক্রোশ তা বুঝলাম না।

না না, বুঝেছিলাম বৈকি ? বুঝেছিলাম, সবাই পণ্ডিচেরীকে ভালবাসে, পণ্ডিচেরীতে মায়ের কাছে সবাই থাকতে চায়। কিন্তু আমার মতো সে-সাধ তাদেরও পূর্ণ হয় না বলেই পণ্ডিচেরীর প্রতি তাদের এত আক্রোশ।

[সাত]

কবি বলেছেন : কত সুখ দুঃখ আসে নিশিদিন,

কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ।

তেমনি এ-সব লজ্জা-গ্লানিরও কিছু ভুলে গেলাম, কিছু ক্ষীণ হয়ে এল। অবস্থাটা ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার পড়াশুনা সুরু করলাম। আই-এ-পাশ ক'রে বি-এ ভর্তি হলাম। এমনি ক'রে চার-পাঁচটি বছর কেটে গেল।

কিন্তু পণ্ডিচেরীকে ভুলতে পারলাম না। বি-এ পরীক্ষাটা এগিয়ে আসতেই আবার পণ্ডিচেরী যাবার জন্যে মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। এতদিন বি-এ পড়ার সংকল্পটা সামনে ছিল বলেই বোধহয় চুপ করে থাকতে পেরেছিলাম। তা না হলে পণ্ডিচেরী থেকে ফিরে এসে অবধিই তো মনটা আশ্রমে পড়েছিল। সেই সময় ট্রেনে ট্রেনে গয়া কাশী বৃন্দাবন ঘুরতে ঘুরতে দিনরাত যেমন রেলের সিটি শুনতাম, তেমনি এই চার-পাঁচটি বছর প্রতি রাত্রে ঘুমের মাঝেও আমি শুনতাম যেন পাশের বাড়ি থেকে সেই সিটি বাজছে। আবার সেই সিটির আওয়াজও ভারী অদ্ভুত! নির্জন নিস্তব্ধ নিশীথে পাহাড় জঙ্গল নদী ভেদ করে যাবার সময় ট্রেন যেমন হৃদয় বিদায়ক ডাক ছাড়তে ছাড়তে দূর হতে দূরে মিলিয়ে যায়, সেই-রকম প্রাণ-আকুল-করা ডাক শুনতে পেতাম। বুকের ভেতরটা তখন কেমন যেন গুর্ গুর্ করে কান্না পেত; মনে হত—ঐ যাঃ! ট্রেন ছেড়ে দিলে! ঐ যাঃ! চলে গেল! আমার আর যাওয়া হল না, মাকে দেখা আর হল না!

ধড়মড়িয়ে আমি উঠে বসতাম।

এরকম যার অবস্থা তার পক্ষে কি পণ্ডিচেরীকে ভুলে থাকা সম্ভব? না, ভুলিনি। কালপূর্ণ হবার অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিলাম মাত্র। তারপর বি-এ পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই সুরু হয়ে গেল আশ্রমে পত্র লেখা।

আমার প্রথম পত্রখানি লিখেছিলাম শ্রীমাকে।

কিন্তু তখন কি ছাই পত্র লিখতেই শিখেছিলাম? বি-এ পাশ করতে যাচ্ছি, তবু কেমন করে পত্র লিখব তা নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে গেলাম। এ তো আর চাকরীর দরখাস্ত কিংবা অফিসে ম্যানেজারের কাছে ছুটির আবেদন-পত্র নয় যে, যেমন হোক লিখলেই চলবে। এ যে দিব্য জননীকে অন্তরের প্রার্থনা জানানো!

এ-কাজ যেমন সহজ তেমনিই আবার কঠিন। তার ওপর, আমার যে অনেক কথা জানাবার আছে—সব কথা না বললে যে তৃপ্তি হয় না।

তাই লিখতে বসে কত শত প্রশ্ন আসে: মা কি আমাদের মানুষী মা যে, যেটুকু লিখে জানাব তিনি সেইটুকুই শুধু জানতে পারবেন, আর বাকীটা তাঁর অগোচর রয়ে যাবে? এ কিরকম আমার বুদ্ধি?

আবার ভাবি, তাহলে মাকে পত্র দেবারই-বা প্রয়োজন কি? তিনি তো আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। তখন আবার প্রশ্ন জাগে—তবে কেন তাঁর উত্তর পাইনে?

তারপর আবার এদিকেও ভয় আছে—মায়ের অমূল্য সময় আমার এ-সব বাজে কথা শোনায় নষ্ট হয়ে না যায়! কিংবা আমার আবেগের কথা শুনে মা যদি অনুমতি না দেন?

তবু অন্তর বললে, মাকে পত্র দিয়ে জানাবার প্রয়োজন আছে—যে-মা শরীর ধারণ করে পণ্ডিচেরী আশ্রমে অবস্থান করছেন, পত্রের দ্বারা সেই মাতৃ-চেতনার সংস্পর্শে আসা, তাঁর শক্তির কাছে সমস্যাগুলি খুলে ধরার একান্ত প্রয়োজন আছে।

তাই করলাম। সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে মাকে লিখলাম।

কিন্তু সে-পত্রের কোন উত্তরই পেলাম না।

মাসখানেক পরে আবার একখানি পত্র দিলাম। প্রত্যেকবারই কিন্তু এই ক'টি কথা মাকে লিখতে ভুলিনি যে, আমার বয়স এত এবং আমি এই এই কাজ জানি। কারণ আমার তো আর কোন যোগ্যতা নাই আশ্রমে থাকবার? মা যদি নিজগুণে কৃপা করে আমার শুধু সেবাটুকুর বিনিময়ে আমাকে থাকবার অনুমতি দেন—এই ভরসা আর কি।

দ্বিতীয়পত্র পোষ্ট করেও উত্তরের জন্যে অধৈর্য হলাম না। জানি মা কোন বিষয়ে অধৈর্য পছন্দ করেন না।

কিন্তু হায়! দু'মাস কেটে গেল, সে-পত্রেরও উত্তর এল না। তবু ভাবলাম, পোষ্ট অফিসেই আমার চিঠি দুটো মার গেছে, মা'র হাতে পৌঁছেনি। আজকাল পোষ্ট অফিসগুলোর যা দায়িত্বজ্ঞান হয়েছে! হয়ত চিঠিটা কোথায় ফেলেই দিয়েছে! এখন যে কুড়িয়ে পাবে সে-ই পড়ে ফেলবে! ছিঃ ছিঃ! কত ভাবের কথা লেখা ছিল। তাছাড়া আমার নাম-ঠিকানাও দেওয়া আছে—যে পাবে সে আমাকেও চিনবে আর আমার অন্তরের কথাও জেনে ফেলবে। এসব চিন্তা করে সমস্ত শরীরটা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠল!

তথাপি একেবারে নিরাশ হয়ে বসে থাকতেও পারলাম না। আবার একখানি পত্র দিলাম। এবার কিন্তু মাকে নয়, দিলাম নলিনীদাকে। তাঁকে আমার সব কথা খুলে লিখলাম, বললাম—একবার আশ্রমের দরজা থেকে ফিরে এসেছি, এবার আপনাদের কথামত বি. এ. পড়ে আশ্রমে যেতে চাই। আপনি আমার কথা দয়া করে মাকে জানাবেন।

কিন্তু কী দুর্দৈব! নলিনীদাকে দেওয়া পত্রের উত্তরও এল না। মাসখানেক পরে আবার একখানি পত্র দিলাম। তারপর আর এরকম একখানা দু'খানা নয়, কিছুদিন পর পর সাত আটখানা খামে পত্র দিলাম নলিনীদাকে, অথচ একটারও উত্তর এল না।

কিন্তু এবার আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যে, চিঠিগুলো পোষ্ট অফিসের দোষে মার গেছে, আশ্রমে পৌঁছেনি। ঠিক বুঝে ফেললাম, নলিনীদা আমার পত্র সবই পেয়েছেন; যে-কোন কারণেই হোক তিনি উত্তর দেওয়া বিবেচনা মনে করেননি। মনকে বোঝাই, আমার মত কত হাজার হাজার মানুষ তাঁকে নিত্য দিন পত্র দিয়ে বিরক্ত করছে—সব পত্রেরই কি তাঁর জবাব দিলে চলে?

এই সব চিন্তা করে হতাশায় চুপ করে থাকি। এমনকি, কাউকে এ-সব কথা জানাতেও পারি না। পাছে তারা আমার গোপন উদ্দেশ্য জেনে ফেলে—এই ভয়। তাছাড়া জানাব কাকে? কে দেবে আমাকে পরামর্শ? একমাত্র আছেন দেশের পাঠমন্দিরের ডাক্তারবাবু। অথচ তাঁকেও এ-সব কথা জানাবার ইচ্ছা নাই।

এমনি সময়ে হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল! নলিনীদাকে সাত-আটখানা পত্র দেবার পর আমার একটা নূতন অনুভব এসে গেল: লোকে কথায় বলে না—কারো সঙ্গে সাত পা গেলে তার সঙ্গে মিত্রতা জন্মে—আহু সপ্তপদী মৈত্রী? নলিনীদার সঙ্গে আমি সাত-পা কেন, এক পা-ও তখনো যাইনি ঠিক; কিন্তু আমি যে তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সাত-আটখানা পত্র লিখেছি। দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে করতে ভক্ত যেমন দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তাঁর সঙ্গে একটি আন্তর-সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনি নলিনীদাকে দাদা সম্বোধন করে অন্তরের কথা নিবেদন করতে করতে একদিন আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম—এ কী করে সম্ভব হল? নলিনীদা যে আমার পরম আপনজন। শুধু আজ বলে নয়, কত যুগ যুগ থেকে তিনি আমার আত্মীয়। তবে সেই নলিনীদা কেমন করে আমার পত্রের উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছেন?

মনে হল, এ সত্যিই অসম্ভব! এমন হতেই পারে না!

এ অনুভবটি আমার কাছে এত সত্য হয়ে উঠেছিল যে, পরের একখানি পত্রে সেই কথাটি তাঁকে আবার লিখেও ফেললাম। আর তারপরেই সেই অসম্ভব সম্ভব হয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে নলিনীদা পোষ্টকার্ডে উত্তর লিখে পাঠালেন:

To......... 16.11.59

You may contact "Sri Aurobindo Pathmondir"—15 Collage Square, Calcutta and valunteer your services to the Institution, which is a branch of ours. You may speak to Manik Mitra, the Librarian, and he will give you every help.

Yours sincerely—Nolini Kanta Gupta

ছোট্ট চিঠি। তবু বার—বার পড়ি। কিন্তু নাঃ! তৃপ্তি পেলাম না! কোথাও এতটুকু আশার আলো নেই—হ্যাঁ-ও নয়, না-ও নয়। কোনটাই স্থিব সিদ্ধান্ত হল না। এমন কি মায়ের দর্শনের জন্যেও অনুমতি নেই।

এ যে হরষে বিষাদ হল! এমন উত্তর পাওয়াব চেয়ে না-পাওয়াও যে ছিল ভাল? অন্তরের প্রেরণানুযায়ী তবু যা হোক একটা কিছু করবার স্বাধীনতা থাকত? এখন যে সবদিক বাঁধা হয়ে গেল! কোলকাতা পাঠমন্দির তো আমার অচেনা নয়? ছোট চিঠিতে কি সব কথা জানানো যায়! তা হলে জানাতাম, প্রতি শনি-রবিবারে আমি পাঠমন্দিরে যাই, ধ্যানে লেকচারে যোগদান করি। সেখানে কেউ আমাকে চেনেন না বটে, আমি কিন্তু তাঁদের সকলকে চিনি।

কিন্তু সেই পাঠমন্দিরে আমি থাকব কেমন করে? সেটা তো সবসময় থাকবার জায়গা নয়? পাঠমন্দিরে তো আমি শুধু সেবাটুকুই দিতে চাইনে? আমি নিজেকেই যে সর্বাংশে দিয়ে দিতে চাই—আমার পড়াশুনা, প্রেসের কাজ, মামার বাসাবাড়ি সব ছেড়ে দিয়ে আমি যে সেইখানেই বাস করতে চাই! তাছাড়া যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যার জন্যে মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সেই মাকে দর্শন করার, এবং তাঁর কাছে থাকার কি ব্যবস্থা হবে?

এদিকে বি. এ. পরীক্ষাটা কাছাকাছি আসতেই জীবনেরও এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। পিতামাতা নাই থাক, তবু আরো যেসব আত্মীয়েরা আছেন তাঁদের কাছ থেকে এবার জোর তাগাদা এসেছে—বি. এ. পাশ করে সংসারে আর পাঁচজন যা করে, সেই বিয়ে-থা করে সংসারী হতে হবে। পাকার ঘর-দোর অব্যবহারে অযত্নে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এবার একটা ভাল চাকরী চায়, অনেক টাকা-পয়সাও রোজগার করতে হবে!

আমি এখন কি করি? অথচ যে কোন একটা পথ বেছে নিতেই হবে—হয় আশ্রমজীবনের পথ, আর না-হয় সংসার জীবনের পথ। দু'পথের মাঝখানে এভাবে ঝুলে থাকা চলবে না।

অবশ্য আশ্রম থেকে পত্রের উত্তর এমন সময় পৌঁছেছিল যখন এসব কথাও আমার ভাবার সময় ছিল না। কারণ তখন আমি ভীষণ ব্যস্ত পরীক্ষা নিয়ে। টেষ্ট পরীক্ষার পর আমাকে দেশে যেতে হবে, নিরিবিলি পড়াশুনা করার জন্যে। তাই সব চিন্তাকে সরিয়ে রেখে দেশে চলে যেতেই আমি বাধ্য হলাম।

দেশে গিয়ে পাঠমন্দিরে যেমন প্রণাম করতে যাই তেমন গেলাম। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলেন—কি, এমন অসময়ে এলে যে?

বললাম—পরীক্ষা কিনা, তাই কলেজের ছুটি হয়ে গেল।

—ওঃ, তোমার তো বি. এ. ফাইন্যাল পরীক্ষা? তোমার কি যেন কম্‌বিনেশন ছিল—বাংলায় অনার্স নিয়েছিলে না?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বি. এ. পাশ করে কি করবে ভাবছ? এম. এ. পড়বে তো? এক্ষেত্রে সবাই যা বলে আমিও তাই বললাম—আগে পাশটাই করি, তারপর ও-সব ভাবা যাবে।

—তা হলেও, কি করবে একটা কিছু তো সিদ্ধান্ত করে রেখেছ?

ডাক্তার বাবুর কাছে কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা আর হল না। বললাম—সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি পড়াশুনা আর করব না।

ডাক্তারবাবু তখন জিজ্ঞেস করলেন—তবে কি করবে?

—পণ্ডিচেরী চলে যাবার জন্যে ভীষণ ইচ্ছে করছে, দেশে আর থাকতে পারছি না! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—পণ্ডিচেরীতে আমি আট-দশ খানা পত্র দিলাম, কিন্তু তার উত্তর পাইনে কেন বলতে পারেন?

—একটারও উত্তর পাওনি?

—এই শেষ পত্রটার উত্তর পেলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি চিঠির সঙ্গে রিপ্লাই কার্ড দিয়েছিলে?

ওহো! রিপ্লাই কার্ড তো একটাও দিইনি! ও-বুদ্ধিটা একেবারেই আমার হয়নি? আর আমারও এমন অবস্থা, কাউকে যে জিজ্ঞেস করব তারও লোক পাইনে। বার বার তখন আপনার কথা মনে হচ্ছিল!

ডাক্তার বাবু এসব কথা শুনতে চাইলেন না, বললেন—কি লিখেছিলে ?

—আশ্রমে থাকবার অনুমতি চেয়েছিলাম।

—তা কি বললেন তাঁরা ? কাকে লিখেছিলে ? ডাক্তারবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাইলেন।

আমি সব কথাই তাঁকে খুলে বললাম : নলিনীদা আমাকে কোলকাতা পাঠমন্দিরে সার্ভিস দেওয়ার কথা লিখেছেন……

—তুমি নিজে কি ঠিক করলে ?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি। সামনে পরীক্ষার ঝামেলা কাটুক, তারপর ভেবে চিন্তে দেখব—তাতে বিষয়টার সম্বন্ধে সঠিক বিচার করার সুবিধে হবে। না হলে এখন তাড়াতাড়ি করে যে সিদ্ধান্ত নেব তা-ই হয়ত ভুল হবে—না আপনি কি বলেন ?

এবার ডাক্তার বাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন—আরে, তুমি কি নির্বোধ ? নিজের দেশে এমন একটা পাঠমন্দির থাকতে তুমি কিনা কোলকাতা পাঠমন্দিরে সেবা দিতে যাবে ? কোলকাতা পাঠমন্দিরে আছেটা কি ? একটা কাঠ-খোট্টা বাড়ির তে-মহালায় দুটো ঘর, চারদিকে দিনরাত ট্রাম বাসের শব্দ! আমাদের এই পাঠমন্দিরের মত এমন সুন্দর এ্যাট্‌মস্‌ফেয়ার আছে ? এমন ফুলের বাগান ফাঁকা জায়গা আছে ? সেখানে বেশির ভাগ মেম্বারই চাকুরে, না-হয় ব্যবসাজীবী। দিনের বেলা নিজেদের কাজ-কর্মের ধান্দা নিয়ে থাকেন, আর অবসর সময়ে পাঠমন্দিরে গিয়ে সেবা দেন। তুমিও তেমন ভাবে থাকতে চাও ? তোমাকে চিরকাল চাকরী করেই তাহলে চালাতে হবে। সেই যেখানে থাকছ খাচ্ছ সেখানেই থাকতে খেতে হবে। কিন্তু এখানে এলে তোমাকে চাকরী করতে হবে না। আবার কি, বসে বসে রাঁধা ভাত পাবে। এখানে থাকলে বাড়ীতে তোমার যা ভূ-সম্পত্তি আছে সে-সবেরও সত্ত্ব পাবে।

আমার সব চিন্তা-ভাবনাই ডাক্তারবাবু ভেবে দিলেন। আমি চুপ করে শুনছি দেখে তিনি আরো উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলেন—তারপর দ্যাখো, এই এতসব বাড়িঘর, এই সাজানো ফুলের বাগান, লাইব্রেরী, এমন একটা চালু ডিস্‌পেন্সারী—রোগীর কাছে চারটে করে পয়সা নিয়েও আয় দেয় মাসে পঞ্চাশ এক'শ টাকা, ধানের জমি প্রায় পনেরো কুড়ি বিঘে—এসবই তো তোমার হবে ? এসব দেখেও তোমার এখানে আসতে ইচ্ছে করে না ?

তাঁর সে-কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম—কিন্তু পণ্ডিচেরী তো তাহলে আমার কখনো যাওয়া হবে না, মায়ের দর্শনও হবে না ?

সে-সময় পাঠমন্দিরের মা এসে আমাদের কথা শুনছিলেন। ডাক্তাবাবু এই মাত্র আমাকে যে রাঁধা ভাত পাবার কথা বললেন তা তাঁকে লক্ষ্য করেই। তিনি ঐ মায়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন।

তা যাই হোক, মা এখন আমার সেই কথা শুনে বলে উঠলেন—হবে না কেন বাবা? আমরা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আশ্রমে মাকে দর্শন করিয়ে আনব—তাহলে তো হবে? নিজের দেশে এমন সুখের স্থান ছেড়ে কেউ আবার পণ্ডিচেরীতে গাদের মড়া হতে যায় রে বাবা? আমি তো হাজার সুবিধে পেলেও এ-জায়গা ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারব না!

আমি তবুও বায়না ধরি—কিন্তু নলিনীদা যে আমাকে কোলকাতা পাঠমন্দিরে সেবা দেবার আদেশ করেছেন, তার কি হবে?

ডাক্তারবাবু বললেন—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। ওসব আমি দেখছি—তুমি থাকতে চাও কিনা আগে বল দেখি? তুমি কোলকাতা থেকে নলিনীদাকে পত্র দিয়েছিলে তো? তাই তিনি কোলকাতা পাঠমন্দিরে সেবা দেবার কথা লিখেছেন। তোমার দেশের নামটা জানলে তিনি হয়ত এখানেই সেবা দিতে বলতেন। তোমার মুখের 'হ্যাঁ' পেলেই আমি এখুনি তাঁর অনুমতি এনে দেব—ভাবনা কি?

তথাপি তাঁদের সেদিন 'অচ্ছা আসবো' বলে কথা দিতে পারলাম না। কেননা, 'হাঁ' বলতে গেলেই যে বুকের অনেক জায়গায় টান ধরে! শুধু বললাম—আচ্ছা, নিজের সঙ্গে আগে বুঝে দেখি, তারপর বলব।

কিন্তু আবার কয়েকদিন পরেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কি, কিছু ঠিক করলে?

তাঁর আগ্রহ দেখে আমি বলে ফেললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঠিক করে ফেলেছি এইখানেই থাকব! আমি চাই না কোলকাতা পাঠমন্দিরে সেবা দিতে, চাই না পণ্ডিচেরী আশ্রমে থাকতে; চিরকাল আমি এই পাঠমন্দিরেই থাকব!

ডাক্তারবাবু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি? না মুহূর্তের আবেগের বশে বলছো?

সত্যি বৈকি! এই দেখুন আমার মন-প্রাণও এ ক'দিনে কেমন বদলে গেছে। ডায়েরীর খাতা থেকে দুটো দিনলিপি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো তাঁর কাছে পড়লাম:

১৯. ৩. ৬০ 'একটু একটু করে সমস্ত ইচ্ছাটি ডাক্তারবাবুর মতের দিকেই

এগিয়ে চলেছে। সমস্ত হৃদয় যেন এমনি একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ই খুঁজেছিল। অবশ্য এ-অবস্থাটি এসেছে পণ্ডিচেরীর চিঠি পাবার পর থেকে। এখনো তাই এক-একবার দুর্বল মুহূর্তে যখন এই চিন্তাটা এসে পড়ে যে, আর কখনোই আশ্রমে মায়ের কাছে আমার থাকা হবে না, তখন সমস্ত অন্তরটা এক বিপুল কান্নায় ভরে ওঠে! ছোটছেলের মত সে তখন আড়ি ধরে—আমি চাইনে এসব। পাঠমন্দিরের শান্ত নির্জন পরিবেশ চাইনে, পাটশিষ্য হতেও চাইনে, সাধনা-সিদ্ধিও চাইনে; আমি শুধু মাকে চাই। মাকে আমার চাই-ই—চাই!

'কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, আমার চাওয়ার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছার যেখানে মিল নেই, সেখানে আমার চাওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কোথাও ত্রুটি আছে। তা না হলে এমন হয় কেন?'

২২. ৩. ৬০ তারিখ 'আজকে আমার তরফ থেকে দেশের পাঠমন্দিরে থাকার পক্ষে সমস্ত অপছন্দ বাধাগুলি অপসারিত হল। নিজেকে আজ বড় মুক্ত, বড় হাল্কা বোধ হল! মনে হল, আমার কিছুই নাই, আমি সম্পূর্ণরূপে রিক্ত!'

কিন্তু কি আশ্চর্য! আমার এমন সত্য স্বীকৃতি শুনে ডাক্তারবাবু একটুও সন্তুষ্ট হলেন না? বরং তিনি যেন হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলেন। তাঁকে মনে হল যেন নূতন মানুষ—যিনি একান্তভাবে আমার আসা চাইছিলেন, এই একটু আগে আমার মুখে 'হ্যাঁ' শুনে যাঁকে কত প্রসন্ন দেখেছিলাম—এখন যেন তিনি সেই মানুষটি নন!

উগ্র মূর্তি ধারণ করে তিনি আমাকে বললেন—ছাখো বাপু, আগে থেকে বেশ ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখে তারপর এসো। আমি তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসতে কোনদিনই চাইনি। সেরকম প্রকৃতিই আমার নয়। এ-বিষয়ে আমি অনেক ঘা খেয়েছি! তোমার মত কতজনকে আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে এখানে রেখেছি। কিন্তু আজ তাদের একজনকেও কি দেখতে পাচ্ছ? তাই বলছি, বেশ ভাল করে বুঝে ছাখ, এখানে থাকতে পারবে কিনা? একটা যদি কোথাও তোমার পেছন-টান থাকে তো তোমাকে কখন্ যে টেনে নিয়ে চলে যাবে তা টেরই পাবে না!

আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি—আপনি নিশ্চয় এই ডায়েরীর কথা শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন? কিন্তু কি করব, ওটা তো সত্য কথা। আশ্রমে থাকতে পেলাম না বলেই তো এই পাঠমন্দিরে থাকতে চাই—এ সত্যটা আমিও যেমন জানি, আপনিও তো তেমন জানেন? কিন্তু এতে আপনার অসুবিধেটা কোথায়?

আমি ঠেকে শিখে সত্যিই আপনাকে বল্ছি, আর আমি কখনো আশ্রমের নাম করব না, এই পাঠমন্দিরেই চিরকাল থাকব! আপনি শুধু দয়া করে আমার জন্যে এইটুকু ব্যবস্থা করুন—

ডাক্তারবাবু একটু যেন নরম হলেন, বললেন—কি ব্যবস্থা বল ?

বললাম—নলিনীদা আমাকে কোলকাতা পাঠমন্দিরে সেবা দেবার কথা লিখেছেন, কিন্তু এই যে আমি এখানে থাকব মনস্থ করলাম এটা শ্রীমা অনুমোদন করলেন কিনা জানতে চাই ? আপনি সব কথা জানিয়ে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি এবং আশীর্বাদী ফুল আনিয়ে দেন ? তাহলে নিশ্চিন্ত হব যে, যা কিছু ঘটছে মায়ের ইচ্ছানুসারেই ঘটছে!

এবার ডাক্তারবাবু সত্যিই খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—আরে, তুমি কি মনে কর আমি এসব বিষয়ে কিছুই ভাবিনি ? তোমার জন্যে সব ঠিক করে রেখেছি। আমি জানতাম তুমি আসবে! তোমার সোল্টা এখানের জন্যেই নির্দিষ্ট করা আছে।

তিনি আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কত কথা বলতে লাগলেন : জানো, এই ক'দিনে কত লোককেই আমি জিজ্ঞেস করে ফেললুম তোমার কথা! সবাইকে বলি—হ্যা গো, কৃপা ছেলেটি কেমন ? কেমন ওর স্বভাব-চরিত্র ? ও যে এখানে আসতে চাইছে, কেমন হবে বলো দেখি ? যদিও তোমাকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, তবু এখন যে আরো অনেক কিছুই জানার প্রয়োজন ? বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীর উভয়ের যেমন খুঁটিনাটি খবর জানতে হয়, এ-ও যে তেমনি! আর জানো, আমার বাল্যবন্ধু নিশাপতিকেও তোমার কথাটা বললুম, সে খুব খুশী হয়ে তোমার সারা বছরের কাপড়-জামা দেবে বলেছে তার কাপড়ের দোকান থেকে···কি বলো, দিক্ না একটু সার্ভিস ডিভাইনকে ? আমি তাই 'না' করলাম না!······তারপর কিছু টিউশনির ছাত্র যোগাড করে দেব, ঘরে বসে ষাট সত্তর টাকা এসে যাবে—তোমার আর ভাবনা কি ? তাছাড়া তোমার নিজের জমি জায়গা গুলোও আয়ত্তে থাকবে······

আমার কিন্তু তাঁর কথা শোনায় আর মন ছিল না। ভাবছিলাম—কই, আমি তো কাউকে একবারও জিজ্ঞেস করলাম না ডাক্তারবাবু কেমন ? তাঁর কাছে আমি থাকতে পারব কিনা ? তারপর আরো একটা কথা ভাবছিলাম, পাঠমন্দিরে এলে কি আমাকে লোকের দানের কাপড় পরতে হবে নাকি ? সে কেমন হবে ? লোকে মুখে যতই বলুক, দু'একবার অন্তরের প্রেরণায় দিলেও তারপর যে কার্পণ্য এসে পড়বে ?

কিন্তু ডাক্তারবাবু আমাকে এ-সব ভাবনার হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনলেন, বললেন—এ্যাই ত্যাখো, তুমি পণ্ডিচেরীতে পত্র দেবে বলে কবে থেকে খসড়া তৈরী করে রেখেছি। এই বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে আমাকে দিলেন—এই চিঠিটা তুমি তাহলে নকল করে লিখে দাও?

আমি সেইদিনই হুবহু নকল করে লিখলাম: Our reverend Sri...... Adhyaksha of......Sir Aurobindo Pathmondir has kindly accepted me permanently as a devotee and worker of the Mother......

তারপর সেই চিঠির সঙ্গে রিপ্লাই দেবার জন্য একটি খাম এবং ডাক্তার বাবুর নিজের একখানি চিঠি ভেতরে দিয়ে পোষ্ট করে দিয়ে এলাম।

কিন্তু সে-চিঠির কোন উত্তরই এল না। এবার তো আর কোথাও ত্রুটী ছিল না? তাছাড়া আমরা ভাবতাম, ডাক্তারবাবুকে 'মা' বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন, তিনি একটা পাঠমন্দিরের অধ্যক্ষ? কাজেই তাঁর চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়বে?

কোন উত্তর না আসাতে ডাক্তারবাবু আমাকে পরামর্শ দিলেন—তুমি আবার একখানা পত্র দাও।

এবারেও তিনি চিঠির নকল লিখে দিলেন। চিঠির সঙ্গে পাঠালাম আমার একখানি পোষ্টকার্ড সাইজের ফটো।

অনেকদিন পরে আসবে-না আসবে-না করে সেই চিঠির উত্তর এল।

অবশ্য সেই উত্তর আসার পেছনে ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে যা আমি কয়েক মাস পরে জেনেছিলাম: একদিন ডাক্তারবাবু তাঁর এক বন্ধুর সাথে আশ্রম সম্পর্কে আলোচনার সময় বললেন,—তুমি অপেক্ষা করে থাকার কথা বলছো? তা তো আমাদের থাকতেই হয়। এই কৃপার থাকার ব্যাপারেই ত্যাখ না—ও মাকে কত চিঠি দিলে আমি নিজে দিলাম সেইসঙ্গে। কিন্তু কোন উত্তর এল কি? তারপর আমি জোর করে নলিনীদাকে লিখলাম—নলিনীদা, কতদিন থেকে আপনাকে এবং মাকে পত্র দিচ্ছি, কিন্তু কেন জানি না তার উত্তর পাচ্ছি না। আমার এই পাঠমন্দিরে আমি একা, আমার পরে পাঠমন্দির দেখবে কে? একজন আমার উত্তর-সাধক চাই। এই ছেলেটিকে পেয়েছি, একে আমি কিছুতেই হাত-ছাড়া করতে পারব না। মা যদি একে পারমিশন না দেন, তাহলে আমি আমার নিজের দায়িত্বে একে রাখব জানবেন। এই কথা লিখতেই নলিনীদা'র জবাব এসে গেল!

এসব কথা আমি নিজের কানে শুনলাম, কিন্তু অতীতের ঘটনা বলে কিনা জানি না আমার একটুও ভাবান্তর হল না।

সে যা হোক নলিনীদা আমার নামে মায়ের আশীর্বাদী ফুল ও পত্র পাঠালেন। পত্রে লেখা আছে :—'স্নেহাস্পদেষু, মা তোমার ছবি দেখলেন। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করবে—আশীর্বাদী ফুল একটি এই সঙ্গে পাঠালাম। আশা করি, কাজকর্ম ওখানে সুষ্ঠুভাবে করবে। আমার প্রীতি-স্নেহ গ্রহণ করবে। অমুককেও আমার প্রীতি স্নেহ এবং মায়ের আশীর্বাদ জানাবে।'

ডাক্তারবাবু বললেন—কি, এবার খুশী তো? মনের মধ্যে আর খেদ নাই তো?

বললাম—না, আব কোন খেদ নাই। আমি এরকমই চাইছিলাম।

জমি-জায়গা খরিদ করার মত পাঠমন্দিরে বাসের পাকা রেজেষ্টারী হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু পাঠমন্দিরে এসে ওঠা। সেটা হবে পরীক্ষার পর কোলকাতা থেকে ফিরে এসেই।

তারপর একদিন পরীক্ষাটাও হয়ে গেল। এসে পড়ল সেই শুভ দিনটি—১২ই জুন, ১৯৬০ সাল। খুব ভোরে স্নান করে এলাম। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি সেরে ডায়েরীর খাতায় প্রার্থনা লিখলাম। যাত্রার পূর্বে আরো একবার মা-শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলাম। তারপর হাতে একটি স্যুটকেস নিয়ে দরজা থেকে বেরুতে যাব, এক পা বোধ হয় বাড়িয়েওছি, এমন সময় আমার মাথার ওপর থেকে ঠিক মানুষের গলার স্বরে স্পষ্ট করে কে যেন বললেন—'ও তোমার ক্ষতি করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে পডলাম। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম—কেউ কোথাও নেই!

আবার আশ্চর্য কি, ঐ বাণীটি শোনামাত্র আমি তার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করে ফেললাম। বুঝলাম, যাঁর কাছে যাচ্ছি তিনিই সেই ব্যক্তি। একদিকে কিন্তু ঐ 'ও'-সর্বনামটি ডাক্তারবাবুর পক্ষে প্রযোজ্য হতেই পারে না। কেননা, আমি তাঁকে আপনি সম্বোধন করে থাকি। অথচ এ-সব বোঝবার বাধা থাকা সত্ত্বেও আমাকে কিন্তু ঠিকই বুঝিয়ে দেওয়া হল আসল অর্থটি।

তা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু আমি এখন করি কি? এমন জীবন-মরণ সমস্যায় আমি আর কখনো পড়িনি। যাকে ক্ষতিকারক ব'লে আগে থেকেই জানলাম, তার কাছে এবার যাই কি করে!

কিন্তু আবার না গিয়েই-বা উপায় কি? ডাক্তারবাবু এতক্ষণ হয়ত আমার অপেক্ষায় ঘর-বার সুরু করে দিয়েছেন। যদি না যাই তাহলে ঘরে চুপ করে বসে থাকা আমার চলবে না। সেটা হবে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা! সুতরাং এখুনি গিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সেই কাজটা করবে কে?

আবার শুধু যেমন-তেমন ভাবে জানালেই তো চলবে না? না-যাবার কারণটাও বিশদভাবে তাঁকে প্রকাশ করে বলতে হবে!

হায় হায়! এর চেয়ে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর একটাও আছে নাকি? তাঁকে যে তিন মাস আগে থেকে পাকা কথা দিয়ে রেখেছি! তাছাড়া, এ-সব কথা পণ্ডিচেরীতে মায়ের কাছে চলে গেছে, তিনি সম্মতি জানিয়ে আমায় আশীর্বাদী ফুল পাঠিয়েছেন। এবার আমি যাব না বললেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু শ্রীমা'র কাছে খবর পাঠিয়ে দেবেন। তখন আব কোলকাতা পাঠমন্দিরেও আমার জায়গা হবে না! তারপর আশ্রমেই-বা যাব কোন্ মুখে—কোথাও আমার স্থান হবে না!

এদিকে আবার আমার পাঠমন্দিরে যাবার খবরটা দেশের অর্ধেক লোক এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে—ডাক্তারবাবু সবাইকে বলে দিয়েছেন, বিনা প্রয়োজনেও বলেছেন।

তাই এখন মনে হচ্ছে—ওঃ! ডাক্তারবাবু কী নিষ্ঠুর! পাছে আমি কথা দিয়ে পরে আর না যাই, সেই কারণে অপ্রয়োজনেও সকলের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছেন। তাছাড়া তিনি আমাকেও গতকাল পর্যন্ত সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—দেখো বাপু, অনেককে বলে রেখেছি, লোক হাসিও না যেন—কথা রক্ষে কোরো!

এদিকে, কাল থেকে ময়রার দোকানে সের দুই মিঠাই-এর বায়না দেওয়া আছে। আজ যখন পাঠমন্দিরে যাব তখন পথের মাঝে দোকান থেকে সেগুলি নিয়ে নেব। উপরন্তু ডাক্তারবাবুর জন্যে স্যাক্রার দোকান থেকে একটি আংটী গড়িয়ে রেখেছি—সেটিরই-বা কি হবে।

সবদিক ভেবে কোথাও আমি কূল কিনারা দেখতে পেলাম না! চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম! হাতের স্যুটকেস ঘরের মেঝেয় রেখে তক্তপোষের ওপর বসে পড়লাম। যিনি বাণী দিয়ে আমাকে সাবধান করে দিলেন তাঁরই কাছে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম: হে গুরু! তুমি বাণী দিয়ে এক অদৃশ্য

বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেছো। কিন্তু এবার বলে দাও কি করলে তোমার বাণীর সত্য রক্ষা হয়? তুমি যেমন বলবে আমি তা-ই করব—তাতে যদি সমস্ত দেশের লোক ছি ছি করে; কখনো যদি আশ্রমে যাওয়া আমার না হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত!

কিন্তু দেবতার বাণী তো প্রয়োজন হলেই ঘন ঘন আসে না? তাই আর কিছু আদেশ না পেয়ে আমি অন্তরস্থিত মাকে বললাম: তুমি স্থিরা বুদ্ধিরূপে আমাকে সত্য পথে নিয়ে চল, মা!

[আট]

ভবিতব্যতা কে খণ্ডাতে পারে ? অন্তঃস্থ মা আমাকে এই বুদ্ধিই দিলেন যে, তুমি পাঠমন্দিরে যাও। যদি পাঠমন্দিরে যাওয়া তোমার নিষেধই থাকত, তাহলে বাণীও সেইভাবেই আসত যে, "তুমি ও-পাঠমন্দিরে যেওনা।" তা যখন আসেনি, তখন শুধু ডাক্তারবাবু থেকেই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে নির্দেশের আমার একান্ত প্রয়োজনও ছিল। কারণ এই কিছুদিন থেকে পাঠমন্দিরকে আশ্রম এবং ডাক্তারবাবুকে শ্রীমায়ের প্রতিনিধিরূপে বরণ করে নিয়ে আমি এক অনাবিল আনন্দ পেতে স্বরু করেছিলাম। সহসা যেন ডাক্তারবাবুর প্রতি আমার অন্তরে গভীর ভালবাসা ও নির্ভরতার জন্ম হল। এর পূর্বেও তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি, তাঁর আদেশ-উপদেশ অকুণ্ঠচিত্তে পালন করেছি সত্য, কিন্তু এখনের মত তাঁর প্রতি কখনো এত নির্ভরশীল হইনি; কখনো এতখানি ভালও বাসিনি। আগে করেছি, তার উদ্দেশ্য ছিল হয়ত তিনি শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত—তাঁর কৃপাতে মা-শ্রীঅরবিন্দের কৃপা আমার লাভ হবে, বা এই ধরণের কিছু। পরন্তু বর্তমানে তাঁর প্রতি একটা অকারণ ভালবাসা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার জীবিত আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর মতো হিতৈষী আর কেউ নাই! মনে মনে একটা ছবি এঁকে রেখেছিলাম : প্রথম দিন গিয়েই ডাক্তারবাবুকে ওপরের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁব হাতে আংটিটি পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বলবো :

'বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥'

তাই এখন মনে হল, এ-বিষয়ে আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যেই এই বাণী এসেছে। আমাকে যেন বলা হল,—অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়গো, দেখে পথ চলো।

সুতরাং পাঠমন্দিরে যাওয়াই স্থির রইল। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের নাম নিয়ে আবার আমি যাত্রা স্বরু করলাম।

পাঠমন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি, সত্যই ডাক্তারবাবু আমার দেরী দেখে একবার ঘর একবার বাহির করছেন! আমাকে দেখেই সহর্ষে গ্রহণ করলেন—এসো এসো! তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছি কখন্ থেকে!

বললাম—আহা! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আমার জন্যে? আমার তো

অনেক দেরী হয়ে গেল আসতে! তা আপনি ভেতরে বসে থাকলেই তো পারতেন?

—পারতুম তো। কিন্তু দরজা খুলে রাখবার উপায় আছে? এখুনি লোকের গরু-ছাগল ঢুকবে বাগানে।

—কেন, রেলিং সেট্‌টা দিয়ে দিলেই তো হত?

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসতে হাসতে বলেন—তা কি হয়? আজ তুমি পাঠমন্দিরে প্রথম আসছ, একটা শুভলক্ষণ বলেও তো আছে? তুমি এসে দেখবে দরজা বন্ধ! পাগল ছেলে, চলো চলো তুমি ভেতরে চলো।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ভেতরে গিয়ে দেখি স্কুলের মাষ্টার মশাইরা রঞ্জন এবং আরো অনেকে বসে আছেন। তাঁদিকে ডাক্তারবাবুই বসিয়ে রেখেছেন আমি আসব বলে। আমাকে দেখে তাঁরাও হর্ষ প্রকাশ করলেন একসঙ্গে—এই তো এসে গেছে! আটটায় আসবার কথা, তার জায়গায় দশটা বেজে গেল! আমরা সবাই ভেবে পড়েছিলাম……

তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড্ড দেরী হয়ে গেল।

স্যুটকেস ও মিষ্টির হাঁড়ি রেখে মন্দিরে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করলাম।

ডাক্তারবাবু মাকে বললেন—কৃপা মিষ্টি এনেছে, সবাইকে দাও।

মা তখন সবাইকে মিষ্টি খেতে দিলেন। মাষ্টার মশাইরা ব্যস্ত হয়ে বললেন—আগে কৃপাকে দেন, ওর জন্যেই তো আজ আমাদের মিষ্টি খাওয়া?

মা বললেন—সব্বাইকে দেবো। ওতো আমার ঘরের ছেলে, ওকে পেট ভরে মিষ্টি খেতে দেব!

সেদিন পাঠমন্দিরে মহা আনন্দোৎসব পড়ে গেল। সবার চেয়ে ডাক্তারবাবুর আনন্দ আর ধরে না! পাঠমন্দিরে যে যখন আসে, এমন কি যারা ওষুধ আনতে আসে কিংবা পরিচিত মানুষ রাস্তা দিয়ে যায়, তাদেরও ডেকে এনে বলেন—জানো আজ আমাদের পাঠমন্দিরে কে এসেছে? দেখে যাও, দেখে যাও!

ডাক্তারবাবুর কাণ্ড দেখে আমি লজ্জা পেয়ে যাই, বলি—ওঁরা তো জানেন, কালকেই তো আপনি ওঁদের বললেন?

—তাই নাকি, বলেছি নাকি? তা হোক, আনন্দের খবরটা আর একবার দিলেই-বা ক্ষতি কি? তাঁদের বলেন—জানো, আমি চেয়েছিলাম একটি শিক্ষিত ছেলে পাঠমন্দিরে আসুক। অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত কত ছেলেই তো এখানে

আসতে চায়? আমি তাদের ভাগিয়ে দিই। ভালো খেতে পরতে পায় না, কিংবা হয়ত চাকরী জোটাতে পারে না বলে দায়ে পড়ে এখানে থাকতে চায়। তেমন ছেলেকে নিয়ে আমার কি হবে? বাইরের কোন দর্শক এসে হয়ত কোনদিন শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের পথ এবং আদর্শ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলো? তখন শিক্ষিত ছেলে না হলে কি করে তাকে ইংরেজীতে বাংলাতে দু'কথা বুঝিয়ে বলবে? শ্রীঅরবিন্দের যোগ তো মূর্খের জন্যে নয়? সব দিক দিয়েই কৃপা আমাদের কম্‌পিটেণ্ট।······দাঁড়াও দাঁডাও, চলে যেওনা যেন। কৃপা মিষ্টি এনেছে, একটু মিষ্টি-মুখ করে যাও।

সেদিন দুপুরবেলা মা তার ঘরে অনেক রকম অন্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে এবং আশ্রমের ডাইনিং রুমের মত দুধ কলা দিয়ে পরিপাটি করে ডাক্তারবাবুর পাশে বসিয়ে আমাকে ভোজন করালেন।

খাবার পর ডাক্তারবাবুর একটু দিবা নিদ্রার অভ্যেস আছে, তিনি ওপরের ঘরে শুতে যাবার সময় আমাকেও একটু বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে বলে গেলেন। দক্ষিণদিকের একটা প্রশস্ত ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে কেমন ভাবে আমি জিনিসপত্রগুলি রেখেছি সেগুলি আগে দেখে নিলেন। তারপর তক্তপোষের কোন্ দিকে মাথা, কোন্ দিকে পা রেখে শোব, সেটিও বলে দিলেন।

দিনের বেলায় আমার শোওয়া অভ্যেস ছিল না, পরন্তু ডাক্তারবাবু এমন করে বলে গেলেন যে একটু না শুয়ে পারলাম না। তা নইলে যে তাঁর আদেশ মানা হয় না? দরজার দিকে পিছন ফিরে কাত হয়ে শুয়েছিলাম, তিনি কখন্ একসময় এসে আবার আমাকে দেখেও গেলেন।

তাঁর ওঠার আগেই আমি মন্দিরের দালানে বসেছিলাম, তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন বিশ্রাম হল?

বললাম—ভাল।

—হ্যাঁ, ভাল বলেই মনে হচ্ছে। তুমি শুয়েছিলে আমি এসে একবার দেখে গিয়েছি। তুমি সেইটুকু সময়ের মধ্যেই এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলে যে জানতে পার নি। তবে তোমার শোওয়াটি ভারী সুন্দর, মানে খুব কন্‌সাস্।

শুনে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। হয়ত অন্তরে একটু আনন্দও হল এমন অভিভাবক পেয়ে যিনি আমার সকল কাজে চোখ রাখেন!

বিকেল থেকে রাত্রিতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে কত

কথা বললেন--আমি কখন্ কি করি, কি খাই, কেমন পরি' আমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা—সব তিনি একটি একটি করে জেনে নিলেন। অথচ পাঠমন্দিরে আমি আজ নূতন নয়, কত দিন কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডাক্তারবাবুর কাছে কাটিয়ে গিয়েছি। তবু আজ আবার নূতন করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব জেনে নিলেন। তাঁর মুখে এসময় এমন সুন্দর একটি হাসি ফুটে ওঠে যে, সেই হাসিটি দেখবার জন্য কথা বলে তাঁকে খুশী করতে ইচ্ছে হয়। লক্ষ করে দেখেছি, এটা শুধু আমিই করি তা নয়; সবাই করে। যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসে তারা সবাই তাঁর এই হাসি দেখবার জন্যে পেটের সমস্ত গোপন কথা যা কোন অন্তরঙ্গকেও হয়ত বলতে পারত না, সহজে তা বলে ফেলে। আর ডাক্তারবাবু একেবারে ছোট ছেলের মত হেসে গড়িয়ে প'ড়ে সে-সব কথার রসাস্বাদন করেন।

সেদিন কিন্তু রাত্রিতে গরমের জন্যে ঘরের মধ্যে শুতে পারলাম না। মন্দিরের দালানে শুলাম। ডাক্তারবাবু এসে কতবার দড়ি খুলে কতবার দড়ি পরিয়ে নিজের হাতে আমার মশারী খাটিয়ে দিলেন। আমার শয্যার সম্মুখে সিংহাসনের ওপর শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ, আর আমার মাথার কাছে ফুটন্ত বেলফুলের ঝাড় থেকে কী মধুর সুগন্ধ ভেসে আসছিল—আমি কখন্ ঘুমিয়ে পড়লাম জানতেই পারলাম না। সারাদিনের মধ্যে যাত্রাকালের সেই অদ্ভুত ঘটনাটা আমি একবার স্মরণ করবার অবসরই পেলাম না!

এদিকে পাঠমন্দিরেও নিত্য নতুন একটা ক'রে নাটকীয় ঘটনা ঘটতে লাগল: আজ কাকা আসেন বাড়ি থেকে, কাল ভগ্নিপতি আসেন, পরশু মামাতো ভাইরা আসে, তার পরদিন বড়দিদি আসেন। প্রথম প্রথম তো তাঁরা এসেই মহা অনর্থ বাধিয়ে তুললেন। আমার ভগ্নিপতি পাঠমন্দিরে ঢুকেই তো ডাক্তার বাবুকে গালি-গালাজ সুরু করে দিলেন। তাঁর ধারণা, ডাক্তারবাবুই আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করে পাঠমন্দিরে আটকে রেখেছেন। তাই তিনি ডাক্তার বাবুকে শাসিয়ে বললেন—যে-কোন উপায়েই হোক আমি ওকে বের করে নিয়ে যাব। দরকার হলে কোর্ট কাছারী করবো, পুলিশ লাগাবো! দেখি আপনি কেমন করে ওকে আটকে রাখেন? আমি সত্যই ছিলাম দুর্বল ভাতু, প্রকৃতির। তাদের দাপটের কাছে এতটুকু হয়ে গেলাম। ডাক্তার বাবুকেই সব হাঙ্গামা পোয়াতে হল। তিনিই কাউকে মিষ্টি কথা বলে, কাউকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করলেন।

যখন সকলেরই যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল, তখন ডাক্তারবাবু একদিন আমাকে বললেন—কৃপা, পারতে তুমি ঐসব চণ্ড-চামুণ্ডাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা

করতে? জানি তো তোমাকে, ঐরকম মিউ মিউ করলেই তোমার ঘাড়টি ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ত! কিন্তু আমি দেখলুম, নাঃ, আমাকেই এগুতে হবে। তারপর দেখলে তো, সবাইকে এমন হুমকি দেখালুম, ঝড়ের মুখে কুটোর মত কে কোথায় উড়ে গেল! আর কেউ আসছে দেখছ?

বললাম—সত্যিই আমি পারতাম না ডাক্তারবাবু!

কিন্তু তা যা হোক যে-কথা বলছিলাম—এমন শান্তির অবস্থা, এমন ভুলে থাকা পনেরোটা দিনও টিকলো না। বারোই জুন পাঠমন্দিরে এসেছি, আর পঁচিশে জুন ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন—কালকের দিনটা খুব ভাল, জগন্নাথের রথযাত্রার দিন। এদিনে লোকে ফল-ফুলের গাছ লাগায়। কাল আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।

দীক্ষা বলতেই বুকের ভেতরটা কেমন ধক্ করে উঠল! কারণ ও-জায়গাটায় যে আমার দারুণ ব্যথা—গুরু যে বলে দিয়েছেন তুমি আর কারু কাছে যেওনা, আমি তোমায় গ্রহণ করেছি। তাই মনে মনে বললাম—সে কি, উনি আমাকে বাগে পেয়ে এবার শিষ্য বানিয়ে ছাড়বেন নাকি?

তার কথাটাই তাঁকে তাই জিজ্ঞেস করে ফেললাম—দীক্ষা দেবেন? ডাক্তারবাবুরও যেন ঐ জিজ্ঞেস করাতেই চমক ভাঙ্গল। কারণ আমি খুশী হয়ে তাঁকে 'হ্যাঁ' বলতে পারলাম না। তিনি এবার সহজ করে বুঝিয়ে বললেন—হ্যাঁ, তোমাকে অন্তরাত্মার ধ্যান শিখিয়ে দেব।

মনটা তখন আশ্বস্ত হল—তাই হোক! উনি তো আমাকে অন্তরাত্মার ধ্যান শিখিয়ে দেবেন বলছেন? যদিও আমি নিজে একরকম করে অন্তরাত্মার ধ্যান করি এবং তাতে আনন্দও পাই, তথাপি আর একজন কেমন করে ধ্যান করে, কি পায় সেখানে—সেটা জানবার জন্যে আমার একটু কৌতুহল হল।

একদিকে এই কৌতুহলটা হয়ে একটা বিপদ কাটল। কেননা যদি এটি আমার অন্তরের বিরুদ্ধে ঘটত, তাহলে তো সেইদিনেই বিরোধের সৃষ্টি হয়ে যেত? এই যেমন দু'দিন পূর্বে একটু হয়ে গেল:

সে-সময় আমার ডায়েরী লেখার অভ্যেস ছিল—প্রতিদিনের ভাব অনুভূতি ঘটনা সব লিখে রাখতাম। সে দিন রাত্রিতে শোবার পূর্বে সেইরকম লিখছিলাম। ডাক্তারবাবু আমার আগেই ওপরে শুতে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু আবার কেন জানি না আমার কাছে উঠে এলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—এখনো শোওনি? কি লিখছো এত?

ভয় পেয়ে আমি চমকে উঠি। এখন কি লিখছি বললেই তো তিনি শুনতে চাইবেন ?

তবুও সত্য কথাটা বলতে হল। বললাম—এ-ই একটু প্রেয়ার লিখছি।

তিনি অমনি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—কি লিখছ, একটু পড় দেখি শুনি ?

এমন আশ্চর্য কথা আমি জীবনে কখনো শুনিনি! তার চেয়ে তিনি যদি বলতেন, তুমি আজ রাত্রে ঘুমোতে পাবে না; তোমাকে আমার পায়ে তেল মালিশ করতে হবে—তা-ও আমি অক্লেশে করতে পারতাম! কিন্তু তিনি যে আমার অন্তরের প্রার্থনা শুনতে চান—আমি কি প্রার্থনা করি, কেমন করে করি, সবটুকু তিনি জেনে নিতে চান? লজ্জায় কুণ্ঠায় আমার সমস্ত অন্তর ছেয়ে গেল!

তথাপি তাঁকে 'না' বলতেও পারলাম না। শুধু বললাম—কিন্তু সবটুকু লেখা তো এখনো শেষ হয়নি ?

তিনি তবু বললেন—যেটুকু লিখেছ সেইটুকুই পড়ো ?

আমি পড়লাম। তিনি শুনে মন্তব্য করলেন—তুমি খুব সুন্দর লেখো তো ? কাল সকালে শুনব তোমার সব ডায়েরী। বলে চলে গেলেন।

আমার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল! সে কি কথা? সব শুনবেন কি ? একি আমি গল্প-উপন্যাস লিখছি ?

সত্যিই পরদিন শুধু সেই অসমাপ্ত ডায়েরীটিই নয়, খাতায় যতগুলি ডায়েরী ছিল সবগুলিই তিনি শুনে নিলেন!

কিন্তু এখানেই যদি এ-কষ্টের অবসান হত, তাহলেও কথা ছিল না! পরন্তু সব শোনবার পর তিনি আদেশ করলেন—কৃপা, তুমি মাকেও একবার পড়ে শোনাবে। তাঁর কাছে তোমার ডায়েরীর গল্প করতে তিনিও খুব আগ্রহী হয়েছেন শোনার জন্যে।

মনে মনে বলি, হা ভগবান! ডায়েরীর কথা এরি মধ্যে মাকেও আবার বলা হয়ে গেছে? আর একবার কুণ্ঠায় অস্বস্তিতে অন্তরটা ভরে উঠল। পা দুটো, সমস্ত শরীরটা অসম্ভব ভারী হয়ে উঠল! কিন্তু উপায় নাই। এটি আমার প্রভুর পরীক্ষা ভেবে মাকেও পড়ে শোনালাম। অবশ্য সবগুলি নয়। কয়েকটি পড়ার পর আমার যেন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হল। আমি খাতা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম।

মা বললেন—বেশ ভাল লাগল বাবা। আর নাই, এই ক'টা মাত্র ?

অতি কষ্টে তাঁকে জানালাম—আরো আছে,...কিন্তু এ-সব কারো কাছে পড়তে আমার খুব কষ্ট হয়।

তবে থাক্ থাক্। নাই-বা পড়লে! আমারও কত কাজ পড়ে আছে, এমন সময় কি বসবার জো আছে বাবা?

মা ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু এরকম না করে আমার উপায় ছিল না। সেদিন যদি না করতাম, অন্যদিন করতেই হত। অন্যদিন তিনি হয়ত পাঠের আসরে সকলের সামনে পড়ার ফরমাশ করে বসতেন।

আজ তেমনি ডাক্তারবাবুর দীক্ষা দেবার কথায় সে রকম অসহ্য ভাব এল না। কারণ হয়ত দীক্ষা কথাটি সংশোধন করে দেওয়াতে আমার কিছু ভ্রম দূর হল। তা না হলে ঐ দীক্ষা কথাটি আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। তবুও সাবধানের তো মার নেই! অন্য এক সময়ে ডাক্তারবাবুকে বৃন্দাবনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঘটনাটা শুনিয়ে বললাম—জানেন, যদি তাদের কাছে দীক্ষা নিতে পারতাম তাহলে আর আমাকে ফিরে আসতে হত না। কিন্তু কি করব, শ্রীঅরবিন্দ যে আমাকে আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন আর কারো কাছে না যেতে; তাই আর কোথাও আমার যাওয়া হল না।

ডাক্তারবাবু শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। অন্য একটা কথা টেনে প্রসঙ্গটা তৎক্ষণাৎ চাপা দিয়ে দিলেন।

কিন্তু এতসব কথার পরেও দীক্ষাটা তবু বন্ধ হল না। পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু আমাকে সকালে স্নান করে নিতে বললেন। স্নান করে মন্দিরের মধ্যে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের মূর্তির সামনে একটা আসনে বসলাম। ডাক্তারবাবু আমার মুখোমুখী আর একটা আসনে বসলেন। তারপর কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে তিনি দু'টি টগর ফুল নিয়ে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে স্পর্শ করিয়ে আমার বুকে ছোঁয়ালেন। বললেন—এইখানে অন্তরাত্মার ধ্যান করতে হয়। তোমাকে পূর্ব থেকে মা নিজেই দীক্ষা দিয়ে রেখেছেন, তুমি সেই পথেই চলে আসছ। আমি শুধু তোমাকে বক্ষে অন্তরাত্মার ধ্যান করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলাম।

অথচ আমি কাল থেকে ভেবেই সারা হচ্ছিলাম তিনি কি-না-কি করবেন চিন্তা করে। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম এ-বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু এখন মনে মনে ভাবি, এর জন্যে এত সমারোহ! শুভেচ্ছা

থাকলে তো এটুকু যে কোন সময় কাছে বসিয়েও শিখিয়ে দিতে পারতেন তিনি! হয়ত তাঁর অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ তা হতে দিলেন না।

তা যাই হোক, এই দীক্ষার পর থেকেই কিন্তু একটি নূতন প্রতিবন্ধক দেখা দিল। সকাল-সন্ধ্যায় আমার বরাবরই একটু ধ্যানে বসা অভ্যেস ছিল। পাঠ-মন্দিরে এসেও ঐ সময়গুলোতে কোন কাজ থাকত না। কাজেই পুরনো অভ্যেসটা বজায় রাখা সুবিধে হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যার পর ধ্যান শেষ করে ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করতে গিয়েছি। এরকম প্রতিদিনই দু'বেলা তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম করতে হত। এ-অভ্যেসটি শিখিয়েছিল আমাকে রঞ্জন। সে সেই পাড়ারই ছেলে, প্রতিদিন আসত পাঠমন্দিরে সেবা দিতে। সকালবেলা আমাকে সাহায্য করত মন্দিরের ঘর-দোর নিকানো মুছানোর কাজে। কাজের শেষে সে ঠাকুরকে এবং ডাক্তারবাবুকে প্রমাণ করে ঘরে চলে যেত। তার দেখাদেখি আমিও ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করতে লাগলাম। কেননা আমারই সামনে সে তাঁকে প্রণাম করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব—সে যে খারাপ দেখায়! ডাক্তার-বাবুর অসম্মান করা হয়। তা না হলে আমার দিক থেকে, যাঁর কাছে সব সময় থাকি, তাঁকে দু'বেলা প্রণাম করা ভাল দেখায় না।

অবশ্য আমার একাজে তিনি খুব খুশীই হয়েছিলেন। সেদিন তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি বললেন—কৃপা, তুমি চোখ বন্ধ করে ধ্যান কর কেন? চোখ খুলে ধ্যান করবে, তাতে ডবল্ অ্যাক্‌শন্ হয়। শ্রীঅরবিন্দ চোখ খোলা রেখে সব সময় ধ্যান করতেন।

কথাটা শুনেই আমি প্রথমে লজ্জা পেয়ে যাই—ধ্যানের সময় উনি কি তাহলে সামনে গিয়ে দেখে এসেছেন নাকি? মন্দিরের মধ্যে এমন এক অন্ধকার কোণে আমি বসি যে, আমার সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ না করলে তো আমার চোখ দেখা যাবে না?

সব ব্যাপারটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মনটা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তবুও ঐ ঘটনাটাকেই বড় করে দেখলাম না। ডাক্তারবাবু যে-কথাটি বললেন সেটি আমার অন্তর সঙ্গে সঙ্গে ভাল বলে মেনে নিল—সত্যিই তো? চোখ খোলা থাকলে ডব্‌ল্ অ্যাক্‌শন্ হয়ই তো? এই যে আমি চোখ বন্ধ করে কোথায় চলে গেলাম—আমার সামনে কে এসে দেখে গেল, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না? তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ চোখ খুলে ধ্যান করতেন। তাঁর মত ধ্যান করার জন্যে বেশ একটা জেদ চেপে গেল মনে।

তারপর থেকে প্রাণপণে আদা-জল খেয়ে চোখ খুলে ধ্যানের অভ্যেস করতে লেগে গেলাম। কিন্তু বহুদিনের অভ্যেসটা কিছুতেই শোধরানো গেল না। চোখ খুলে রাখলে শুধু চেয়ে থাকাই হয়, ধ্যান আর হয় না। চোখ চেয়ে চেয়ে সব কিছু দেখি, আর দেখতে দেখতেই কখন্ দৃষ্টবস্তুর সঙ্গে এক হয়ে তার চিন্তাতে ডুবে যায়; হঠাৎ সচেতন হতেই দেখি, ধ্যান তো হয়নি! আর না-হয় চোখ খুলে থেকেও যদি-বা দৃষ্ট বস্তু থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখি, তথাপি ধ্যান জমে না; ধ্যান করে তৃপ্তি পাই না। কেমন যেন আলুনা লাগে। মনকে পাহারা দিতে দিতেই আধঘণ্টা একঘণ্টা সময় কেটে যায়। অথচ আগে এক ঘণ্টা চোখ বুজে বসে থাকলেও মনে হত—এই মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বসেছি! কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত তার হুঁশ থাকত না। বাইরের পরিবেশ, শব্দ কোলাহল সব কোথায় হারিয়ে যেত।

দু'বেলাতেই এরকম ঘটতে লাগল। বড় অসুবিধায় পড়লাম—কোন্‌টা করি? শ্রীঅরবিন্দের মত চোখ খোলা রেখে ধ্যান করার লোভও আছে, অথচ কৃতকার্য হতে পারি না। আবার চোখ বন্ধ করে গভীর ধ্যান করেও তৃপ্তি পাই না—মনটা খুঁত খুঁত করে!

এক-একবার ভাবি—এসব হল ডাক্তারবাবুর আমাকে ধ্যান না করতে দেবার অভিসন্ধি! চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে তো ঐ সময়ের মধ্যে পাঠমন্দিরে কে এল গেল কিছুই দেখতে পাব না, আর পাঠমন্দির পাহারা দেওয়াও হবে না।

কিন্তু আবার আমি নিজেই বুঝি যে, এ হল আমার রাগের কথা—চোখ খুলে ধ্যান না করতে পারার এক ধরনের আক্ষেপ। কারণ পাঠমন্দির পাহারা দেবার আমার প্রয়োজনই পড়ে না। ডাক্তারবাবু নিজেই দরজার কাছটিতে বারান্দায় বসে রোগী দেখেন, রোগী না থাকলে ধ্যান করেন।

মনে মনে তাই বিচার করতে থাকি—ডাক্তারবাবুর কি আমাকে শুধু চোখ খোলা রেখে ধ্যান করানোই উদ্দেশ্য, না আর কিছু? তিনি কিন্তু আর একদিনও এ-বিষয়ে খোঁজ খবর নেন না—ঠিক করছি কি না, বা কেমন হচ্ছে।

কয়েকদিন পরে তিনি একদিন শুধু বললেন—ছাখো, সন্ধ্যেবেলা তুমি একটু আগে থেকে ধ্যানে বসবে এবং আগে থেকে উঠবে। না হলে তোমার ছাত্ররা সব এসে বসে থাকে।

ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—পাঠমন্দিরে আসার কয়েকদিন পরেই সন্ধ্যের সময় হায়ার সেকেণ্ডারী এবং প্রি-ইউনিভারসিটির মিলে পাঁচ ছ'টি ছাত্রকে

প্রাইভেট পড়াতে হত আমাকে। ডাক্তারবাবু নিজেই ছাত্র জুটিয়ে আনলেন। এসব বিষয়ে দেশের লোকের ওপর তাঁর বেশ প্রভাব আছে। ছাত্ররা তাদের পুরনো শিক্ষককে ছেড়ে পাঠমন্দিরে পড়তে চলে এল।

ডাক্তারবাবু আমাকে বোঝালেন—ভেবেছিলুম তোমাকে অন্য কোন কাজ করতে দেব না, তুমি শুধু পাঠমন্দিরের কাজই করবে—সকাল বিকেল রোগীদের ওষুধ দেবে, ডিস্‌পেন্সারীর কাজ করবে। তারপর ধীরে ধীরে ডাক্তারীটাও শিখে নেবে। তাহলেই নিজের খরচ চলে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি, একজন বসে বসে খেলে তো চলবে না? জান তো, আমাদের পাঠমন্দিরের কোন আয় নেই? হয়ত তোমাকে স্কুলের মাষ্টারী করতেও হতে পারে। কিন্তু পাঠমন্দির থেকে তোমাকে ছেড়ে দিলে এখানের কাজ করবে কে? কিছুদিন যাক্, পরে ও-সব ভাবা যাবে। এখন কয়েকটা টিউশনির ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে, এদেরই ততদিন পড়াও। এতেও ঘরে বসে ষাট-সত্তর টাকা তবু আসবে।

ডাক্তারবাবু এখন ঐ ছাত্রদের উল্লেখ করেই আমাকে সকাল সকাল গিয়ে তাদের পড়াতে বসতে বললেন। তিনি যে চোখ খুলে ধ্যানের কথা আর কিছু বললেন না, তাতেই আমি খুশী। আমি 'আচ্ছা' ব'লে সন্তুষ্ট মনে সেদিন থেকে প্রতিদিনই আগে আগে ধ্যান থেকে উঠতে লাগলাম। ধ্যানে বসেও চেতনাকে এই দিকে জাগিয়ে রাখতাম।

কিন্তু আগে আগে উঠলে কি হবে, আমি ছাত্রদের আগে যেতে পারলাম না। দু'টি ছাত্র পাশের গ্রাম থেকে সন্ধ্যের আগেই এসে আমার পাশে বসে ধ্যান করে, তারপর আমি উঠলেই তারাও উঠে গিয়ে পড়তে বসে।

ডাক্তারবাবু কিন্তু ছাত্রদের দেখা মাত্রই মনে করতেন, আমার তৎক্ষণাৎ তাদের পড়াতে বসা উচিত। দু'একদিন যেতে না যেতেই তাই তিনি আবার বললেন—কি, তুমি তো আগে উঠছ না? ছেলেরা আধঘণ্টা আগে এসে বসে থাকে, তারপর তুমি যাও? ওদের বাপ-মায়েরা টাকা দেয় তা জানো? কাল থেকে প্রতিদিন ছেলেদের আগে গিয়ে বসে থাকবে।

আমি কোন প্রত্যুত্তর না করে 'আজ্ঞে' বলে ছাত্রদের কাছে চলে গেলাম। ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল তখন, তারা তাদের শিক্ষকের শাস্তিটা শুনে গেল। পড়বার ঘরে যেতেই ছাত্ররা সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল—ডাক্তারবাবু কেন এমন কথা বললেন, স্যার্? বরঞ্চ আমরাই তো অনেকে আপনার পরে আসি?

বললাম—তবে তোমরা ডাক্তারবাবুকে সে-কথা বললে না কেন? তোমরা বললে হয়ত তিনি বিশ্বাস করতেন।

ছাত্রেরা আবার একসঙ্গে বলে উঠল—এখুনি আমরা গিয়ে বলে আসছি, স্যার্!

—না, থাক। ডাক্তারবাবু কিছু মনে করবেন। কাল থেকে আমি আরো আগে এসে বসবো।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর এসব অসন্তোষের কারণ যে আমার চোখ বন্ধ করে ধ্যানের জন্যেও নয়, আর ছাত্রদের আগে গিয়ে বসবার জন্যেও নয়, সেকথা পরের দিনই প্রমাণ পেলাম। সকালবেলা ধ্যান শেষ করে উঠতেই ডাক্তারবাবু আমাকে কাছে ডাকলেন—শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি বলি করেও বলা হচ্ছিল না। তুমি কিছু মনে কর না—আচ্ছা, তোমার ধ্যান করার অত ঝোঁক কেন? তোমার ধ্যান কবার মোটেই প্রয়োজন নেই।

আমি ভাল করে কিছু না বুঝেই বললাম—প্রয়োজন নেই?

তিনি বললেন—না। তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমার হয়ে ধ্যান করব। তোমার সাধনার সব ভার আমার, তুমি শুধু কাজ করে যাও—খাও-দাও, আর মনের আনন্দে থাক।

আমি তাঁর কথা শুনে খুব খুশীর ভাব দেখাতে পারলাম না। চুপ করে আমি ভাবছি দেখে তিনি এবার উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন—আর বল্‌ছি যখন কথাটা তখন বলেই ফেলি। আচ্ছা, তুমি কি ভাব ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে? সামনে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের প্রতিমূর্তি দেখিয়ে বললেন—তুমি যে ওদের ধ্যান কর, ওরা তো আইডল্—একটা পুতুল? তুমি এই লিভিং মানুষটাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ আইডলের ধ্যান করছ?

আমার পা থেকে যেন মাটি সরে গেল—এ কি, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত হয়ে একথা মুখ দিয়ে বের করলেন কি করে? এ আমি কোথায় এসে পড়েছি?

অবাক হয়ে ভাবছিলাম এমন সময় পাঠমন্দিরের মা এসে পড়লেন। তিনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের দু'জনে কিসের কথা হচ্ছিল? কৃপা অমন মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে কেন? কি বলছিলে ওকে?

ডাক্তারবাবু অমনি তাঁকেও এক ধমক লাগিয়ে দিলেন—তোমার সব কথায় থাকবার দরকার কি? তোমার কাজ দেখগে।

বেগতিক দেখে মা তখন আমাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সরে

গিয়ে কতক্ষণ থাকব ? ডাক্তারবাবুর কাছেই তো সব সময় থাকতে হবে ? কিন্তু এবার দারুণ ভয় হল, থাকব কেমন করে ? ভোর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজ করি—পাঠমন্দিরের এতসব ঘর দোর ধোওয়া মোছা, ডাক্তারখানা ঝাট-পাট দেওয়া, রোগী এলে ওষুধ দেওয়া ; গরু-বাছুরের কাজ, বাগানের কাজ, লাইব্রেরীর কাজ তো আছেই। আবার তারই মধ্যে রান্নার কাজ। ডাক্তারবাবু একদিন আমাকে যে লোভ দেখিয়েছিলেন—তুমি এখানে এলে রাঁধা ভাত পাবে—সে-সুখ আমার এই ক'দিনেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাকেই রাঁধতে হয় তিনজনের। ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—এমন একলা চলার পথ যখন নিয়েছ তখন তুমি কার ওপর নির্ভর করবে ? নিজের কাজ তুমি নিজে করে নেবে।

অবশ্য সেই ভাবেই করি। কিন্তু এতসব কাজ করেও আমি যদি একটু সময় করে ধ্যান করতে বসি তাতে অপরাধটা যে কোথায় তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আসলে এই ধ্যানটুকু থেকেই সারাদিনের কাজ করার আনন্দটুকু সংগ্রহ করে নিতাম। এবার আর তা চলবে না।

আগে আমি ভাবতাম, ধ্যানের প্রতি আমার আগ্রহটা এঁদের ভাল লাগবে। কেননা, পাঠমন্দিরের বাজার-দোকানের প্রয়োজন ছাড়া আমি বাইরে কখনো যাইনি। এ আমার নিজের দেশ, চারদিকে আমার কত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় প্রতিবেশী—তাদের সঙ্গেও কখনো দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাইনি, নিজের ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা রয়েছে, সেদিকেও কখনো ফিরে তাকাইনি। ইচ্ছেও হয় না, আর ডাক্তারবাবু যদি পছন্দ না করেন—সেজন্যেও বটে। আমি সর্বক্ষণ যেন পাঠমন্দিরের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করে রেখেছিলাম ডাক্তারবাবুকে খুশী করার জন্যে। তাই ভাবছি একি বিষম সংকটের মধ্যে পড়লাম !

এবার সত্যিসত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম।

কিন্তু ভয় পাবার যে তখন আরো অনেক বাকী ছিল তা আমার জানা ছিল না। তারপর থেকে প্রতিদিন একটা না একটা এমনি অপ্রিয় এবং বিশ্রী ঘটনা ঘটতে লাগল—আমার সব কিছুতেই একটা না একটা খুঁত দেখা দিতে লাগল। এমন কি, ডাক্তারবাবুকে সকাল-সন্ধ্যেয় প্রণাম করাটার মধ্যেও অনেক খুঁত বেরিয়ে পড়ল।

আগেই বলেছি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যেয় রঞ্জনের সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করতে হত। প্রথমের দিকে শুধু প্রণাম করতাম, শেষের দিকে তাঁর হাতে ফুল দিয়ে প্রণাম করতে হত। কিন্তু রঞ্জনের কাছে এই প্রণাম করার ব্যাপারে আমি ভীষণভাবে হেরে গেলাম। ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম

করার সময় রঞ্জন প্রায় কয়েক মিনিট কাটিয়ে দিত। পরন্তু আমি ততক্ষণ ধরে উবুড় হয়ে থাকতে পারতাম না। আমি আমার নিজের ধরণে তাঁকে প্রণাম করতাম এবং এটুকু জানি যে, সেই প্রণামের মধ্যে কোথাও এতটুকু তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হত না।

ডাক্তারবাবুর কিন্তু তা পছন্দ হত না। একদিন আমাদের সামনেই তিনি রঞ্জনের প্রণামের তারিফ করতে স্বরু করে দিলেন। পাঠমন্দিরের মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—জান মা, রঞ্জনের ভক্তি-ভাবটি ভারী চমৎকার! আমি ওর দিকে তাকালেই ওর সোলটিকে দেখতে পাই। খুব ডেভেলপড্ সোল কিনা? সবাই তো আমাকে প্রণাম করে, কিন্তু ওর মতন কাউকে তুমি দেখেছ? হ্যাঁ, আর একজন আছে, সে হল স্কুলের হেডমাষ্টার—আমার বন্ধু।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—তোমরা কেউ কখনো শুনেছ, বন্ধু বন্ধুকে লম্বা হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে? ঐ বন্ধু আমাকে তা-ই করে। ওকে আমি একদিন বললুম—তুমি ভাই সবার সামনে অমন করে প্রণাম করতে পাবে না, তাতে আমার খারাপ লাগে। প্রণাম করতেই যদি হয় তো আড়ালে আবডালে ক'রো। তারপর থেকে সে তা-ই করে। সে অনেক কিছু পায় আমার কাছ থেকে, না হলে সে কি এমনি এমনি প্রণাম করে? বুঝলে কিছু? আর তোমরা? এত কাছে থেকেও এই মানুষটার দাম বুঝতে পারলে না।

এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় তিনি আর কি বলবেন? কিন্তু লজ্জায়-বেদনায় আমার সমস্ত অন্তর যে কিরূপ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তা তিনি দেখতে পেলেন না।

এ ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও আমি অন্য সকলের কাছে হেরে গেলাম—পাঠমন্দিরের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, পরিচিত এবং ভক্ত তাঁরা এলে ডাক্তারবাবু তাঁদের কাছে বলতেন—আর দশটা বছর তোমরা অপেক্ষা কর না, তারপর দেখবে আমার কাজের জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন সব এসে হাজির হবে। এই দশ বছরের মধ্যেই আমার অতিমানস সিদ্ধি হয়ে যাবে—দু'বছর লাগবে সাইকিসাইজেশন্ হতে, তিন বছর লাগবে স্পিরিচ্যুয়েলাইজেশন্ হতে, আর পাঁচ বছরের মধ্যেই আমার সুপ্রামেণ্টালাইজেশন্ পূর্ণ হয়ে যাবে।

যারা তাঁর এসব কথা শুনত তারা সবাই একেবারে আশ্চর্য নির্বাক হয়ে যেত। তাদের মুখ দেখে আমার মনে হত, এতটুকুও তাঁরা অবিশ্বাস করেনি, যেন বেদবাক্য বলে ধরে নিয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করতে আমার ভারী ইচ্ছে হত—হ্যা গো, সত্যিই কি তোমারা বিশ্বাস কর? কিন্তু আমি কেন তোমাদের মত বিশ্বাস করতে

পারি না? কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস পেতাম না। শুধু একদিন আমার স্কুলের শিক্ষককে আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা, বলেছিলাম—আচ্ছা স্যার, আপনারা ভক্তি গদগদ হয়ে ডাক্তারবাবুর ঐ দশ বছরে 'অতিমানস সিদ্ধি' হওয়ার গল্প যে শোনেন, তা কি সত্যিই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—আরে, উনি তো পাগল!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি, আপনারাও জানেন তাহলে?

—জানি না আবার? কিন্তু পাগলকে ঘাঁটিয়ে কি হবে? যা বলেন চুপ করে শুনে যাই।

বললাম—সবাই তাহলে তা-ই করে?

—তাছাড়া উপায় কি? কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে তাঁর মুখের ওপর কিছু বলে?

সে যা হোক, তারপর যা বলছিলাম—ডাক্তারবাবুর ঐসব কথা শুনে আমি আশ্চর্য হতে পারতাম না—এই হল আমার দোষ! আমার মতে, সিদ্ধির কথা কেউ কি বলতে পারে? সে যে ভগবানের দান, কবে দেবেন তা শুধু তিনিই জানেন।

তথাপি আমি কখনো তাঁর কথায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিনি। শুধু অন্যলোকের মত তাঁর সিদ্ধিতে আমারও সিদ্ধি—এই ভাব দেখিয়ে আহ্লাদে একেবারে গলে যেতে পারতাম না এই যা। পরন্তু ডাক্তারবাবু আমার মধ্যে ঐ আহ্লাদ দেখতে না পেয়েই বুঝে ফেলতেন আমি তাঁর কথাতে ভুলিনি। তখন তিনি অন্য এক উপায় গ্রহণ করতেন আমার মনের ভাব জানতে। আমাকে জিজ্ঞেস করতেন—আচ্ছা কৃপা, আমাকে তুমি কেমন দেখছ?

আমার চোখের দোষের জন্যেই হোক আর বরাতের দোষের জন্যেই হোক, শ্রীকান্ত'র মত আমি মেঘকে শুধু মেঘই দেখি, আকাশকে শুধু আকাশই দেখি; ডাক্তারবাবুকে শুধু ডাক্তারবাবুই দেখি—শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের ভক্তরূপেই দেখি। কখনো তাঁর মধ্যে আমি সুপ্রামেণ্টালকে সশরীরে আবির্ভূত হতে দেখতে পেলাম না।

কিন্তু এটা কি আমার কম দোষ? আবার এমন আমি নির্বোধ, ঐ কথাটা তাঁর কাছে বলেও ফেলি যে,—দেখুন, সবাই কি সব জিনিস দেখতে পায়, না দেখার চোখ থাকে? আমার আবার ও-সব বিষয়ে জ্ঞান খুব কম। তাছাড়া ওসব তো আপনার ভেতরের জিনিস—আমার সে দৃষ্টি না থাকলে কি করে দেখব?

যত দৈন্যই প্রকাশ করিনা কেন, ডাক্তারবাবু একটু খুশী হন না। রেগে যান আমার ওপর, বলেন—দেখবে কি করে? তুমি কি দেখার চেষ্টা কর? তুমি শুধু চোখ বুজে ধ্যান করতেই জান।

তবে এ-প্রশ্নটি শুধু আমাকেই নয়, যারা তাঁর কাছে আসে, এমনকি রোগীদিকে পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞেস করতেন—আমাকে কেমন দেখছ? কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছ?

তারা সত্যিই ভাগ্যবান। কারণ তারা যা হোক কিছু একটা বলে তবু ডাক্তারবাবুর মনোরঞ্জন করতে পারত। তারা যে যেমন মানুষ, যার যেমন বুদ্ধি সে তেমনি উত্তর দিত। কেউ বলত—দিন দিন আপনার যেন নবযৌবন আসছে, গায়ের রঙ যেন ফেটে বেরুচ্ছে! কেউ বলত—আমি আপনাকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও যেমন দেখেছি আজও ঠিক তেমনটিই দেখছি। কোথাও এতটুকু বয়েসের চিহ্নমাত্র নেই আপনার! আর যাদের শ্রীঅরবিন্দের যোগের সঙ্গে পরিচয় আছে এবং যৌগিক পরিভাষাগুলো কিছু জানা আছে, তারা বলত—আপনি তো মশাই সুপ্রামেণ্টাল পেয়েই গ্যাছেন! দ্যান দ্যান, এবার আমাদের কিছু কিছু ছাড়ুন দেখি আপনার সুপ্রামেণ্টাল?

ডাক্তারবাবু তাদের উত্তরে বড় আনন্দ বোধ করতেন। হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে বলতেন—সত্যি? সত্যি আমি সুপ্রামেণ্টাল পেয়ে গেছি? তোমরা যে কি বলো……

কখনো আবার এরকম হাসতে হাসতেই তাঁর মধ্যে অন্য এক নতুন মানুষের আবির্ভাব হত দেখতাম। চোখ-মুখ তাঁর হঠাৎ লাল এবং কঠিন হয়ে উঠত। তিনি ভারি গলায় বলতে সুরু করতেন—তোমরা যতই বল না কেন, তোমাদের কারোরই আমাকে দেখার চোখ নাই। যোগীই যোগীকে চিনতে পারে—শ্রীমা-ই শ্রীঅরবিন্দকে চিনে ছিলেন। আমাকে চিনবে কে? জান, আমি বিউলির ডাল ভাত খেয়ে একই আসনে বসে চল্লিশ বছর সাধনা করেছি। কেউ চিন্তা করতে পারবে? ওয়ারল্ডে এরকম আর একটা সোল দেখাতে পার? দাঁড়াও না, আর দশটা বছর যাক, তারপর দেখবে এই পাঠমন্দির কী রূপ ধারণ করে……

এসব সত্য ঘটনা আজ যে পড়বে সে-ই বুঝে ফেলবে, একজন পাগল মানুষের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ডাক্তারবাবু নিজে না-হয় নিজের অবস্থা বুঝতে পারতেন না, পরন্তু যারা তাঁকে দেখত তারাও কি কিছু কিছু বুঝতে পারত না? অথচ দেখতাম, তারা তাঁকে দারুণ ভয় করে, অতীব শ্রদ্ধা করে। এমন কি,

আড়ালে যারা তাঁর কথা নিয়ে হাসাহাসি করে, তারাও তাঁর সামনে গিয়ে দেবতার মত ভক্তি করে। এটা মনে হয়, ধর্মের প্রতি মানুষের এক ধরণের ভয় বা মোহ—পাছে ভগবান অসন্তুষ্ট হন !

সে যাই হোক, এদিকে আমাকে পেয়ে ডাক্তারবাবুর মাথায় নিত্য নতুন পরিকল্পনা খেলতে লাগল। তিনি ঠিক করে ফেললেন ওপরের ঘরটিতে শ্রীঅরবিন্দের মত দিনরাত একান্তে থাকবেন। নীচে নেমে পাঠমন্দিরের কাজকর্ম, রোগী দেখা, জমি-জায়গা তদারকী, কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ—সব তিনি হঠাৎ একদিন বন্ধ করে দিলেন। মা আমি আর কয়েকজন বাছা বাছা অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কারো সঙ্গেই দেখা করেন না। আমাকে কয়েক মাস ডাক্তারী পড়িয়েই আমার ওপর ডাক্তারখানার ভার দিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন—ও-সব ডার্টি সোল আমি আর ছোঁব না, ওতে আমার সাধনার ক্ষতি হয়। ডাক্তারখানা দেখবে এবার থেকে তুমি। জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি সব দেখবে তুমি। আমি ও-সবের মধ্যে নেই। আমি নিচেই আর নামছি না !

মা বললেন—চান-পায়খানার জন্যে তো একবার নিচে নামতে হবে তোমাকে ? ওপরে তো তোমার বাথরুম পায়খানা করোনি ?

ডাক্তারবাবু বললেন—চানের জল হাত-মুখ ধোয়ার জল কৃপা তুলে দেবে ওপরে। খাবারও এখানে দিয়ে যাবে। যতদিন পায়খানাটা ওপরে তৈরী না হচ্ছে ততদিন নিচে দু'একবার যেতেই হবে। তারপর আর যাব না।

তাঁর বন্ধু হেডমাষ্টারকে বললেন—পাঠমন্দিরের পাশে ঐ খালি জায়গাটা আমার চায়। ভেবে দেখলাম ওটি তুমিই দিতে পার।

বন্ধু আড়ালে-আবডালে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেও সবার সামনে বন্ধুর সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা বলেন, ঠাট্টা-তামাসাও করেন। তাই বন্ধু ঠাট্টা করছেন ভেবে হেড-মাষ্টার বললেন—হ্যাঁ, ওটি আমার বাপুতি সম্পত্তি কিনা, এখুনি আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি !

ডাক্তারবাবু তখন হাসতে হাসতে বললেন—না, হে না, ঠাট্টা নয়। সত্যিসত্যি বলছি, বাপুতি সম্পত্তি না হলেও তুমি দিতে পার।

—কি করে ?

—তাই তো বলছি, শোন তাহলে—আমি খবর নিয়েছি, তোমার এক অনুগত প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে জায়গাটির মালিক। তুমি যদি ছাত্রটিকে একটু পটাতে পার তাহলে সে নিশ্চয় গুরুদক্ষিণা স্বরূপ জায়গাটি দিয়ে দেবে। অবশ্য

ছাত্রটির বাবা আছেন মাথার ওপরে গার্জেন। তা থাক, তবু ছেলে এখন সাবালক, উপার্জনশীল, সে যদি 'হ্যাঁ' করে তার বাবা আর বাধা দিতে পারবে না……

হেডমাষ্টার কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন—কার কথা বলছ বলো দেখি?

—আরে আমাদের পঞ্চু উকিলের কথা বলছি! ছেলেটি খুব ভাল, উদার হৃদয়। তাছাড়া এ-জায়গাটা তাদের কাজে লাগছে না, শুধু খালি খালি পড়ে আছে বৈ তো নয়? পাঠমন্দিরকে দিলে মায়ের কাজে লাগবে তবু। পাঠমন্দিরের সব আছে, কিন্তু জায়গার বড় অভাব। তাকিয়ে ভ্যাখো, কোথাও একটু হাত-পা মেলার স্থান আছে? চারদিকেই লোকের বাড়ি-ঘর, সরকারী রাস্তা। যদি ঐ জায়গাটা পাওয়া যেত তাহলে তোমাদের ভবিষ্যতে ব্যাল্‌কনি দর্শনের সুবিধে হত। তোমরা তো আর আমাকে এভাবে পাবে না? বছরে শুধু চারটে দিন ছাড়া কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। তোমাদের জন্যেই বলছিলাম আর কি……

বন্ধু তাঁর ইঙ্গিতটি তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়ে বললেন—নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি যথাসাধ্য করব। তবে তুমিও তোমার যোগশক্তি প্রয়োগ করো যাতে ছাত্রটির এ-সুমতি হয়। যার যতই থাক, কেউ কি নিজের জিনিস কাউকে দিতে চায়?

সত্যি সত্যিই হেডমাষ্টার তারপর পূর্ণ উদ্যমে লেগে গেলেন জায়গাটি হাত করবার জন্যে। কিভাবে কথা উত্থাপন করতে হবে, কেমন করে চেপে ধরতে হবে যাতে ছাত্র এবং ছাত্রের পিতা আব 'না' কবতে পারে—সেসব বিষয়ে উকিল-মহুরীর মত ডাক্তারবাবুই তাঁকে পরামর্শ দিতে লাগলেন। কাজ এগিয়ে চলতে লাগল।

আমার কিন্তু ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগল না। মনটা কেবলই 'কু' গাইতে লাগল। না-না, এসব ভাল নয়, এসব ঠিক হচ্ছেনা।

মনকে বোঝাতে চেষ্টা করি—মন, তুমি আগে চুপ করো দেখি? ডাক্তারবাবুর কাজে কেউ যখন কিছুই বলছে না, এমন কি প্রবীণ শিক্ষক পর্যন্ত যখন তাঁর আজ্ঞাকে এমন শিরোধার্য করে নিলেন, তখন নিশ্চয় খারাপ কিছু নেই! তুমি ডাক্তারবাবুকে বোধহয় ভেতরে ভেতরে ঈর্ষা করো? তাই তুমি তাঁর কাজে অমন 'কু' গেয়ে বাধা দিচ্ছ? সত্যিই উনি যদি শ্রীঅরবিন্দের মত হতে পারেন তো হোন না? তুমি কেন ঈর্ষা কর?

এই মনকে নিয়ে আমি পড়লাম মহাসংঘর্ষে। দিনরাত শুধু অন্তরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি—ঈর্ষাকে পাহারা দিই। শুধু তাই নয়, ঈর্ষাকে জয় করবার জন্যে আরো বেশি বেশি করে ডাক্তারবাবুর অনুগত হই।

এমনি সময়ে চব্বিশে নভেম্বরের দর্শন এসে পড়ল। এই দর্শনের দিনগুলোতে পাঠমন্দিরে প্রতি বছরই মহা আড়ম্বরে উৎসব প্রতিপালিত হয়। পাশাপাশি দশ-বিশটা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়ে উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। ডাক্তারবাবুই থাকেন এই সব কাজের প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে—সভার সব কাজ তিনি নিজে দেখাশোনা করেন, সভায় শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কিন্তু এবার তিনি কিছুই চোখ চেয়ে দেখলেন না। ওপর থেকে তিনি শুধু নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সভার শেষে দর্শক ভক্তরা ওপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে আসবে।

ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মতই কাজ হল। প্রথমজন গিয়ে তাঁকে ফুল দিয়ে প্রণাম করে এল, তাকে অনুসরণ করে অন্য সকলেও ফুল দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

সভার শেষে চারিদিকে একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। লোকেরা বলতে লাগল—এমন তো কখনো দেখিনি? ডাক্তারবাবুর নিশ্চয় উচ্চ অবস্থা লাভ হয়েছে! না হলে এতগুলো মানুষের প্রণাম তিনি নিতে পারেন? তাছাড়া এরকম আইডিয়া তিনি কিভাবে বের করলেন—লোকেরা এক সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে প্রণাম করে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবে? এতটুকু হৈ চৈ নেই, ঠেলাঠেলি নেই—এ কি করে সম্ভব হল?

শুধু দু'চারজন নিন্দুক বললে—এরকম আমরা পণ্ডিচেরী আশ্রমেও দেখে এসেছি, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ এরকম দর্শন দেন। এসব নাকি আশ্রমের নকল করা!

কিন্তু অন্য লোকেরা তাদের কথায় আমলই দিলে না। তারা বললে—কিন্তু ডাক্তারবাবু এত টাকা কোথায় পাচ্ছেন? এই ওপরে একটা ঘর উঠে গেল, আবার নূতন একটা সিঁড়ি উঠে গেল! দেশে এত তো বড়লোক আছে এবং শত শত পাকাবাড়িও আছে, কিন্তু কারো বাড়িতে দুটো সিঁড়ি দেখেছ? না না, ডাক্তারবাবুর একটা কিছু হয়েছে!

আমারও তা-ই মনে হল। ডাক্তারবাবুর সত্যিই অলৌকিক শক্তি লাভ হয়েছে। তা না হলে এমন হয়? যা তিনি ইচ্ছা করছেন তা-ই সফল হয়? সবাই তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে? এসব নিশ্চয় শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দেরই করুণা! ডাক্তারবাবুর প্রতি বিশ্বাসটা আবার যেন ফিরে এল।

কিন্তু দিন কয়েক পরেই হঠাৎ এক রাত্রে তাঁর ওপরের ঘর থেকে আমি কাতরোক্তি শুনতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন আর চীৎকার করছেন—ওরে আমার কি হল রে! ওরে আমার কি হল রে!…

আমরা তখনো শুতে যাইনি। খাবার পর পাঠমন্দিরের মা আর আমি বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। আমার আবার চোখ-কানগুলো সবসময় সতর্ক থাকে না, তবু কি করে যে আমিই শুধু শুনতে পেলাম ডাক্তার-বাবুর কাতরোক্তি, তা আজও আশ্চর্য লাগে! একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মা একটুও শুনতে পেলেন না।

আমার কথা শুনে মা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন ডাক্তারবাবুর কাছে। কিন্তু তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। কেউ আমরা তাঁর কাছে যেতে পারলাম না এবং তিনিও আমাদের শত ডাকে একটা সাড়া দিলেন না। সে-রাতটা আমাদের বড় উদ্বেগে কাটল। আমি ভেবেছিলাম মা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। পরন্তু তিনি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করলেন। তিনি যেন এরকম কিছু ঘটবারই আশঙ্কা করছিলেন অনেকদিন থেকে। তাই তার মুখে সর্বদাই দেখতাম কি যেন একটা ভয়ের ছাপ, অথচ আমাদের কাছে তিনি তা ঘুণাক্ষরেও আভাষ দিতে চাইতেন না।

পরের দিন অনেক বেলায় দরজা খুলে মাতালের মত লাল লাল চোখ উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে ডাক্তারবাবু লাফাতে লাফাতে নেমে এলেন। মুখে তাঁর তখন অনর্গল ইংরেজী বেরুচ্ছে—আই এ্যাম দি কিং অফ দি ওয়ারল্ড! আই এ্যাম্ দি লর্ড অফ দি ইউনিভার্স……

আমি তখন ডিস্‌পেন্সারীতে ছিলাম, কিছু বুঝতে না পেরে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। ভাগ্যিস্ একেবারে তাঁর কাছে গিয়ে পড়িনি, তাহলে নিশ্চয় তিনি আমাকে খুন করে ফেলতেন!

দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই তিনি হাত দুটো মুঠো করে বায়ু বেগে ছুটে এলেন এই কথা বলতে বলতে—তোর বুক চিরে আজ আমি রক্ত খাব! তুই আমাকে মানিস্‌নি, বিশ্বাস করিস্‌নি? ভাবিস্ আমি কিছু বুঝতে পারিনি না?…

অন্য সময়ে তিনি হার্নিয়ার ব্যথায় এমন কাবু হয়ে থাকেন যে, ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। অথচ সে-ই মানুষ এখন মাটি থেকে তিন-চার হাত উঁচু পর্যন্ত লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছেন আমার দিকে।

এমন সময় মা এসে তাঁকে আগলে ধরলেন। ডাক্তারবাবুর সব রোষ তখন মায়ের ওপর পড়ল। সে-দৃশ্য চোখে দেখারও নয় বলারও নয়, অথচ তাঁকে বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই। আমি ছুটে গিয়ে রাস্তার লোক ডেকে আনলাম। তারা এসে তাঁকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখল।

এরকম অবস্থায় দু'তিন দিন কাটল। তারপর ধীরে ধীরে তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু পাগলামী তাঁর একেবারে গেল না। এমন সব কথা বলতে লাগলেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেইসঙ্গে আবার চালাকী বুদ্ধিটিও আছে—হীনতার কথা, লালসার কথা বলছেন, কিন্তু বলতে বলতেই সচেতন হয়ে পড়ছেন। তখন আবার সে-সবকে ঢাকবার সে কি নিষ্ফল ছেলে মানুষী! কখনো বা সে-সবের নূতন অর্থ করে বোঝান আমাদের; বলেন, তোমরা ভাবছিলে ডাক্তারবাবু পাগল হয়ে গেছে? না—পাগল আমি একটুও হইনি। এ যে কী-রকম অবস্থা তোমাদের বোঝার ক্ষমতাই এখনো হয়নি।......

এই ঢাকবার ব্যাপারে মা আবার ডাক্তারবাবুকেও ছাড়িয়ে যেতেন। তিনি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতেন—তোমাদের ডাক্তারবাবু কি যে সে মানুষ? সচ্চিদানন্দকে ধরতে ধরতে রয়ে গেছেন, আর একটু হলেই ধরে ফেলতেন!

এই সময় আমার হল উভয়সংকট। আমার ওপর ডাক্তারবাবুর রাগ-দ্বেষ তো যাবার নয়? অথচ এখন তিনি রোগীর মত দুর্বল, শিশুর মত অসহায়। আমাকেই তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়, তেল মাখিয়ে দিতে হয়, স্নান করিয়ে দিতে হয়।

একদিন এমনি তেল মাখাতে মাখাতে আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা কৃপা, আমার যখন ওরকম হল তুমি তখন কি ভাবলে?

বড় বিপদে পড়ে গেলাম, কি তাঁকে জবাব দিই? হয়ত তখন আমি কিছুই ভাবিনি, তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, ভাববার অবসরই ছিল না। কিংবা যা ভেবেছিলাম তা এখন ভুলে গিয়েছি। কাজেই কি তাঁকে উত্তর দিই?

তবে এটুকু মনে আছে—যা-ই ভাবি না কেন, কখনো কিন্তু তাঁর অমঙ্গল ভাবিনি? একথা মনে হয়নি যে, তাঁর অমঙ্গল কিছু একটা হোক! কিন্তু এ-সব কথা ডাক্তারবাবুকে বললে তিনি কি বিশ্বাস করতে পারবেন? তাই ভাবছিলাম—কি বলি? এমনি চিন্তা করতে করতেই তখনকার একটা কথা যা হোক মনে পড়ে গেল। ডাক্তারবাবুকে বললাম—কি ভেবেছিলাম জানেন? ভেবেছিলাম যাই ঘটুক না কেন আপনার, চরম সর্বনাশ কিছুতেই হতে পারে না। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁরই ধ্যানে সময় কাটান তাঁর কি চরম সর্বনাশ হতে পারে? গীতা বলেছেন না—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি?

—সত্যি? সত্যি সেই অবস্থায় তুমি ঐ কথা ভেবেছিলে? ডাক্তারবাবু আরো ভাল করে আমার কাছ থেকে জানতে চান।

বললাম—সত্যি বৈকি। তবে কি জানেন, আমি আমার নিজের জন্যেই তখন

ও-কথা ভেবেছিলাম। কেননা আপনার অবস্থা দেখে আমি নিজের সম্বন্ধে বড় ভেবে পড়েছিলাম। চিন্তা করছিলাম, সে কি? ভগবৎসাধনার পথে এসে এবং তাঁর ধ্যান করেও সাধকের এমন বিপদ হয়? আমি যে জানতাম ভগবানকে ডাকলে, তাঁর শরণ নিলে আর কোন বিপদ হয় না? তাহলে কি আমারও এরকম হবে? তখন কে আমায় রক্ষা করবে? আপনার কাছে তো ঐ মা রয়েছেন, কত লোক রয়েছে, কিন্তু আমার কাছে কে থাকবে, কে দেখবে আমাকে? ভেবে আমি কোথাও কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তেমন সময় হঠাৎ গীতার ঐ বাণীটি স্মরণ হয়ে যেতে মনে শক্তি পেলাম।

ডাক্তারবাবু যা হোক কথাটা বিশ্বাস করলেন। উৎসাহিত হয়ে বললেন—তুমি ঠিক বলেছ। এক আধবার নয়, আমি এরকম চার-চারবার পাগল হয়েছি, কিন্তু আবার উঠেও পড়েছি। যাক তুমি তাহলে এরকম ভাবতে পেরেছিলে?

তখনকার মত বিপদটা কাটল। কিন্তু সেই দিনই বৈকালে আবার অন্য একটা বিপদ এসে জুটল। আমার কয়েকজন বন্ধু ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তিনি তাদের সঙ্গে অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমিও কাছে রয়েছি। হঠাৎ একসময় তাদের একজনকে তিনি বলে বসলেন—দেখবে, তোমার মনে কি হচ্ছে এখুনি বলে দেব?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি গড়গড় করে বলতে সুরু করলেন—তোমার মনে এই হচ্চে, সেই হচ্ছে, তুমি এই কথা ভাবছিলে!···তারপর আর একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কি ভাবছ বলব?···তুমি আশ্চর্য হয়ে গ্যাছো আমার অবস্থা দেখে, না? ভাবছ ডাক্তারবাবু কি করে অন্যের মনের কথা টপ্ টপ্ বলে দিচ্ছে?

বলেই তার কাছে সম্মতি আদায়ের জন্যে একেবারে ছেলে মানুষের মত আহ্লাদে গলে গিয়ে বলতে লাগলেন—কী, ঠিক বলেছি কিনা? দেখলে তো তোমাদের ডাক্তারবাবু সব দেখতে পায়? আমি এখানে বসে বসেই বলে দিতে পারি পণ্ডিচেরী আশ্রমে কোথায় কি হচ্ছে!

এভাবে সকলের মনের কথা বলতে বলতেই আমার দিকে তাঁর নজর পড়ে গেল। অমনি তাঁর চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন—দেখবে, কৃপা কি ভাবছে বলে দেব?

আমি আগে থেকেই জানতাম আমার পালা আসছে। আন্দাজে সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে এমন কতকগুলো কথা বলবেন যাতে সবাই হাসে। আর না-হয় বলবেন

আমার ওপর তাঁর রাগের কথা। তাই অনেক পূর্বেই মা আমার মনকে নীরব করে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলি—না, আপনি বর্তমানে আমার মনের কথা একটাও বলতে পারবেন না ; মন আমার অনেকক্ষণ থেকে নীরব, চিন্তা শূন্য। আর আগের চিন্তা যে ধরবেন, তা আমি এমনভাবে ভুলে গিয়েছি যে আমার নিজেরই স্মরণ নেই ; তা আপনি বলবেন কি করে ?

বাস্তবিকই ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে গেলেন, মুখের কথা তাঁর মুখেই রয়ে গেল। আমার সম্বন্ধে আর একটা কথাও সেদিন উচ্চারণ করলেন না।

এমনি ভাবে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তিনি আমাকে আক্রমণ করতে লাগলেন। তথাপি আমি পাঠমন্দির ত্যাগ করে চলে যাবার কথা ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-ভাবনাটা ভাবতে আমাকে কি করে বাধ্য করল, সেটা এবার বলি—

তাঁর পাগল হয়ে যাবার কিছুদিন পরের ঘটনা। ডাক্তারবাবু শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বেশ তখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বাইরের কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বললে সে বুঝতেই পারবে না যে, এই কয়েকদিন পূর্বে তাঁর কিছু হয়েছিল ব'লে ? আগের মত তিনি আবার রোগী দেখেন, লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং বিকেলে ছাদে পায়চারী করে বেড়ান।

একদিন তিনি পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন, আর নিচের খোলা উঠোনে আমি আসন করছি। ডাক্তারবাবু যখন ছাদের আল্‌সের কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আসন করতে করতেই আমি তখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। কখনো তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছেন, কখনো নিজের মনে হেঁটে যাচ্ছেন। কিন্তু যখন আমি ভূমিতে মাথা রেখে শীর্ষাসনে দাঁড়ালাম তখন আর তাঁকে দেখার উপায় রইল না। আর ঠিক তেমনি সময়েই হাত দুই লম্বা একটা ভারী চ্যালা-কাঠ এসে দুম্ করে পড়ল আমার মাথার কাছে। পড়েই সেটা আমার কান ঘেঁষে ডিগ্‌বাজি খেয়ে দূরে চলে গেল। লাগলে মৃত্যু অনিবার্য ছিল।

আসনের সময়, বিশেষ করে শীর্ষাসনের সময় আমার এমন একাগ্রতা আসত যে স্থান-কালের হুঁশ থাকত না। কিন্তু সেই কাঠটা পড়ার আচমকা শব্দে আমি 'মা গো' বলে মাটিতে পড়ে গেলাম। হঠাৎ পড়ে গিয়ে বুকের ভেতরটা দারুণ ধড়পড় করতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখি, কোথা থেকে পড়ল কাঠটা ? ওপর দিকে নজর পড়তেই দেখি, ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কেমন এক অদ্ভুত হাসি হাসছেন !

ডাক্তারবাবুর মুখে সদাসর্বদাই হাসি লেগে থাকে। কিন্তু এ-হাসি একটুও

সেরকম নয়। এ-হাসি যে কী ভয়ঙ্কর, কী বীভৎস তা চোখে না দেখলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আসন-টাসন ফেলে রেখে ছুটে পালিয়ে গেলাম দালানের ভেতরে।

সেদিন যেন আমার অন্তর আগে থেকেই এই বিপদের সংকেত পেয়েছিল। প্রতিদিনই তো এইভাবে আমি আসন করি, আর ডাক্তারবাবু পায়চারী করে বেড়ান। কিন্তু সেদিন আসন করতে করতে গা-টা কেবলই ছম্ ছম্ করতে লাগল! তাই বারবার ওপরে ডাক্তারবাবুকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

সে যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকেই আমার মনে নিদারুণ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। পাঠমন্দিরের ঘর-বাড়ির মধ্যে কী যেন বিভীষিকা লুকিয়ে আছে অনুভব করতে লাগলাম! অন্যদিন রাত্রে খোলা বারান্দায় শুতাম, কিন্তু সেদিন শুতে আর সাহস হল না। কি জানি রাত্রে যদি ডাক্তারবাবু এসে কিছু অনিষ্ট করেন? আর তো বিশ্বাস নেই তাঁকে? তাই ঘরে দোর দিয়ে শুলাম।

পরের দিন দিনের আলোতেও সে-ভয় কাটল না। মনে হল সেই ভয় সমস্ত পরিবেশটাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই পাঠমন্দির থেকে না বেরুলে তাঁর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই!

পরের দিনই পাঠমন্দিরের মাকে বললাম—আমি আর এখানে থাকব না, পণ্ডিচেরী চলে যাব। এখানে থাকলে আমার মঙ্গল হবে না। পূর্বদিনের ঘটনাটা তাঁকে বললাম। মা তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন—সে কি বাবা? চলে যাবে কি? তুমি চলে গেলে পাঠমন্দির চলবে কি করে?

বললাম—মা, কারো জন্যে কি কিছু আটকে থাকে? আমি চলে গেলেও যাঁদের মন্দির তাঁরা আবার অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন।

—তাহলেও বাবা, তোমার ওপর আমার মায়াটা বেশি পড়ে গেছে!

—কিন্তু আমি এখানে থাকলে যে ডাক্তারবাবু আমাকে খুন করে ফেলবেন?

মা এবার সশব্দে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, না। আমি থাকতে তোমার ক্ষতি হতে দেব না। প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে রক্ষা করব।

আমি জানি তাঁর এ-সব কথা কোন কাজের নয়। ডাক্তার বাবুকে তিনিও যমের মত ভয় করেন, তাঁর রোষের কাছে তিনিও খড় কুটোর মত ভেসে যাবেন। তাছাড়া এই একবছর ধরে তো তাঁকেও দেখলাম? আর আমার তাঁদের কারো ওপরই ভরসা নেই। ডাক্তারবাবুকেও তাই একসময় সাহস করে বলে ফেললাম পণ্ডিচেরী চলে যাবার কথাটা। তিনি কিন্তু মায়ের মত একটুও আপত্তি করলেন

না। বরং এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। বললেন—পণ্ডিচেরী যাবে? আচ্ছা যাও।

কিন্তু তার মুখ দেখে আমার সন্দেহ হল—এ তো তাঁর প্রাণের কথা নয়? সত্যিই একটুক্ষণ পরে তিনি নিজ মূর্তি ধারণ করে বললেন—কিন্তু তুমি চলে যাবে কিরকম? তুমি না আমাকে কথা দিয়েছ? আশ্রমে নলিনীদাকে এবং শ্রীমাকে চিঠি দিয়েছ? শ্রীমা তোমাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন? আর এই কি তোমার জীবন দেওয়া? দাঁড়াও আমি এখুনি আশ্রমে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি······

যেখানটিতে আমার সবচেয়ে বড় ব্যথা ডাক্তারবাবু বুঝে-সুঝে ঠিক সেই জায়গাটিতেই মোক্ষম আঘাত হানলেন। তখন আমার প্রাণ ছট্‌ফটানি দেখে কে! কে যেন আমার হাত-পা বেঁধে নিদারুণ প্রহার দিতে সুরু করেছে—প্রহৃত স্থানে একটু হাত বুলোবারও উপায় নাই, হাত-পা আমার এমনি বাঁধা! আমি যে ডাক্তারবাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি এই পাঠমন্দিরেই চিরকাল থাকব? মরদ কী বাত্, হাথী কা দাঁত—পুরুষের কথা কি আবার ঝুটো হয়?

হায় হায়! তখন আমি আবার পুরুষ মানুষ হয়ে গেছি! কত মহাপুরুষের কত শাস্ত্রের নজির দেখাচ্ছি, নিজেই নিজের মনকে বলছি কত মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিয়ে দিলে, আর তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে সত্য ভঙ্গ করবে? তাই বলছি, আমার কাছে এর চেয়ে শক্ত কঠিন শৃঙ্খল আর কিছু কি ছিল? আমার কি সাধ্য ছিল নিজে এ-মোহের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসি!

অথচ কিছুদিন পূর্বে যখন এই সংঘর্ষ পুরোদমে চলছিল সেই সময়, ৫. ১. ৬১. তারিখে সান্ধ্যকালীন ধ্যানে মায়ের একটি বাণী পেয়েছিলাম: 'তুমি এখান থেকে চলে গেলে কোন পক্ষেরই ক্ষতি হবে না।' কিন্তু এই বাণী পেয়েও মনের মধ্যে তখন চলে যাবার যথেষ্ট জোর পেলাম না। ভাবলাম সব বাণীই কি সত্য হয়? মায়ের নামে বিরোধী শক্তিরাও তো বাণী দিতে পারে? আরো কিছুদিন দেখাই যাক্ না!

অবশ্য ঐ বাণী পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন না করার আর একটা বড় কারণ ছিল—বাইরে এত যে সংঘর্ষ ও ভয়-ভাবনা তা যেন আমার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারত না। সব সময় অনুভূত হত, কে আমাকে যেন বুকে করে জড়িয়ে রেখেছে! সাধনার এমন একটা মধুর অবস্থা চলছিল যে, কোন কিছুতে চিন্তা বা ইচ্ছা প্রয়োগ করারও আমার সামর্থ্য ছিল না; দেহ-মন-প্রাণ সেই মধুতে ডুবে থাকত সব সময়। বাইরের সংঘর্ষে যখনই কষ্ট হত, যখনই জোর সংকল্প করে কিছু একটা

ব্যবস্থা নিতে চাইতাম, অমনি ভয় হত—পাছে হাত-পা নাড়লেই ঐ মধুর অবস্থাটি কেটে যায়, সংযোগ পাছে ছিন্ন হয়ে যায়! গভীর ধ্যান চললে সাধকের যেমন মনে হয়—একটু নড়াচড়াতেই বোধ হয় সুখময় অবস্থাটি কেটে যাবে; তাই সাধক যতক্ষণ পারেন শান্ত, নির্বিকার হযে থাকতে চেষ্টা করেন। তেমনি আমারও ধ্যানের অবস্থা চলছিল সব সময়। আর এই কারণেই এত কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারবাবু যদি এভাবে জীবন হানি করার চেষ্টা না করতেন তাহলে কখনোই আশ্রমে আমার'আসা হত না; মাকে দেখা এবং তাঁর কাছে থাকাও হত না! কিন্তু তা তো হবার নয়! কোন আন্তরিক প্রার্থনা কি মা পূর্ণ না করে থাকতে পারেন?

এই কারণেই বোধ হয় এমন বিপদে পড়ে মায়ের সেই বাণীটি বার বার স্মরণ করতে লাগলাম: 'তুমি এখান থেকে চলে গেলে কোন পক্ষেরই ক্ষতি হবে না।' 'কোন পক্ষ' বলতে বুঝলাম—আমার এবং ডাক্তারবাবুর পক্ষ। আমি যে সত্যে বদ্ধ হয়েছি, তার জন্যেও আমার কোন ক্ষতি হবে না; এবং ডাক্তারবাবু যে আমাকে সত্যে বদ্ধ করে এরকম কষ্ট-যন্ত্রণা দিচ্ছেন সে জন্যেও তাঁর কোন ক্ষতি হবে না বা আমি চলে গেলে পাঠমন্দিবেরও কোন অসুবিধা হবে না।

এতদিন পরে বাণীটির মর্ম-প্রকৃতি দেখে মায়ের বাণী বলে বিশ্বাস হল। কেননা এটি তো শুধু আমার অহং-এর স্বপক্ষে বাণী নয়? শুধু আমাকেই বললেন না যে, তুমি পালিয়ে এসো; ওদের যা হয় হোক? কিন্তু এ যে শুভঙ্করী বাণী? সর্বদ্রষ্টা মা সব দিক দেখছেন। আমি যে কষ্টে পড়ে চলে যাবার কথা ভাবছি তা-ও দেখছেন, আবার সত্যে বদ্ধ হয়ে পালাবার শক্তি নাই তা-ও বুঝছেন। এমন কি, আমি চলে গেলে পাঠমন্দিরের কি অবস্থা হবে ভেবে আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়ছি—সেটিও তিনি দেখছেন। তাই তো বললেন, কোন পক্ষেরই ক্ষতি হবে না। আমার অন্তরও খুশী হয়ে বলল—এই তো চাই! যে-কোন কারণেই হোক ডাক্তারবাবু আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন, কিন্তু তবু আমি তাঁর এবং পাঠমন্দিরের কোন-রকম অমঙ্গল চাইনে। আমি শুধু তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে চাই।

ডাক্তারবাবু আমাকে মুখে চলে যাবার কথা বলতে পারলেন না, বলা অবশ্য সম্ভবও নয়। কিন্তু তাঁর অন্তর এই সময়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। বিনাপ্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি একদিন বললেন—আমি ভেবে দেখলুম, এক বনে কখনো দুই সিংহ থাকতে পারে না। হয় তুমি থাকবে এই পাঠমন্দিরে, আর না-হয় আমি থাকব।

দু'জনে একস্থানে কিছুতেই থাকতে পারব না! এ কথা শোনার পর শুধু এটুকু বুঝলাম যে, তিনি আর আমাকে এক তিলও সহ্য করতে পারছেন না।

সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত আমার পণ্ডিচেরী চলে যাওয়াই স্থির হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর সব হুমকি, সব ফন্দী, আর আমার দিক থেকে সব অন্ধ সংস্কার কাটিয়ে দিলেন ভগবতী জননী। আবার শুধু কি তাই? আগে কত দুর্ভাবনা ছিল—কি জানি পণ্ডিচেরী গেলেও মা যদি আশ্রমে থাকবার অনুমতি না দেন? কিন্তু এখন স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা মা ঠিক করে রেখেছেন। শুধু একবার পণ্ডিচেরী পৌঁছুতে পারলেই হল। সত্যি সত্যি এসব আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম!

ডাক্তারবাবু অবশ্য পণ্ডিচেরীতে পত্র দিলেন না। হয়ত ভয়েই দিলেন না। কারণ মায়ের কাছে কি সত্যি-মিথ্যে চাপা থাকবে? তিনি তো সব কিছুই দেখছেন!

তবে তিনি পণ্ডিচেরীতে পত্র না দিলেও আমাকে জব্দ করার আর যতগুলো উপায় তাঁর জানা ছিল সেগুলোর কোনটাই বাদ দিলেন না। প্রথমে তো কাছে দাঁড় করিয়ে মনের সব ঝাল মিটিয়ে দুবাসার মত প্রচুর শাপ-শাপান্ত দিলেন। তারপর বললেন—দাঁড়াও, আমিই তোমাকে এতদিন আগ্‌লে রেখেছিলুম বলে তুমি থাকতে পেরেছিলে, এবার আমিই তোমাকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিচ্ছি—আত্মীয়দের খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা এসে তোমার টুঁটি টিপে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেবে!

তাঁর ধমকানি দেখে ভেবেছিলাম, তা কি তিনি করতে পারবেন? শুধু ভয় দেখাবার জন্যেই বলছেন? কিন্তু সব ভুল তিনি আমার ভেঙ্গে দিলেন। সত্যিই তিনি আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, তোমাদের ছেলে পণ্ডিচেরী পালিয়ে যেতে চাইছে, তোমরা ধরে নিয়ে যাও ওকে।

আমার জমি-জায়গা আত্মীয়েরাই দেখাশুনা করতেন, পণ্ডিচেরী যাবার খরচ-পত্রের জন্যে তাঁদের কাছে আমাকে যেতেই হল। আর তাঁরাও এব্যাপারে যতদূর সম্ভব বাধা ও অসুবিধার সৃষ্টি করলেন।

এ-সব তো গেল স্থূল বাইরের বিপদ। এ ছাড়া ভেতরের সূক্ষ্ম বিপদই কি কম ছিল? যেদিন পণ্ডিচেরী যাত্রা করব তার আগের দিন বিকেল থেকে বুকের দুটো দিকে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। এমন কষ্ট যে দম বন্ধ হয়ে আসে। সহ্য করতে না পেরে গেলাম একজন বন্ধু ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার

বুক পরীক্ষা করে নিজেই যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—করেছ কি, এ যে রীতিমত প্লুরিসি বাধিয়ে বসে আছো!

আমি নিজেও তো কিছুদিন ডাক্তারী করে এসেছি? কিন্তু ডাক্তার এমন ভয় পাইয়ে দিলেন যে, জ্ঞান-বুদ্ধি সব উড়ে গেল। অতি কষ্টে ম্লান হেসে তাঁকে জবাব দিলাম—তার মানে ফার্ষ্ট ষ্টেজ অফ টি. বি.? কিন্তু ডাক্তার, আমি তো শরীরের ওপর কোন অত্যাচার করিনি—প্লুরিসি হবে কি করে? ভাল খাওয়া-দাওয়া না পেলেও অনিয়ম করিনি; সাবধান সতর্কে থাকি; প্রতিদিন আসন করি, আজও আসন করেছি—তখন তো কিছু বুঝতে পারিনি! আপনি একটু ভাল করে দেখুন……

অভিজ্ঞ ডাক্তার অমনি ফোঁস করে উঠলেন—যা বলেছি আমি ঠিক বলেছি, বিশ্বাস না হয় বাজারের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে দেখাওগে!

অবিশ্বাস করার উপায় নাই। বুকের মধ্যে তখন ভীষণ কামড়ে ধরে আছে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। তবুও বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে গেলাম সবচেয়ে বড় হোমিওপ্যাথের কাছে। কিন্তু তিনিও ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে আরো বেশি ভয় পাইয়ে দিলেন, মুখটা গম্ভীর করে বললেন—এ যে টি. বি. দেখছি!

শুনে এবার আমি আর্তনাদ করে উঠলাম—এঁ্যা, টি. বি.? কিন্তু আমি তো কিছুই এতদিন টের পাইনি?

পাবে কি করে? অনেকদিনের পুরণো রোগ পুষে রেখেছ শরীরের মধ্যে?

—কিন্তু ডাক্তারবাবু, এই কঠিন ব্যাধি নিয়ে আমাকে যে কাল সকালেই পণ্ডিচেরী যেতে হবে? আপনি যখন পুরনো রোগ বলছেন তখন দু'দিনেই নিশ্চয় আমি মারা যাব না? এমন কিছু ওষুধ দিন যাতে এই রাস্তাটুকু অন্ততঃ পার হয়ে যেতে পারি।

ডাক্তারের করুণা হল, তিনি আশ্বাস দিলেন—আপনার ভয়ের কিছু নাই, আমি যা ওষুধ দিচ্ছি তাতে কোলকাতা পর্যন্ত যাওয়া চলবে। সেখানে আবার কোন ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন।

কী ভাগ্যিস্ শুধু খরচের ভয়ে হোমিওপ্যাথকে দেখিয়েছিলাম! অ্যালোপ্যাথকে দেখালে তিনি নিশ্চয় আমার পণ্ডিচেরী যাওয়া তো বন্ধ করতেনই, সঙ্গেসঙ্গে আমাকে টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পাঠাতেন। কিন্তু ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়েও যন্ত্রণা কমলো না। শুধু সহ্য করার একটু ক্ষমতা বাড়ল যে, হ্যাঁ, আমি ওষুধ খেয়েছি; শরীরের মধ্যে রোগের প্রতিষেধক পড়েছে!

ঐ অবস্থায় কলকাতায় পৌঁছে আমাদের দেশের একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে যেতে তিনি আমার ব্যাধির কথাটা একেবারে উড়িয়েই দিলেন— হ্যাঁ, কোথায় আপনার টি. বি. ? চোখ মুখ আপনার জ্বলছে ! টি. বি. পেশেণ্টের কখনো এরকম চোখ-মুখ হয় ? এই ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে মায়ের নাম নিয়ে আপনি পণ্ডিচেরী বেরিয়ে পড়ুন।

তাই করলাম। পরের দিন ট্রেনে রিজারভেশন ছাড়াই হাওড়া ষ্টেশন থেকে পণ্ডিচেরী রওনা হয়ে পড়লাম।

[নয়]

'করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে,
কোথা নিয়ে যায় কাহারে ;
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া,
এনেছ তোমার দুয়ারে।'

বাস্তবিক যে-লৌহকঠিন চুক্তিব হাঁড়িকাঠে একদিন স্বেচ্ছায় মাথা গলিয়ে দিয়েছিলাম, মায়ের করুণা ছাড়া কে এমনভাবে সব শৃঙ্খল কেটে আবার আমাকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনতো ? কে বলতে পারে, হয়ত এই পাঠমন্দিরে এসেছিলাম বলেই এক বছরের মধ্যে আমার আশ্রমে আসা সম্ভব হল ?

অবশ্য এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা এবং বিশ্বাস। পাঠকরা হয়ত এ-বিশ্বাসকে না মানতে পারেন। তাঁরা হয়ত বলতে চাইবেন, পাঠমন্দিরে যাবার দিন সেই সতর্কবাণী শুনলে তো এ-বিপদের মধ্যে পড়তে হত না ? তাহলে তো আরো আগেই আশ্রমে আসা হতে পারতো ?

তাঁদের অবগতির জন্যে তাহলে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। স্থূল জগতে প্রায় কৈশোব হতেই কিভাবে ডাক্তারবাবু আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন সে-পরিচয় তো আগেই দিয়েছি ? কিন্তু সূক্ষ্ম জগতেও তিনি কেমনভাবে আমাকে আকর্ষণ করতেন তার একটুখানি আভাস দিই—

কৈশোরে পাঠমন্দিরের সঙ্গে সংযোগ হবার পব থেকেই আমি একই ধরণের স্বপ্ন দেখতাম—একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ প্রায়ই আমাকে ডাকতেন, বলতেন, তুমি আমার কাছে এস। তাঁর চেহারা হাব-ভাব এবং মুখের হাসি দেখে সাধু বলে মনে হত। আর তাঁকে দেখতেও শ্রীঅরবিন্দের মত লাগত। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের মত তাঁর চুল দাড়ি ছিল না, ঐরকম জ্যোতির্ময় দেহও ছিল না। তিনি শুধু শ্রীঅরবিন্দের মত সাদা ধুতি পরতেন এবং সেই ধুতির শেষাংশ তাঁর মত শরীরের উধ্বাংশ জড়িয়ে রাখতেন। শ্রীঅরবিন্দের এই বেশটি আমার অতিশয় প্রিয় ছিল। আমার চোখে কী শুচি-শুভ্র কী সুন্দরই যে লাগত তাঁর এই বেশটি !

আসলে স্বপ্ন-দৃষ্ট ঐ ব্যক্তি শ্রীঅরবিন্দের মত বেশ ধারণ করেই আমার দৃষ্টিকে মুগ্ধ করতেন। পেছন থেকে ঐ বেশ দেখেই আমি তাঁর কাছে কত সময় ছুটে গিয়েছি ! কিন্তু মুখটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মধ্যেও আমি ভূত দেখার মত ভয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

একটা স্বপ্নের কথা এখনো মনে পড়ে—কোথায় যেন বিরাট এক যজ্ঞানুষ্ঠানে

গিয়েছি আমি। অনুষ্ঠানের মাঝখানে উঁচু বেদী রয়েছে আর বেদীর ওপরে বসে রয়েছেন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত সেই ব্যক্তি। চারদিকে বসেছেন দর্শকেরা। আমি অনুষ্ঠানে গিয়েছি গুরুদেবকে খুঁজতে—এত মানুষ যখন রয়েছে, তখন আমার গুরুও নিশ্চয় থাকবেন? সে-সময় স্বপ্নে জাগরণে শুধু গুরুদেবকেই খুঁজতাম, তাঁর দর্শন পেতে চাইতাম। আমি সেখানে যেতেই বেদীর ওপরে যিনি বসেছিলেন তিনি খুব আদর করে আমাকে কাছে ডাকলেন—তুমি কাকে খুঁজছো? আমার কাছে এস, আমিই তোমার গুরু? তাঁকে চিনতে পেরেই আমি পেছন ফিরে ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত শ্বেত শ্মশ্রু-গুম্ফযুক্ত আমার আরাধ্য গুরুদেব দূরে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন। ভাবটা যেন—তিনি বলতে চান—আহা! আমিও যে তোমাকেই খুঁজছি! তোমারই জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছি!

আমি অমনি 'হে গুরুদেব, আমায় রক্ষা করুন' বলে চীৎকার করতে করতে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মত শ্রীঅরবিন্দের চরণে পড়ে গেলাম!

স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রথম ব্যক্তির চেহারা অবিকল ডাক্তারবাবুর মতই ছিল। এমন কি বাস্তবে তাঁর মুখের ঐ কথাগুলি পযন্ত কেমন মিলে গেল?

তাই বলছিলাম, তাঁর কাছে আমার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমিও কাছে থেকে তাঁকে ভাল করে চিনে নিলাম, আর তিনিও আমাকে দেখে নিলেন। অনেক দিন থেকে আমার প্রতি তাঁর যে একটা আকর্ষণ ছিল সেটা মিটে গেল। তাঁর অনুভবটি হয়ত তিনি ঐভাবেই প্রকাশ করলেন, এক বনে দুই সিংহ থাকতে পারে না—হয় তুমি থাকবে পাঠমন্দিরে, না-হয় আমি থাকব।······

সে যাই হোক, যা বলছিলাম, পণ্ডিচেরী যাত্রার পূর্ব থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় মাদ্রাজগামী ট্রেনে উঠে বসতেই সব শারীরিক কষ্ট মিলিয়ে গেল। এক অপূর্ব শান্তি এবং অনাবিল আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম।

বারোই জুলাই উনিশ শো একষট্টি। প্রায় সাত বছর পরে আবার আমি পণ্ডিচেরীতে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ির জন্যে মাদ্রাজ মেলও ধরতে পারলাম না, আর রিজার্ভেশন করেও আসতে পারলাম না, এসেছিলাম জনতা এক্সপ্রেসে। তারপর পণ্ডিচেরীর ট্রেনটাও সেদিন যোগ বুঝে রাস্তায় বেশি সময় নিয়ে নিল। কাজেই এবারেও সেই প্রথমবারের মত পণ্ডিচেরী ষ্টেশনে এসে যখন নামলাম, তখন সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে পাটে বসেছেন। ষ্টেশনের ধারে ঘন বিন্যস্ত

নারকেলকুঞ্জের মাথায় মাথায় আকাশে কালো-সাদা-পাংশুটে নানাবর্ণের ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের গায়ে তখনো অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষরশ্মি যেটুকু খেলে বেড়াচ্ছিল, ষ্টেশন থেকে রিক্সায় চড়ে যখন আশ্রমের ব্যুরো সেণ্ট্রাল অফিসে এসে পৌছুলাম তখন সেটুকুও মিলিয়ে গিয়ে রীতিমত অন্ধকার হয়ে এল।

তা হোক অন্ধকার। পণ্ডিচেরী আশ্রম তো আমার একেবারে অচেনা জায়গা নয়? অন্ততঃ আশ্রম আর ডাইনিং রুমটা তো আমার চেনাই রয়েছে? তাছাড়া আমাদের পাঠমন্দিরের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন দু'জন সাধকের নামও এবারে মুখস্থ করে এসেছি! কাজেই আমার অসুবিধের কি আছে?

ব্যুরো সেণ্ট্রাল অফিস সে-সময় আশ্রমের রাস্তায় ছিল না, ছিল অন্য একটা রাস্তায়। রিক্সাকে ছেড়ে দিয়ে আমি অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অফিসে যিনি ছিলেন তিনি তখন সাবিত্রী' আবৃত্তি করতে করতে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। আমি দরজার সামনে কতকক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম, তিনি জানতেই পারলেন না। আপন মনে পায়চারী করতে লাগলেন। আমারও আর তাঁর সেই ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছে করল না, চুপ করে তাঁকে দেখতে লাগলাম। মাথায় বড বড চুল, মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি-গোঁফ, পরনে সাদা শর্টস্-শার্ট আর পায়ে সাদা সক্স্ এবং সাদা কেট্সের জুতো। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সাবিত্রী আবৃত্তি এর আগে বড বেশি শুনিনি। অনেকদিন আগে একবার শুনেছিলাম কলকাতা পাঠমন্দিরে লাইব্রেরীয়ানের মুখে। হঠাৎ সেদিন অসময়ে গিয়ে পড়েছিলাম, দেখি তিনি তখন আপন মনে সাবিত্রী আবৃত্তি করতে করতে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকেও সেদিন এঁর মতো অদ্ভুত সুন্দর দেখিয়েছিল। একসময় দরজার দিকে সেই সাধকের নজর পড়ে যেতেই তিনি অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—ওঃ জেণ্টেলম্যান, ইউ আর ষ্ট্যাণ্ডিং! হোয়াই ডু ইউ নট্ কল মি? আহা, আমাকে এতক্ষণ ডাকেন নি কেন?

তারপর আমাকে বসতে দিয়ে আশ্রম অতিথিশালা পার্ক-আ-সাঁর্বো'র ৪ নং হল-ঘরে থাকবার কার্ড করে দিলেন। ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলেন—অন্ধকার হয়ে গেল যাবেন কি করে? আশ্রম আর ডাইনিং রুমটা দেখিয়ে দেবার জন্যে কাউকে সঙ্গে পাঠাব?

বললাম—আজ্ঞে না, প্রয়োজন হবে না। দিজ ইজ মাই সেকেণ্ড টাইম ভিজিট—আমি আগে একবার এসেছিলাম কিনা!

—ও, তাই নাকি ? তবে তো সব জানা আছে ? বলে তিনি হাসতে হাসতে আমাকে বিদায় দিলেন।

অতিথিশালার কার্ডটা হাতে নিয়ে প্রথমে আশ্রমে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় আশ্রম ? রাতের সেই বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট কিছুই আমি চিনতে পারলাম না। বিগত সাতটি বছরে সব যে এমন করে ভুলে বসেছি তা আমার জানা ছিল না ! এ-দেশের ভাষা বুঝি না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেও বুঝতে পারে না। এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার ফিরে এলাম ব্যুরো সেণ্ট্রালে। যিনি কার্ড দিয়েছিলেন তিনি এবার একজন লোককে সঙ্গে পাঠালেন আশ্রম দেখিয়ে দিতে।

অনেকদিনের অনেক কল্পনার-চোখে-দেখা আশ্রমকে সেদিন ভাল করে দেখলাম—ডাইনিংরুম দেখলাম, আশ্রমেব অতিথিশালা পার্ক-আ-সাঁর্বো দেখলাম। সে-রাতটা আনন্দে-স্বপ্নে-প্রার্থনায় এক নিমেষে কেটে গেল।

পরের দিন সকাল থেকে মায়েব অনুমতি পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সেই সময় থেকেই মা ওপরের ঘরে উঠে গেছেন। আগের মত দিনে তিন-চারবার দর্শন আর নাই। শুধু আছে বছরেব চারিটি প্রধান দর্শন ও সকাল-বেলাকার ব্যাল্‌কনি দর্শন। আর আছে বছরের বিশেষ দর্শনগুলি—এই যেমন, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা এবং সরস্বতীপূজাব দিনে মা নীচে নেমে যে দর্শন ও আশীর্বাদ দিতেন সেই দর্শনগুলি। তবে এই সব দর্শন ছাড়াও আরো একটি দর্শন ছিল প্রতিমাসের পয়লা প্রস্‌প্যারিটি রুমে।

কিন্তু আমি গিয়েছি বারোই জুলাই। পয়লা আগষ্টের আগে সে-দর্শন পাবারও উপায় নাই। সুতরাং মায়ের সামনে গিয়ে প্রার্থনা জানাবার পথ বন্ধ। যা-কিছু প্রয়োজন নলিনীদা'র মাধ্যমেই মাকে নিবেদন করতে হবে।

যদিও এবারে মায়ের অনুমতি এবং নলিনীদা'র পত্র পেয়ে আশ্রমে এসেছি তথাপি নলিনীদা'র কাছে যেতে আমার মন সরলো না। কারণ তাঁকে বলব কি ? পাঠমন্দির থেকে চলে এসেছি শুনলে তিনি যদি বলেন কেন চলে এলে ? তখন আমি তাঁকে সেখানকার অসুবিধের কথা বলব কেমন করে ? আর বললেই তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন ? ডাক্তারবাবু শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি নিয়ে আজ চল্লিশ বছর ধরে একটা পাঠমন্দির চালাচ্ছেন, সেই মানুষকে বিশ্বাস করবেন, না আমার মত পরিচয়হীন মানুষের কথা বিশ্বাস করবেন ?

আমার এ-যুক্তিটা যে নেহাৎ অমূলক নয় তার প্রমাণও পেলাম হাতে হাতে।

আশ্রমের যে-দুজন সাধকের নাম মুখস্থ করে এসেছি তাঁদের মধ্যে X আবার আমাদের পাশের জেলার মানুষ, আমাদের পাঠমন্দিরের সঙ্গে এবং দেশের অনেক লোকের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ আলাপ-পরিচয় আছে ; তিনি আমার মুখে ঐ কথা শুনে সত্যিই ছি ছি করে উঠলেন।

ডাক্তারবাবুরা যখন দলবল নিয়ে আশ্রম পরিদর্শন করতে আসতেন তখন এই X-ই তাঁদের দেখাশুনা করতেন। রাত্রে ডাইনিংরুমে ভোজনের পর তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে পার্ক গেষ্ট হাউস পর্যন্ত তিনি তাঁদের পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

ডাক্তারবাবু আমাদের কাছে তাঁর গল্প করতেন। দাদা এখনো ঠিক সেই রকমটিই রয়ে গ্যাছেন—সেই একখানি কাপড় কেটে তার আধখানি পরণে, আর বাকী আধখানি গায়ে। এত বয়েস হয়েছে, অথচ কেউ তাঁকে দেখে বুঝতে পারবে ? একেবারে ইয়াংদের মত এনার্জিটিক—এখনো আমরা তাঁর সঙ্গে হাঁটতে গেলে হাঁপায়ে উঠি। মুখে হাসিটি সব সময় লেগেই রয়েছে !···

ডাক্তারবাবুর মুখে তাঁর কথা এতবার এতরকমভাবে শুনেছি যে, দেশ থেকেই তিনি আমার চেনা হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হত আশ্রমে গিয়ে কাউকে না জিজ্ঞেস করেই তাঁকে আমি চিনে নিতে পারব। ডাক্তারবাবুর মত আমারও যেন তিনি অতি পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এবার আসবার সময় ভেবে এসেছিলাম যে, আশ্রমে গিয়ে আগে তাঁকে ধরতে হবে। তাঁকে ধরলে তিনি মাকে বলে-কয়ে আমার আশ্রমে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন !

তাই আশ্রমে এসে অবধি চারিদিকে সবার মধ্যে সেই আধখানা কাপড় পরণে, আধখানা কাপড় গায়ে-দেওয়া মানুষটিকেই শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু বৃথা আমার মানুষ চেনার গর্ব ! আশ্রম আর ডাইনিংরুম চেনার মত তাঁকেও আমি চিনতে পারলাম না ! তবে যা হোক তাঁর নামটি আমি ভুলিনি। আশ্রম গেটে তাঁর নামটি বলতেই একজন সাধক আমাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। আশ্রমের পেছনেই তাঁর বাড়ি। তিনিও ঠিক সেই সময় ডিউটি সেরে বাড়ি ঢুকছিলেন, দরজার কাছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

তাঁকে আমি প্রণাম করে আমার পরিচয় দিলাম। তিনি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন, বললেন—তুমি ডাক্তারের পাঠমন্দির থেকে আসছো ? এসো এসো······ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে আমাকে বসতে দিলেন এবং তিনি নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। আমাকে বললেন—বলো, তোমাদের পাঠমন্দিরে মায়ের কাজ-কর্ম কেমন চলছে ? ডাক্তারবাবু এবং মায়ের

শরীর ভাল আছে? আর তোমাদের সেই চৌধুরী—কলকাতায় যাঁর বইয়ের দোকান আছে—তিনি কেমন আছেন? তিনি তো আর আশ্রমে এলেন না?

এক মুখে তাঁর শত প্রশ্ন। সবগুলিরই একে একে উত্তর দিলাম।

সব শুনে তিনি আমার কথা জানতে চাইলেন, বললেন—কত দিন পাঠমন্দিরে রয়েছো?

বললাম—এক বছর।

বলতেই তাঁর মনে পড়ল, তিনি বললেন—ওঃ, মনে পড়ছে! তোমার থাকার কথাই তো ডাক্তারবাবু মাকে জানিয়েছিলেন? নলিনীদা মায়ের আশীর্বাদী ফুল পাঠালেন……

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সব খবরই আপনি রাখেন দেখছি?

তিনি ববললেন—তোমাদের ডাক্তারবাবুর চিঠিতে জেনেছিলাম আর কি! তা এবার কি মাকে দর্শন করতে এসেছ? কতদিন থাকা হবে?

বললাম—না, শুধু তো দর্শনের জন্যে আসিনি? আশ্রমে বরাবর থাকবার জন্যে এসেছি।

—অ্যাঁ, বরাবর থাকবে কেন? দেশের পাঠমন্দিরে ছিলে বেশ তো ছিলে, গ্রামের মধ্যে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কাজ হচ্ছিল?

বললাম—আশ্রমে মায়ের কাছে থাকবার আমার চিরকালের সাধ! জানেন, সাত বছর আগে একবার এসে আশ্রমের দরজা থেকে ফিরে গিয়েছি? মায়ের দর্শন পর্যন্ত পাইনি! আসলে আশ্রমে থাকতে পেয়েছিলাম না বলেই ভুল করে পাঠমন্দিরে উঠেছিলাম!

—কিন্তু তোমাকে পাঠমন্দিরে থাকার জন্যে নলিনীদা যে মায়ের আশীর্বাদ পাঠালেন, তাঁকে এখন কি বলবে?

—সেইজন্যেই তো আপনাকে ধরেছি? আপনি দয়া করে আমার হয়ে নলিনীদাকে একটু বুঝিয়ে বলুন……

তিনি বললেন—কি বুঝিয়ে বলব? যাদের চঞ্চল মন তারা কোথাও বেশিদিন থাকতে পারে না। আশ্রমেই কি তুমি থাকতে পারবে? এখানে কতরকম ট্রাবল্ জান? পাঠমন্দিরে থাকতে পারলে না কেন?

—পারলাম না কেন শুনবেন? কিন্তু বললে কি বিশ্বাস করবেন?

—বলো তো আগে শুনি।

—সত্যি বলছি আপনাকে, পাঠমন্দিরে শান্তিতে থাকতে পেলে আমি কখনো

আশ্রমে আসতে চাইতাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবুই আমাকে থাকতে দিলেন না…

—মানে, কি করলেন তিনি ?

বললাম—তিনি পাগল হয়ে গেছেন…… ।

আর বেশি কিছু আমাকে বলতে হল না। তিনি তখন চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, বলছেন—না না, ও-সব কথা আমি শুনতে চাইনে ! তা কি হয় ? তোমাদের ডাক্তারবাবুকে আমি বিলক্ষণ চিনি ? তিনি একজন সত্যিকারের সাধক ! কতদিন থেকে পাঠমন্দির চালাচ্ছেন জান ? তোমার তখন জন্মই হয়নি ! আর তুমি কিনা ছ'দিনের ছেলে হয়ে তাঁর নামে কমপ্লেন করতে এসেছ আশ্রমে ?

তাঁর সেই কথা সেই মূর্তি দেখে আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম ! ভাবছি, কি ভাগ্যিস্ এসব কথা আগে নলিনীদা'কে বলতে যাইনি ? তাহলে আশ্রম থেকে সঙ্গে সঙ্গেই বিদেয় নিতে হত ! যাক্ খুব বাঁচা বেঁচে গেছি ! তিনি কিছুটা শান্ত হলে তাঁকে বললাম—অপরাধ মাপ করবেন। দেখুন, আপনারা আমাকে পাঠমন্দিরে থাকবার জন্যে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না। ভেবেছিলাম, সেই না-থাকতে-পারার একটা কারণ না দেখালে আপনারা আমাকে আশ্রমে থাকতে দেবেন না ? তাই এ-সব বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিন্তু তাঁর রাগ তখনো পড়েনি। তিনি সেইভাবেই ত্যক্ত-বিরক্তভাবে বললেন—আমি একটুও শুনতে চাইনে ও-সব কথা। তোমার জানাবার প্রয়োজন থাকে তো তুমি চারুদা'কে বলগে—তাঁর সঙ্গে তো তোমার একটু আগেই পরিচয় হয়েছে বললে ? তাঁকে বলো, তিনি নলিনীদাকে জানাতে হয় জানাবেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর এরূপ ব্যবহারেরও আমি এতটুকু মন্দ ভাবতে পারলাম না। বরং নিজের ব্যবহারে নিজেই মরমে মরে গেলাম—ছিঃ ছিঃ ! কেন আমি আশ্রমে থাকবার জন্যে অন্যের ভাল-মন্দর কথা বলতে গেলাম ? ইনি সত্যিই সাধক ! অন্যের দোষের কথাও তাই কানে তুললেন না !

আর একটি কথাও না বাড়িয়ে তাঁকে আবার একবার প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে চলে আসছিলাম। হঠাৎ সেই বাড়ির বাইরের দরজাটা দেখে অতীতের স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠল—আরে, এই তো সেই দরজাটা ! এই দরজায়

কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেই তো দ্বাররক্ষী সেবারে আমাকে রুটি-কলা এনে দিয়েছিলেন? তবে কি ইনিই সেদিন আশ্রম-গেটে বসেছিলেন?

কিন্তু এ-সব কথা গুছিয়ে ভাববারও আমার তখন মন ছিল না। মাথায় তখন ঘুরছে কি ভাবে তাহলে চারুদাকে আবার বলব, কিভাবে মায়ের অনুমতি পাব? সেখান থেকে আশ্রমের দিকে যাচ্ছিলাম, পথের মধ্যেই যা হোক চারুদার সঙ্গে আবার দেখা হল। তাঁর সঙ্গে একটু আগেই পরিচয় হয়েছিল। এক পত্রিকাতে তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়' লেখা পড়ে দেশ থেকে তাঁকেও চিনেছিলাম এবং তখন থেকেই তিনি আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন।

চারুদাকে পাঠমন্দিরের কথা কিছু আর বললাম না। শুধু বললাম—আমি আশ্রমে থাকতে চাই, আপনি আমার হয়ে নলিনীদাকে একটু জানাবেন?

তিনি উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলেন—আশ্রমে থাকতে চাও? এ তো খুব ভাল কথা। চলো আমি তোমাকে নলিনীদার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

তাঁর সঙ্গে নলিনীদা'র কাছে গেলাম। নলিনীদা দেশের পাঠমন্দিরের কোন কথাই শুনতে চাইলেন না; শুধু আমার একখানা ফটো চাইলেন মাকে দেখাবার জন্যে। চারুদার পরামর্শ মত আমি আগে থেকেই এক কপি ফটো সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেটি তাঁর হাতে দিয়ে এলাম।

চারুদা বাইরে এসে আমাকে চুপি চুপি বলে দিলেন—এবার খুব করে মাকে ডাক, তবে যদি তোমার প্রতি মায়ের কৃপা হয় তো হবে?

বললাম—সে-কথা আর বলতে? মাকে তো সব সময়ই ডাকছি, কিন্তু কেন আপনি অমন কথা বলছেন—কৃপা হয় তো হবে?

তিনি বললেন—বলছি কি সাধে? তুমি বড় বে-টাইমে এসে পড়েছ হে ছোক্‌রা!

—বে-টাইম মানে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—মানে, আমাদের দেশ থেকে তোমারই মত এক ছোক্‌রা আজ কুড়ি-পঁচিশ দিন হল আশ্রমে এসে বসে আছে। সে-ও মাকে ফটো আর চিঠি পাঠিয়েছে নলিনীদা'রই হাত দিয়ে। তোমার তো এখানে কেউ নেই। কিন্তু সেই ছোক্‌রার এক পিসিমা আছেন এখানে। তিনি আবার ডাইনিংরুম কিচেনের ইন্‌চার্জ, তিনি তাঁর ভাইপো'র অনুমতির জন্যে দিনের মধ্যে দু'চারবার নলিনীদার কাছে গিয়ে তদারকী করে আসছেন। কিন্তু তোমার জন্যে কে করবে?

বললাম—আমার জন্যে মা করবেন? আমার মা আছেন!

—আরে, সেইজন্যেই তো বলেছি তোমাকে, খুব করে মাকে ডাক।

আমি তবু বললাম—আচ্ছা, সে যেমন আগে এসেছে তার তেমন আগে অনুমতি হোক, আমি তার পরে এসেছি, আমার না-হয় পরে অনুমতি হবে—তাতে কি? আমি অপেক্ষা করে থাকব।

তিনি তখন হাসতে হাসতে বললেন—না হে ছোক্‌রা, তুমি যা ভাবছ তা নয়। অপেক্ষা করে তো থাকবে, কতদিন থাকবে শুনি? যারাই এখন আশ্রমে এসে থাকতে চাইছে মা তাদের সবাইকেই রাখছেন না। বেছে বেছে রাখছেন। কাজেই তোমাদের দু'জনের মধ্যে হয়ত একজনকে মা রাখবেন—হয় তোমাকে, আর না-হয় সেই ছোক্‌রাকে। একজনকে ফিরে যেতে হবে।

তাঁর কথা শুনে এবার আমি সত্যিই হতাশ হয়ে পড়ি, বলি—সত্যি?

সত্যি নয় আবার? একশো'বার সত্যি! এ তো জানা কথা, যার প্রার্থনার জোর বেশি, যার আধার ভাল, মা তাকেই স্থান দেবেন। তা না হলে তুমি কি ভাবো, যোদো মোধো সেধো যে আসবে আশ্রমে সে-ই রয়ে যাবে?

—না, তা আমি ভাবিনি। ও-সব কথা তো আমিও জানতাম। কিন্তু আপনার মুখে শুনে সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল। তাহলে কি হবে আমার?

—কি আর হবে? ওই তো বললুম—মাকে ডাকো?

তিনিও যেন আমার জন্যে ভেবে পড়লেন। বলতে লাগলেন—তাছাড়া এ-বিষয়ে মাকেই-বা কি বলি বলো? ডিভাইনেরও তো একটা ধর্ম আছে? যে-মানুষটা আজ কুড়ি-পঁচিশ দিন আগে থেকে এসে আশ্রমে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, তাকে আগে অনুমতি না দিয়ে কি তোমাকে দেবে? তা কি হয়? সত্যি বলতে কি, তোমার আশা খুবই কম! তবু প্রার্থনা করে ছাখো···

তিনি আমাকে একেবারেই নিরাশ করে দিলেন।

তবু আমি মনে মনে আশা করি—কিন্তু এমন কি হয় না যে, আমাদের দু'জনের প্রার্থনাই পূর্ণ হয়? মা আমাদের দু'জনকেই কৃপা করে অনুমতি দেন? আমি যেমন অনেক আশা নিয়ে এসেছি, সে-ও তো তেমনি এসেছে? তাকে ফিরিয়ে দিলে তারও যে আমার মত কষ্ট হবে?

তাই মাকে আমি এই প্রার্থনাই জানালাম—মা, তোমার করুণার তো অন্ত নেই! তুমি আমাদের দু'জনকেই তোমার আশ্রয়ে থাকবার অনুমতি দাও মা। আমাদের কোন গুণ নেই—তার আছে কিনা জানিনা, অন্ততঃ আমার তো নেই,

তপস্যার জোরও নেই। শুধু তোমার কৃপা দিয়ে আমাদের সব রকম অপূর্ণতা পূরণ করে নাও মা?

চারুদা আশ্রমের পাশেই মোটর ওয়ার্কশপের বাড়িতে থাকেন। আমি যখনই আশ্রমে যাই, কিংবা ডাইনিং রুমে আসি তখনই তাঁর সঙ্গে কোথাও-না কোথাও একবার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আর তিনি অমনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন—কেমন, মাকে খুব ডাকছো তো?

আমিও কৃতজ্ঞচিত্তে হাসতে হাসতে জবাব দিই—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ডাকছি।

এক-একবার তাঁর এরকম প্রশ্ন শুনে আমি লজ্জা পেয়ে যেতাম—হা ভগবান! আমি কি এতই ছোট কিম্বা শিশু যে, এটুকুও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? আমার নিজের প্রয়োজনটা যে কত বড় সেটুকুও কি আমি বুঝি না? কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর শিশুর মত সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভক্তি-নম্রচিত্তে তাঁকে উত্তর দিতাম—ডাকছি বৈকি, সব সময়ই মাকে ডাকছি!

তিনি বলতেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাকে ডাকো, খুব ডাকো, প্রার্থনা করো।

আমার প্রতি তাঁর এই অহেতুক কৃপা দেখে আমি সত্যিই একেবারে গলে যেতাম! মাকে অন্তরে অন্তরে কৃতজ্ঞতা জানাতাম এই বলে যে,—কে বললে মা আমার জন্যে এখানে চেষ্টা করবার কেউ নাই? অশীতিপর বৃদ্ধ সরল এক সাধকের মুখ দিয়ে তুমি মা একদিকে দিচ্ছ ভয়, আবার অন্যদিকে দিচ্ছ আশ্বাস। তুমি রোগ হয়ে যন্ত্রণা দাও, আবার ওষুধ হয়ে নিরাময় করো! 'মা, তোর কত রঙ্গ দেখবো বল্?'

কিন্তু তা যাই হোক, চারুদা'কে ভাবের প্রাবল্যে বললাম তো—হ্যাঁ, আমি খুব ডাকছি মাকে। অথচ নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি, কই একটিবারের জন্যেও তো সেখানে ঐরকম কাতর ডাক উঠছে না! একবারও তো বল্‌ছি না—মা, আমাকে কৃপা ক'রে অনুমতি দাও।

সত্যি সত্যিই, চারিদিকে এত বিরোধ এত নিরাশা সত্ত্বেও সমস্ত অন্তরটা কিভাবে যেন এক পরম বিশ্বাসে নির্ভরতায় জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল! কি হবে, না-হবে—এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনার বোধই ছিল না সেখানে। যা করতে হবে সব এবার মা-ই করে দেবেন!

কার্যতঃ হলও তা-ই। মা আবার একটি মিরাক্‌ল্ ঘটালেন! করুণাময়ী মা আমাদের দু'জনের প্রার্থনাই পূর্ণ করলেন! যেদিন আমি ফটো পাঠিয়েছি তার পরের দিনই মায়ের অনুমতি এসে পড়ল আমাদের দু'জনের আশ্রমে থাকবার।

একই দিনে আমরা দু'জনে অনুমতি পেলাম, একই জায়গায় দু'জনের থাকবার ব্যবস্থা হল, আবার মাস কয়েক পরে একই সময়ে দু'জনে প্রস্‌প্যারিটিও পেলাম। আশ্রমে সেই হল আমার প্রথম সুহৃদ। অবশ্য সে-সুহৃদটি বছর তিন চারের মধ্যেই আবার দেশে চলে গেল।

কিন্তু এসব কথাও যাক এখন। যে-অপূর্ব রহস্য যবনিকার অন্তরালে এই সাতটি বছর প্রচ্ছন্ন ছিল তা কেমন করে হঠাৎ একদিন আমার সচেতন দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে উঠল এবার তা-ই বলি।

বারোই জুলাই আমি আশ্রমে এসেছি, অথচ মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করতে পেলাম পয়লা আগষ্ট তারিখে। তার আগে সতেরো-আঠারো দিন প্রতি সকালে মায়ের ব্যাল্‌কনি দর্শন পেয়েছি বটে, কিন্তু সে-দর্শনে মাকে দেখা এতটুকুও হয়নি।

প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান সেরে নিত্য কর্মগুলি সমাধা করে পার্ক-হল থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে আশ্রমের সামনে এসে যখন পৌঁছুতাম তখন
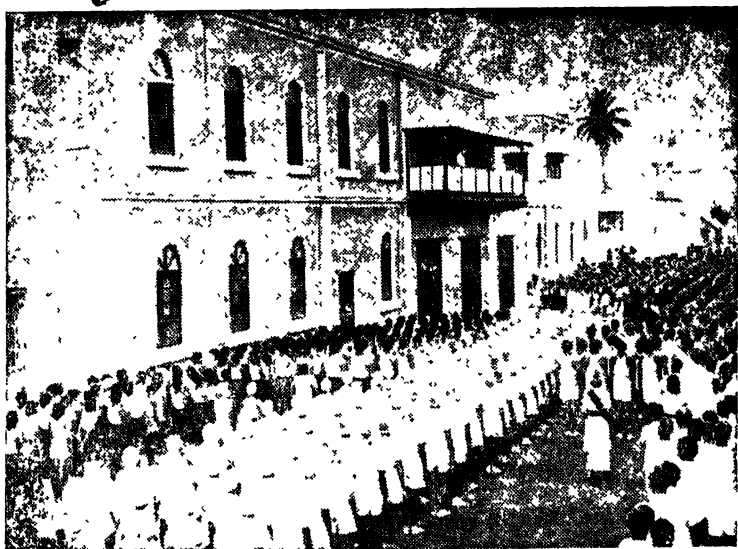
ব্যাল্‌কনির নিচে অনেকটা স্থান ভরে উঠত দর্শকমণ্ডলীতে। এমনি প্রায় রোজই হত। যত তাড়াতাড়িই করি, যত রাত থেকেই উঠি না কেন, দু'একদিন ছাড়া সকলের আগে এসে ব্যালকনির একেবারে নিচে দাঁড়াতে পারলাম না।

অবশ্য অপেক্ষাকৃত দূরে দাঁড়ালেই ব্যাল্‌কনিতে মাকে দেখা যায় ভাল। মা

যখন ভেতরের দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হন, তখন থেকেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। পরন্তু খুব নিকটে দাঁড়ালে মা যতক্ষণ না ব্যাল্‌কনির একেবারে রেলিং-এর কাছে আসেন ততক্ষণ তাঁকে দর্শন করা যায় না। হয় ততক্ষণ আকাশের দিকে মুখ তুলে ঘাড়ে ব্যাথা করে ফেলতে হয়, আর না-হয় চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে করতে কখন্ পাশাপাশি দর্শকদের খস্‌খস্ হুট্‌পাট শব্দ সুরু হবে তার অপেক্ষায় থাকতে হয়। কারণ মা উপস্থিত হলেই দর্শকদের মধ্যে ব্যস্ততা পড়ে যায়, যারা বসে থাকে তারা উঠে দাঁড়ায়, আব ঐরকম শব্দ হতে থাকে।

মোটের ওপর, কাছে দাঁডিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে এক পক্ষকালেরও বেশি মাকে তো দর্শন করলাম! তথাপি মাকে দেখা আমার হল না—মায়ের কেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, কেমন শ্রী, কেমন অবয়ব—এসব কিছুই দেখা হল না। ঐসব দেখার কথা আমার মনেও ছিল না তখন। আমার অন্তরের ধ্যানের মূর্তিতেই শুধু মাকে দেখলাম, ছবিতে যে-মূর্তি এতদিন দেখে আসছি শুধু সেই মূর্তিতেই দেখলাম ক'দিন। তার কারণ বোধহয়, ঐ মূর্তি যে আমার অন্তরে আঁকা রয়েছে—আমার রক্তে-মাংসে, অস্থিতে-মজ্জাতে, সত্তার প্রতিটি অণুপরমাণুতে যে মিশে আছে ঐ মূর্তি! তাই বিনা সংকল্পে বিনা আয়াসেই ঐ রূপে মাকে দিন-প্রতিদিন দেখতে লাগলাম। মাকে ভক্তেরা যে নানাভাবে নানা দেবদেবীর মূর্তিতে দর্শন করে থাকেন তার কারণও হল ওই। যার সত্তার যেমন অবস্থা তেমনি তার অনুভূতি উপলব্ধি।

সে যা হোক, তারপর এল একদিন একটি বিশেষ সুযোগ, একটি বিশেষ মুহূর্ত —পয়লা আগস্টের প্রস্‌প্যারিটি দিন। প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে মা দু'বার দর্শন দেন—প্রভাতে ব্যাল্‌কনি দর্শন, তারপর অপরাহ্ণে প্রস্‌প্যারিটি রুমে দর্শন। ঐখানে বসে মা সেদিন আশ্রমবাসীদের সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তর বিতরণ করেন। আমার প্রস্‌প্যাবিটি ছিল না, তবুও আমি দর্শন পেলাম। যাদের প্রস্‌প্যারিটি না থাকে মা তাদের হাতে ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

সেদিন ডাইনিং রুমে দুপুরে খাবার পরেই আমি আশ্রমে গিয়ে বসে রইলাম, পাছে অন্য কোথাও চলে গেলে মাকে দর্শন করতে দেরী হয়ে যায়। আজ প্রথমদিন মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করতে পাবো, কাজেই যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় করব। তবু ঐটুকু সময় মায়ের ধ্যানে কাটবে।

ভেবেছিলাম এরকম ভাবনা শুধু আমার একারই। মায়ের দর্শন দিতে তখন তিন চার ঘণ্টা বিলম্ব আছে—এত আগে থেকে কি কেউ আসবে? কিন্তু আশ্রমে

গিয়ে দেখি এরকম ভাবনা সবারই। আমার আগে অনেকেই এসে লাইন দিয়ে বসে গেছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে লাইনের মধ্যে বসে গেলাম।

তারপর যথাসময়ে মা প্রস্প্যারিটি রুমে এসে আসন গ্রহণ করলেন, অচল লাইন হঠাৎ চলতে সুরু করল। লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে আমরা মায়ের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু সেদিন লাইনে দাঁড়িয়েও রীতিমত একটা আশ্চর্যের কাণ্ড ঘটে গেল। লাইনের মাঝখানে সবার সঙ্গে চলতে চলতেও কিভাবে জানি না আমি অনেকটা পিছিয়ে পড়লাম। প্রস্প্যারিটি রুমের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখলাম, আমার সামনে কোন দর্শকই নাই। যারা আছে তারা তখন মাকে দর্শন করে আমারই পাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

উপরের বারান্দায় উঠে একটা বাঁক ঘুরতেই অমনি আমার নজর পড়ে গেল চেয়ারের গদি-আঁটা সিংহাসনে মহিমময়ী মূর্তিতে মা বসে রয়েছেন। মা-ও তখন ঘাড় ফিরিয়ে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েছেন। আমি মায়ের দিকে যাচ্ছি সোজা পথে নয়, মায়ের বাঁ দিক দিয়ে সমকোণ তৈরী ক'রে।

ভাবছি আমি পিছিয়ে পড়েছি বলে বোধহয় মা ঘুরে দেখছেন পরের দর্শক কে আসছে, কেন দেরি হচ্ছে? সেই ঘরে মায়ের কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁরাও নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হচ্ছেন আমার এমন পিছিয়ে পড়া দেখে। এসব কথা চিন্তা করে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু সহসা বিরাট এক আশ্চর্যের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। আমার মন-বুদ্ধির সমস্ত শক্তি দিয়েও সে-আশ্চর্যের কূলকিনারা দেখতে পেলাম না। একি! কোথায় মায়ের চোখ? কোথায় মায়ের সেই চির পরিচিত বরদায়িনী মূর্তি যা দেখার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি?

কি করে অনুভবটিকে প্রকাশ করি? ভাবলাম আমার বোধহয় চোখের দোষ হয়েছে, তাই ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, চোখের দোষ তো নয়? আমার চোখে শিল্পীর দৃষ্টি এসেছে। শিল্পী যেমন নিজে দেখে না, চোখকে মুক্তি দিয়ে দেয়; চোখ দৃশ্যবস্তুর 'ওপর দিয়ে জলের স্রোতের মত তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে বয়ে যায়। তেমনিভাবে আমারও চোখ মুক্তি লাভ করেছে।

কিন্তু তার ফল এই হল যে, মায়ের দিকে তাকিয়েও মাকে দেখা আমার হল না। দেখলাম শুধু মায়ের চোখ দু'টিকে। আর তা দেখতে দেখতেই অমনি আবিষ্কার করে ফেললাম—ওহো! এ যে সেই পরম করুণা-মাখা চক্ষু! কোথায় যেন আগে একবার দেখেছি? কোথায়? কোথায়?···সমগ্র সত্তায় আকাশ

পাতাল খুঁড়ে সে কি বিরাট আলোড়ন! যতক্ষণ না স্মরণ করতে পারলাম ততক্ষণ যেন মৃত্যু যন্ত্রণা হতে লাগল।

ভোপাল ষ্টেশনেও আমার ঠিক এমনি দশা হয়েছিল। একরকম খস্ খস্ আওয়াজ শুনে যেই পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম অমনি আগন্তুকের অদ্ভুত চোখ ছু'টির ওপর নজর পড়ে গেল। ব্যস, আগন্তুকের আর কিছুই দেখা হলনা। 'একি অদ্ভুত চোখ, একি করুণামাখা চোখ'—অন্তরের মাঝে শুধু এই জপ করছিলাম!

সত্যি করে এবং সাহস করে একটা কথা এখানে বলেই ফেলি, না হলে পরে হয়তো আর বলা হবে না: এমন অদ্ভুত চোখ আমি সারাজীবনে কোথাও দেখিনি! এমনকি, যদি বলি—মায়েরও আর কখনো দেখিনি—তাহলে কি কারো বিশ্বাস হবে? কিন্তু কথাটা যে অতি সত্যি! শুধু এই আশ্চর্য কথাটুকু বলবার জন্যেই আমার এত ভূমিকা। সত্যি সত্যি ছু'টিবার শুধু দেখেছিলাম মায়ের সেই অদ্ভুত চোখ—একবার দেখেছিলাম, ভোপাল ষ্টেশনে আর শেষে দেখলাম এই প্রস্প্যারিটি রুমে।

এদিকে আমার চোখের দোষটা যখন ধীরে ধীরে কাটল, তখন মায়ের মুখের দিকে নজর পড়তেই দেখি কি—মা খুব হাসছেন। সে ভারী কৌতুকপূর্ণ হাসি। আমি এতক্ষণ এ-হাসি দেখতেই পাইনি। এখন দেখে মনে হল—খুব যেন একটা মজার ঘটনা ঘটে গেছে, মা তাই উপভোগ করে এত হাসছেন!

কিন্তু যারা একটিবারের জন্যেও মাকে দর্শন করেছে তারা জানে আমার এ-সব কথারও বিশেষ মূল্য নাই। কেননা মা যে সদাহাস্যময়ী, ছোট-বড় পরিচিত-অপরিচিত সবার কাছেই যে তাঁর দিব্য অমল হাসি আশীষরূপে ঝরে পড়ে! আর তা-ই দেখেই তো দর্শক ভাবে—মা শুধু আমাকে দেখেই এত হাসলেন, আদর করলেন, অন্যদের বেলায় তিনি এমন করেন না। যার অহং-প্রকৃতি সে তখন এতেই ফেঁপে ওঠে, ভাবে আমার মত স্নেহের পাত্র মায়ের আর কেউ নাই!

আমি কিন্তু এরকম হাসির কথা বলছি না! এ-হাসি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হাসি, আমাকে একটা কিছু বুঝিয়ে দেবার হাসি। কারণ মা সেই প্রথম থেকেই ওপর দিকে মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রেখে সমানে হেসে চলেছেন।

কিন্তু এতসব কাণ্ড ঘটে গেল যেন মুহূর্তের মধ্যে। কিংবা আমারই তখন সময়ের হিসাব ছিল কি-না কে জানে? আমি তারপর মায়ের কাছে পৌঁছে তাঁর শ্রীচরণে মাথা রেখে নিজেকে নিবেদন করে দিলাম। মা একবার আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমি তবুও প্রণাম করছি, উঠতে ভুলে যাচ্ছি। মা

আবার একবার সমস্ত মাথাটায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তথাপি আমি উঠতে পারলাম না। মা তখন আমার মাথাটা হাত দিয়ে একটু নাড়িয়ে দিলেন। তখন আমি সচেতন হলাম! উঠে দাঁড়াতেই আমার হাতে মা একটি বড গাঁদা ফুল দিলেন, যে-ফুলটির অর্থ হল 'নমনীয়তা'।

মায়ের কাছ থেকে নিচে নেমে এলাম। মা একটি কথাও মুখে বললেন না, আমিও কিছু বললাম না। তবু মনে হল, আমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি।

'যা কিছু বলার ছিল
কখন্ তা বলেছি নিমেষে,
যা কিছু দেবার ছিল
দিয়েছি তা এক নিঃশ্বাসে!'

তবে সত্যি কথা বলতে কি, এমন একটা অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা আবিষ্কার করে, ভোপাল রেলষ্টেশনের আগন্তুকই যে স্বয়ং শ্রীমা—এ সত্য জানতে পেরেও সত্তার সবখানি জুড়ে তেমন উচ্ছলতা অধীরতা জাগল না। আনন্দ হল নিশ্চয়, এবং খুবই হল বলতে হবে, এমন কি জীবন-জনম সফল হল বলেও ধারণা হল কিন্তু কাকে এমন আশ্চর্য খবরটা দিই, কি করি, কোথা যাই—এরকম একটা উচ্ছলতা অধীরতা এল না! সেদিন সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে এসেই মাকে দেখে অনুভবে মিলিয়ে নিতে পারলে যে-আনন্দ হত, অন্তর-বীণাতে যে-অপূর্ব রাগিণী বেজে উঠত, আজ এই সাতটি বছর পরে অনাদরে অব্যবহারে সেই বীণার তারগুলে কোথায় যেন ঢিলে হয়ে গেছে; তাই আর সেটা তেমন উদাত্ত সুরে বেজে উঠল না!

বরং মনে হল, এতেই-বা কি, আর তাতেই-বা কি? অর্থাৎ আগন্তুক যদি মা হন তাতেই-বা কি, আর যদি না হন তাতেই-বা কি? দুঃখ-কষ্টের ভোগ যা বরাতে ছিল তা তো হয়েই গেছে?

কিন্তু অন্তর্যামী মা তখন আমার অন্তরের কথা জেনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন —বটে, এত দূর? এতেই-বা কি, আর তাতেই-বা কি? দাঁড়াও, এমন মজা দেখাব তখন এ-সব কথা প্রকাশ করবার জন্যে তোমাকে আকুলি-বিকুলি করতে হবে। তখন দেখব, কেমন করে তুমি এ-আনন্দ একা একা উপভোগ করে চুপ করে থাকতে পার?

মা তাই রেল ষ্টেশনের সেদিনের সেই চিত্র সেই অনুভব আবার নূতন করে

আমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুললেন ; আগন্তুককে যেভাবে পেয়েছিলাম যেভাবে দেখেছিলাম, ঠিক সেইরকম একটা ঘটনা এবার তিনি ঘটিয়ে দিলেন।

তারিখটা ছিল তেইশে আগষ্ট, উনিশ শ' একষট্টি সাল। মা আশ্রম প্রেস পরিদর্শন করতে এলেন। আমি আশ্রমে এসে এই প্রেসেই কাজ পেয়েছি তারই একমাস পূর্বে। আশ্রমের প্রতিটি কর্মবিভাগ মাঝে মাঝে মা এভাবে পরিদর্শন করতে আসতেন। কিন্তু সেইবারের প্রেস-দর্শনই মায়ের শেষ পরিদর্শন। তারপর থেকে তিনি আর কোন ডিপার্টমেণ্ট পরিদর্শন করতে যাননি। কারণ এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মা তিনতলার নির্জন কক্ষে বাস করতে সুরু করলেন। সুতরাং এই কারণেই বলছি, আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দেবার জন্যেই মায়ের এই শেষ পরিদর্শন।

এই দিনেও প্রস্প্যারিটি রুমের দর্শনের মত মা আমাকে বিশেষ সুযোগ করে দিলেন যাতে রেল ষ্টেশনের আগন্তুককে চিনে নিতে আমার এতটুকু অসুবিধে না হয় ; যাতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা, তার গলার স্বর চেনা, তাঁর দেহের লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। তা নইলে আমি যে তখনো হুঁ-ও করিনি, না-ও করিনি—আগন্তুককে চিনতে পেরেছি কিনা তার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিনি। অন্য লোক হলে এতদিন মাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলতো, অথচ আমি তা জানবার জন্যে এতটুকুও উৎসাহ প্রকাশ করলাম না।

হয়তো আমি তখনো পুরোপুরি বিশ্বাসই করতে পারিনি। তাই আমার মধ্যে তীব্র আনন্দ এল না। কিন্তু ডিভাইন এত কাঁচা কাজ করেন না। তাঁর উদ্দেশ্য কখনো বিফল হয় না। যেখানে বিফল হতে যাচ্ছে বোঝেন সেখানে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়েন।

মা-ও তেমনি আমার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

মাকে কেন্দ্র করে সারা প্রেসে সেদিন উৎসব সুরু হয়ে গেল। চারিদিকে মুখে মুখে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, আর মা গাড়ী থেকে নামবার পূর্বেই দর্শকে আশ্রম-বাসীতে সমস্ত প্রেস অমনি ভরে উঠল—প্রেসের বিরাট উঠোন, বাইণ্ডিং সেক্শন, হলঘর, অফিসঘর, ঘরে-বাইরে কোথাও আর তিল ধারণের স্থান রইল না। প্রেসে তখন নূতন হার্ডল্‌বার্গ অটোমেটিক প্রিণ্টিং মেসিন এসেছিল, সেই উপলক্ষ্যেই মা প্রেস পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। একসঙ্গে দু'টো উদ্দেশ্য সাধিত হল।

মা গাড়ী থেকে নেমেই বাইণ্ডিং সেক্শনের বারান্দা দিয়ে ঢুকে সোজা চললেন হার্ডলবার্গ মেশিন-রুমের দিকে। তারপর নূতন মেশিন দেখে সেখান থেকে

কম্পোজিং সেক্‌শন এবং বাইণ্ডিং সেক্‌শনের ভেতরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেন। মায়ের বাঁদিকে ছিলেন পবিত্রদা, প্রণবদা। কিন্তু কিভাবে সম্ভব হয়েছিল জানি না, মাযের ডান দিকটায় যাঁরা সব সময় থাকেন তাঁরা সেদিন কেউ ছিলেন না। অবশ্য একবারেই ফাঁকা ছিল না। দর্শকদের সেই ভীড়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকার উপায়ই ছিল না তখন।

কিন্তু আমি সেদিন মায়ের ইচ্ছায় স্থান পেয়ে গিয়েছিলাম মায়ের একেবারে ডানদিকে। ঠিক যেমন ভাবে সেই রেলওয়ে ষ্টেশনে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে, কখনো পেছনে কখনো পাশাপাশি হেঁটে চলেছিলাম, সেদিনও সেইরকম মেশিন সেক্‌শন, বাইণ্ডিং-সেক্‌শনের ভেতর দিয়ে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

মা খুব দ্রুত হাঁটছিলেন। ডকুমেণ্টারী ফিল্মের পর্দায় মাকে যেমন ছুটতে ছুটতে হাঁটতে দেখা যায়, তেমনি ভাবে দ্রুত পায়ে তিনি হাঁটছিলেন। মায়ের হাঁটার সঙ্গে তাল রাখার জন্যে আমাকে খুব মনোযোগ দিতে হচ্ছিল। প্রেসের ম্যানেজার কাজ-কর্মের বিষয় সব বুঝিয়ে বলছিলেন, মা তা শুনতে শুনতে হাঁটছিলেন। কখনো তিনি নিজেও কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছিলেন—সামান্য কথা থেকে গভীর বিষয়ের কথা পর্যন্ত সব কথা শোনার সময় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে যেন তিনি এক মুহূর্তে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু দেখে নিচ্ছিলেন। কখনো-বা কথা শুনতে শুনতে দাঁড়িয়ে পড়ছেন, আর মায়ের টেপ-রেকর্ডারে যেমন শুনতে পাওয়া যায়—মা প্রথম উত্তর দেওয়ার আগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে একবার 'অ্যাঁ' করে ওঠেন—তেমনি ভাবে 'অ্যাঁ' করে কথাটা আবার ভাল ভাবে বুঝে নিতে চাইছেন। ওঃ! একেবারে সেই অবিকল কণ্ঠস্বর—রেলওয়ে ষ্টেশনের 'আমি তোমায় সাগরে নিয়ে যাবো'র কণ্ঠস্বর! আজও ঠিক আমার কানের মধ্যে, হৃদয়ের অন্তস্থলে তেমনি ধরা আছে! আর সব ভুল হতে পারে, কিন্তু গলার ঐ স্বরটি তো ভুল হবার নয়··· ?

সেদিনের রেলওয়ে ষ্টেশনের মতই মায়ের আজকের পোষাক—পরিধানে সিল্কের সেই সালোয়ার পাঞ্জাবী, মাথায় সেই রকম রুমাল-বাঁধা। আবার পায়েও ঠিক সেইরকম পুরু হাওয়াই চপ্পলের মত সাদা জুতো, সাদা মোজা। তফাৎ শুধু আজ মায়ের হাতের কব্জিতে কাপড় বাঁধা নাই। তার বদলে একহাতে আছে খুব ঢল্‌ঢলে সোনার চেন, আর অন্য হাতে সোনার চেন রিষ্টওয়াচ।

দৃষ্টি আমার আর কোন দিকে ছিল না, শুধু মায়ের দিকে দৃঢ় নিবদ্ধ করে রেখে ছিলাম। সেদিন মাকে মা বলে দেখিনি, আজ মা তাই সুদে-আসলে পূরণ করে

দিলেন। আমি শুধু মিলিয়ে নিচ্ছি মায়ের হাঁটা, কথা বলা, দেখা। মিলিয়ে নিচ্ছি মায়ের দেহলক্ষণ……।

পরিদর্শন শেষ করে মা আবার বাইণ্ডিং সেকশনের বারান্দায় ফিরে এলেন। বারান্দার মাঝামাঝি স্থানে মায়ের বসবার সিংহাসন রাখা হয়েছিল, মা সেটিতে বসে সমস্ত দর্শক এবং প্রেসের কর্মীদের আশীর্বাদ দিলেন। সেদিনের মত আজও টফি-প্রসাদ দিলেন মা। দর্শকদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে আমিও মায়ের হাত থেকে একটি টফি পেলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনের সমস্ত ঘটনাই যেন আজ আবার একে একে ফিরে এলো।

বাস্তবিক তারপর মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। সেই যে আমি বলেছিলাম এতেই-বা কি আর তাতেই-বা কি? তারই ফল ফলছে এখন! এতদিন মা ব্যাকুল হয়েছিলেন তাঁর কথা প্রকাশ করে বলার জন্যে, এবার আমিও ব্যাকুল হয়ে উঠেছি মায়ের অলৌকিক কৃপার কথা প্রকাশের জন্যে।

কিন্তু একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি না, মায়ের যদি এতই আগ্রহ তবে কেন তিনি এই এতদিনে আমাকে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন? কেন তবে তিনি এই পঁচিশটি বছর চুপ করে ছিলেন?